নিরীক্ষা

২১৩তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১৭

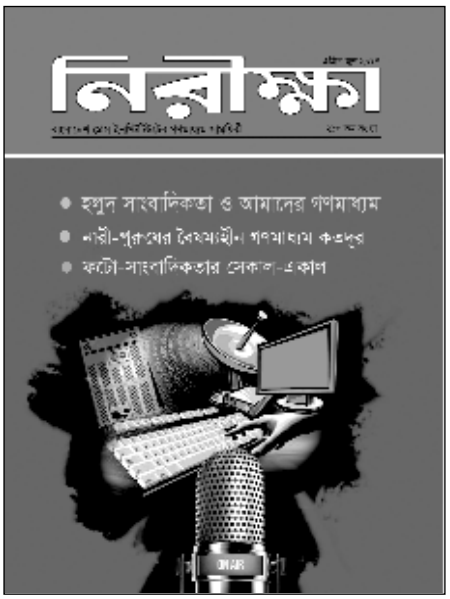

বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম একটি বহুল আলোচিত প্রপঞ্চ। দিন দিনই গণমাধ্যম জগতে আসছে পরিবর্তন। সৃষ্টি হচ্ছে গণযোগাযোগের নতুন নতুন ধরন। গণমাধ্যম এখন আর শুধু মুদ্রিত মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর দিগন্ত ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। গণমাধ্যম জগতের নানান বিষয়কে মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে বর্তমান সংখ্যাটি। সংবাদপত্রের ইতিহাস থেকে শুরু করে অনলাইন মাধ্যম বিষয়েও লেখা রয়েছে আলোচ্য সংখ্যায়। সাংবাদিকতায় নারী, বিজ্ঞাপন কলা, জনসংযোগ বিষয়েও যেমন লেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি ডিজিটাল সেবাকেন্দ্র এবং চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন বিষয়েও দুটো গবেষণা রয়েছে এ সংখ্যায়। সাংবাদিকতায় নতুনতর সংযোজন সমাধান কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা বিষয়েও একটি লেখা রয়েছে। এছাড়াও গণমাধ্যম নিয়ে আরো বেশ কয়েকটি লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে সংখ্যাটি। আশা করি, লেখাগুলো নিরীক্ষা'র পাঠকদের ভালো লাগবে। পাঠকদের প্রয়োজনে আসলেই আমাদের উদ্যোগ সফল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
সুভাষ চন্দ্র রায়
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান

সূ|চি|প|ত্র

হলুদ সাংবাদিকতা ও আমাদের গণমাধ্যম ৫
শামীমা চৌধুরী

সমাধান-কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা: সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা ৮
মোহা. মাহামুদুল হক

ফটো-সাংবাদিকতার সেকাল-একাল ১০
মিনহাজ উদ্দীন

ব্রিটিশ ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ইতিবৃত্ত ১৩
সাইফুল সামিন

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও গণমাধ্যম ১৫
ড. মাহাবুবুর রহমান

আদর্শিক সাংবাদিকতার ঐতিহ্য অন্বেষণে ২০
শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্য থাকলে রুটি-রুজির আন্দোলন সফল হতো ২৩
কে জি মোস্তফা

বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার ও আবেগমূল্য ২৫
শুভ কর্মকার

নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন গণমাধ্যম কতদূর ২৯
শাহনাজ মুন্নী

নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষায় নারী সংগঠন ৩১
আফরোজা নাজনীন

গণমাধ্যমের সঙ্গে জনসংযোগ বিভাগের সম্পর্কোন্নয়নের কর্মপন্থা ৩৩
নূর ইসলাম হাবিব

ডিজিটাল মিডিয়া ৩৭
সৌমিত্র দেব

বেতার-টিভি'তে সংবাদ উপস্থাপনা ও বিভিন্ন দিক ৪০
কুদরত-ই-মওলা

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র: কতিপয় কেস স্টাডি ৪২
আমির হোসেন

সাংবাদিকতার নতুন ধরন নির্মাণে মোনাজাতউদ্দিন ৪৭
ড. জ্যোৎস্নালিপি

গণমাধ্যম সংবাদ ৬২

পিআইবি সংবাদ ৬৯

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৩তম সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০১৭

চলমান বিশ্বের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে গণমাধ্যমে এখন স্যাটেলাইট প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের চাহিদা, জনমনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬

ইদানীং আরেকটি বৈষম্যমূলক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেক পেশাদার নারী সংবাদকর্মী। যা তাঁদের পেশাগত জীবনে সামনের দিকে এগুনোকে বাধাগ্রস্ত করছে। অনেক প্রবীণ নারী সাংবাদিককে বলতে শুনেছি, মিডিয়া জগতে বয়স বাড়লে পুরুষ সহকর্মীকে বলা হয় 'অভিজ্ঞ' আর নারী সাংবাদিককে বলা হয় 'অযোগ্য'

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩০

Public Relations- এর P মানে Performance এবং R মানে Recognition. ভালো কাজ করার পর তা প্রচার করলে জনগণের কাছে প্রশংসিত হওয়া যায় অন্যথায় নয়

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩৪

এই অমসৃণ পথ ধরেই সাংবাদিকতার ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন (১৯৪৫-১৯৯৫)। গ্রামের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নাম

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৭

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

লেখা আহবান

বিশিষ্ট সাংবাদিক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য প্রয়াত আলতাফ মাহমুদ স্মরণে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগ্রহী সাংবাদিক, লেখক, তাঁর সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: pibnirikkha@gmail.com
dgpib@yahoo.com

হলুদ সাংবাদিকতা ও আমাদের গণমাধ্যম

শামীমা চৌধুরী

সাংবাদিকতায় 'হলুদ' শব্দটির ব্যবহার বা প্রয়োগ নতুন কোনো ঘটনা নয়। বলা যায়, সংবাদপত্র শিল্পের পেশাদারিত্ব ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাতের সময় থেকেই 'হলুদ সাংবাদিকতা'র বিষয়টি জড়িয়ে আছে। যা আজও তার মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান।

হলুদ সাংবাদিকতা হচ্ছে সেই সাংবাদিকতা যেখানে সঠিকভাবে যাচাই বা অনুসন্ধান না করে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে অতিরঞ্জিত, বস্তুনিষ্ঠহীন, মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা হয়। যেখানে থাকে তথ্যবিকৃতি। যা মনগড়া ও উস্কানিমূলক।

সংবাদপত্র শিল্পের পেশাদারিত্ব ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাতের সময় থেকেই 'হলুদ সাংবাদিকতা'র বিষয়টি জড়িয়ে আছে

হলুদ সাংবাদিকতা যেভাবে শুরু

হলুদ সাংবাদিকতার ধারণাকে আভিধানিকভাবে প্রথম ব্যবহার করেন 'নিউইয়র্ক প্রেস'-এর সম্পাদক এরউইন ওয়ার্ডম্যান। ১৮৯৮ সালে তাঁর পত্রিকায় সেসময়ের সাংবাদিকতার ধারাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে সহজ কথায় লেখা হয়েছিল: 'We called them Yellow because they are Yellow.'। তবে সংবাদ প্রকাশের শুরু থেকেই সেসময়ের সংবাদকর্মীরা 'ইয়েলো জার্নালিজম' কিংবা 'স্কুল অব ইয়েলো কিড জার্নালিজম'এ ধরনের অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' কিনে নেন মার্কিন সাংবাদিক যোসেফ পুলিৎজার। পত্রিকাটি আরো পাঠকপ্রিয় ও বিনোদনমূলক

করে তোলার জন্য তিনি এর বিষয়বস্তু ও ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাহিনী তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করতে শুরু করেন।

১৮৯৬ সালে কার্টুনিস্ট রিচার্ড এক আউটকল্ট নামে একজন কার্টুনিস্ট পুলিৎজারের পত্রিকায় 'হোগানস এ্যালি' শিরোনামে একটি কমিক সিরিজ আঁকতে শুরু করে। সিরিজটির কারণে পত্রিকার কাটতি বেড়ে যায় দ্রুত। হলুদ রঙের জামাপরা একটি ন্যাড়া শিশু ছিল এই সিরিজের প্রধান চরিত্র। যাকে ডাকা হতো ইয়েলো কিড নামে। পরে পুলিৎজারের প্রতিযোগী হার্স্ট আউট কলকে উচ্চবেতনের অফার দিয়ে তাঁর পত্রিকায় নিয়ে যায়। তবে পুলিৎজার এখানেই থেমে থাকেননি। শিল্পী জজ লুকসকে এই কমিক সিরিজ আঁকার দায়িত্ব নেন। নিউইয়র্ক সিটির দুই পত্রিকায় দুই হলুদ শিশুর উপস্থিতি 'দ্য ইয়েলো কিড পেপারস' হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেখান থেকে ইয়েলো জার্নালিজমের সূত্রপাত। পুলিৎজার খবরের পাশাপাশি ছবি, গেমস, ধাঁধা

প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে পত্রিকাটির পাঠকপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলেন। মাত্র দুই সেন্টের বিনিময়ে ৮-১২ পাতার পত্রিকা ক্রয় করা সেই সময়ের পাঠকদের জন্য খুবই সহজ ছিল। প্রকাশের দুই বছরের মধ্যে এটি নিউইয়র্কের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে পরিণত হয়। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুলিৎজার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পাশাপাশি অপরাধমূলক, সেক্স বিষয়ক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তাঁর পত্রিকার বেশির ভাগ খবরের শিরোনামগুলো অকারণে বড় করা হতো। কিন্তু ভেতরে আসল বক্তব্য কিছুই থাকত না। প্রকাশের দুই বছরের মধ্যে নিউইয়র্ক পত্রিকাটির প্রকাশের সংখ্যা ৭২ হাজারে পৌঁছে যায়। ওই সময়টিকে আমেরিকা'র ইতিহাসে 'ইয়েলো জার্নালিজমের যুগ' বলে পরিচিত। আমেরিকা'র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পুলিৎজার নতুন ধারার প্রবর্তন করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন যেমন, তেমনি কাগজের কাটতি বাড়ানোর আশায় 'সেনসেশন' পদ্ধতি অনুসরণ করে নিন্দিতও হয়েছেন।

কিন্তু পত্রিকাটির এই সুসময় বেশিদিন থাকেনি। এই পত্রিকাটির সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন আরেক সাংবাদিক উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্ট। তিনি ছিলেন এক খামার ও খনির মালিক। সেসময়ের একজন ধনকুবের। তাঁর নিজের প্রচারণার জন্য একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। ১৮৮০ সালে তিনি 'সানফ্রানসিসকো এক্সামিনার' পত্রিকাটি কিনে নেন। তিনি ১৮৯৫ সালে পুলিৎজারের ভাই আলবার্টের কাছ থেকে 'নিউইয়র্ক জার্নাল' পত্রিকাটি কিনে নেন। তিনি তাঁর 'নিউইয়র্ক জার্নাল' পত্রিকায় পুলিৎজার সম্পাদিত 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবর ও অন্যান্য তথ্যের ব্যাপক সমালোচনা শুরু করেন। বিশেষ করে 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত অপরাধমূলক খবরের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে যায় পত্রিকাটি। সেই সাথে পাঠক যাতে সহজেই কিনতে পারে এজন্য পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারণ করেন পুলিৎজারের পত্রিকাটির থেকে এ আরও এক সেন্ট কম। সেই সাথে ডিপার্টমেন্ট স্টোরের বিজ্ঞাপনগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। যোসেফ হার্স্টের ব্যবসায়িক মারপ্যাঁচের কাছে অনেকটাই হেরে যান পুলিৎজার। এরপর তিনি পত্রিকাটির দাম এক পেনি করেন। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। কারণ তাঁর পত্রিকার অনেক সাংবাদিককেই ততদিনে বেশি বেতনের প্রস্তাব দিয়ে হার্স্ট তাঁর পত্রিকায় নিয়ে নেন।

এই দুই প্রতিযোগীর কারণে যে হলুদ সাংবাদিকতার শুরু তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে।

সংবাদপত্র ও হলুদ সাংবাদিকতা

চলমান বিশ্বের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে গণমাধ্যমে এখন স্যাটেলাইট প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের চাহিদা, জনমনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আর সংবাদপত্রের মাধ্যমেই মানুষ প্রথম তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র।

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন বিষয়ে মানুষের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যম। নব্বই দশক থেকে গণতন্ত্রের যে ঢেউ বিশ্বব্যাপী আছড়ে পড়ে তাতে সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের ভূমিকা হয়ে ওঠে আরও বহুমুখী। সংবাদপত্রের চাহিদা আছে বলেই প্রকাশের ধারা এখনও উচ্চমুখী। প্রচারের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে সংবাদপত্রের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

যে কারণে সংবাদপত্রের চাহিদা এখনও ব্যাপক তাহলো:

১. ঐতিহ্যগতভাবেও মানুষ সংবাদপত্র পড়ে।
২. এদেশের রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (বিশেষ করে গত শতাব্দীতে) গাইড হিসেবে সংবাদপত্র দায়িত্বপালন করায় আজও মানুষ এই মাধ্যমটির প্রতি নির্ভরশীল।
৩. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে দিনের প্রথম ভাগেই অত্যন্ত জনপদে মানুষের হাতে পৌঁছে যায় অর্থাৎ সময়মতো সহজে তথ্যভাণ্ডারের সাথে যোগাযোগ তৈরি হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে।
৪. সংবাদপত্রের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা প্রবল। এখানে পাঠক নিজেও মতামত প্রকাশ করতে পারে।
৫. সংবাদপত্রে বহু বিষয়ের সন্নিবেশ থাকে তাতে পাঠকের সকল চাহিদা পূরণ হয়।
৬. সংবাদপত্রে মালিক/গোষ্ঠীশাসিত হলেও সঠিক খবর ও জনমত প্রকাশে তেমন বাধা হয় না। কারণ সংবাদপত্র বাণিজ্যে খবর ও জনমতই হচ্ছে প্রধান পণ্য– যা পাঠক ক্রয় করে।
৭. সংবাদপত্রের মূল্য এখন পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে।
৮. বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, তথ্যের প্রবেশাধিকার এবং জনগণের ক্ষমতায়ন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একটি নিরাপদ ও মুক্ত গণমাধ্যম বা সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে পারে। এই বাস্তবতা আমাদের সংবিধানের পাতায় রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি এসেছে সাংবিধানিকভাবেই। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ৩৯নম্বর অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল; (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতাও রয়েছে প্রত্যেকের।' একইভাবে ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা বা জানাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণায়ও মুক্ত স্বাধীন মতামতভিত্তিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে পাঠকদের সত্য ও কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সাংবাদিকদের দায়িত্ব।

এভাবেই আমাদের গণমাধ্যম দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে সামাজিকভাবেও। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই এই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রবলতর করেছে দুর্নীতিমুক্ত, সুশীল সমাজ গড়ে তোলার দায়িত্বের মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি নিহিত। গণমাধ্যম তথ্যভাণ্ডার ও সেই সঙ্গে বিনোদনের উৎস। কাজেই এখানে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হবে তা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। ইচ্ছা করলেই সাংবাদিকরা যা খুশি লিখতে পারেন না। প্রকাশ করতে পারেন না। সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত ও বিভ্রান্ত করার কোনো অধিকার সাংবাদিকরা রাখেন না।

কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটি ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে। যাকে বলা হয় হলুদ সাংবাদিকতা। এখন বেশির ভাগ সংবাদপত্রের ও অন্যান্য গণমাধ্যমের মালিক কর্পোরেট দুনিয়ার লোক- ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ কখনও-কখনও নিজেদের স্বার্থে তারা সংবাদপত্র চ্যানেলকে ব্যবহার করছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ অন্য গ্রুপের পেছনে লাগছে ব্যক্তিস্বার্থে, ব্যবসায়িক স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে নয়। মালিকরাই পত্রিকার পলিসি তৈরি করে। পাশাপাশি অনেক সত্য ঘটনাকে মিথ্যা ও ভুল তথ্যের আবরণ দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। একটি ঘটনাকে বিবৃত করে উপস্থাপনার প্রবণতাও রয়েছে সংবাদপত্রে। সাংবাদিক সাগর-রুনী দম্পতির মৃত্যু সংবাদটি কোনো একটি পত্রিকা খবরটি অত্যন্ত অশ্লীলভাবে-বিকৃতভাবে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। নারী, প্রেম, পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ক কোনো খবরে নারীর চরিত্র হননের প্রয়াস দেখা যায়। সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে সরকারের সকল কর্মকাণ্ডকে ব্যর্থতার আবরণে ঢেকে দেয়া হয়। আবার বিরোধীপক্ষের যে কোনো দাবি-দাওয়াকে, আন্দোলনকে ওমুক রাষ্ট্রের এজেন্টদের আন্দোলন, দাবি ইত্যাদি বলে চাপিয়ে দেয়া হয়। এই প্রবণতা সংবাদপত্রের বস্তুনিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করে। গণতন্ত্র ও সামাজিক অধিকারকে ভঙ্গুর করে তোলে। আর এসব কারণে একটি নীতিমালার ভেতরে থেকে সংবাদপত্রের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে হবে।

সংবাদপত্রের নীতিমালা

বাংলাদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণ/প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত আচরণবিধি ছাড়া এ পর্যন্ত কোনো পৃথক ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। ১৯৭২-২০১০ সাল এই দীর্ঘসময়ে দেশের সব সরকারই সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা, হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার, (Yellow Journalism) খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা, সাংবাদিকদের সততা, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রকাশনা নীতিমালা না থাকলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধি প্রচলন করে। এই প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর ১১ (বি) ধারায় প্রণীত। ২০০২ সালে যা সংশোধিত।

প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত আচরণবিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে:

১. দেশের মধ্যে প্রকাশিত কোনো সংবাদপত্র জাতিসত্তা বিনাশী, দেশের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিনাশী, সংবিধানবিরোধী কোনো সংবাদ প্রকাশ করতে পারবে না।

২. দেশের কোনো সংবাদপত্র ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী কোনো তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকবে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে সমুন্নত রাখবে।

৩. সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হবে তা সবই হবে জনস্বার্থে। জনগণকে আকর্ষণ করে অথবা তাদের উপর প্রভাব ফেলে এমন বিষয়কে সংবাদপত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪. সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য হতে হবে নির্ভুল ও সত্য।

৫. গুজব ও অসমর্থিত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে সেগুলোকে চিহ্নিত করা এবং যদি এসব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচিত হয় তবে সেগুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. সংবাদপত্র ও সাংবাদিক বিতর্কিত বিষয়ে নিজস্ব মতামত জোরালোভাবে ব্যক্ত করার অধিকার রাখেন।

৭. কুৎসামূলক বা জনস্বার্থ পরিপন্থী না হলে বাহ্যত ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থবিরোধী হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত যেকোনো বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের আছে। কিন্তু এরূপ বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হলে সম্পাদককে তা বিনা খরচে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষ সম্পর্কে তাদের বর্ণ, গোত্র, জাতীয়তা, ধর্ম অথবা দেশগত বিষয় নিয়ে অবজ্ঞা বা মর্যাদাহানিকর বিষয় প্রকাশ না করা। জাতীয় ঐক্য সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৯. অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের প্রভাবের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি; এ কারণে যে সাংবাদিক সংবাদপত্রের জন্য লিখবেন তিনি সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান থাকা এবং ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সূত্রসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে।

১০. কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সবপর্যায়ে তার খবর ছাপানো এ মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায় প্রভাবিত হতে পারে, এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত সাংবাদিককে বিরত থাকতে হবে।

১১. সম্পাদকীয়ের কোনো ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে।

১২. বিদ্বেষপূর্ণ কোনো খবর প্রকাশ করা যাবে না।

১৩. সম্পাদক কর্তৃক সংবাদপত্রের সকল প্রকাশনার পরিপূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।

১৪. কোনো দুর্নীতি বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর্থিক বা অন্য কোনো অভিযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমতো নিশ্চিত হওয়া এবং প্রতিবেদককে অবশ্যই খবরের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করতে হবে।

> *চলমান বিশ্বের গতিময়তার সাথে তাল মিলিয়ে গণমাধ্যমে এখন স্যাটেলাইট প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের চাহিদা, জনমনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি*

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রেরই নিজস্ব নীতিমালা ও আদর্শ রয়েছে। প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি এর বিরোধী কিছু নয়। আর এ কারণেই দেশের সংবাদপত্র শিল্প গণমাধ্যমের শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এই নীতিমালা যদি বাস্তবায়ন হয় এবং প্রতিটি সংবাদপত্রের মালিক-কর্তৃপক্ষ- সাংবাদিকরা যদি তা মেনে চলে তাহলে হলুদ সাংবাদিকতার অভিশাপ থেকে অবশ্যই মুক্ত হবে গণমাধ্যম।

তথ্যসূত্র

১. মনজুরুল আহসান বুলবুল, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৫৯ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর স্যুভেনির, পৃ. ৩৮-৪১

২. রোবায়েত ফেরদৌস, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জনমানুষের অধিকার, নিরীক্ষা, পিআইবি, পৃ. ৪-৫

৩. শামীমা চৌধুরী, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নীতিমালা: বর্তমান প্রেক্ষিত, 'নিরীক্ষা' জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ. ১৬-২০

৪. শামীমা চৌধুরী, সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা, পিআইবি, পৃ. ৪-৫

৫. সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, সংবাদপত্র আইন ও আদালতের স্বাধীনতা, পৃ. ২০-২৩

৬. ম্যাসলাইন মিডিয়া, বিশ্ব গণমাধ্যম দিবস-২০১৪, প্রকাশনা, পৃ. ৩৫-৩৯

লেখক: জ্যেষ্ঠ গবেষক, পিআইবি

সমাধান-কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা: সাংবাদিকতায় নতুন মাত্রা

মোহা. মাহামুদুল হক

সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় সমস্যার সমাধানে মানুষ কীভাবে সাড়া দিচ্ছে তা তুলে ধরা হয়

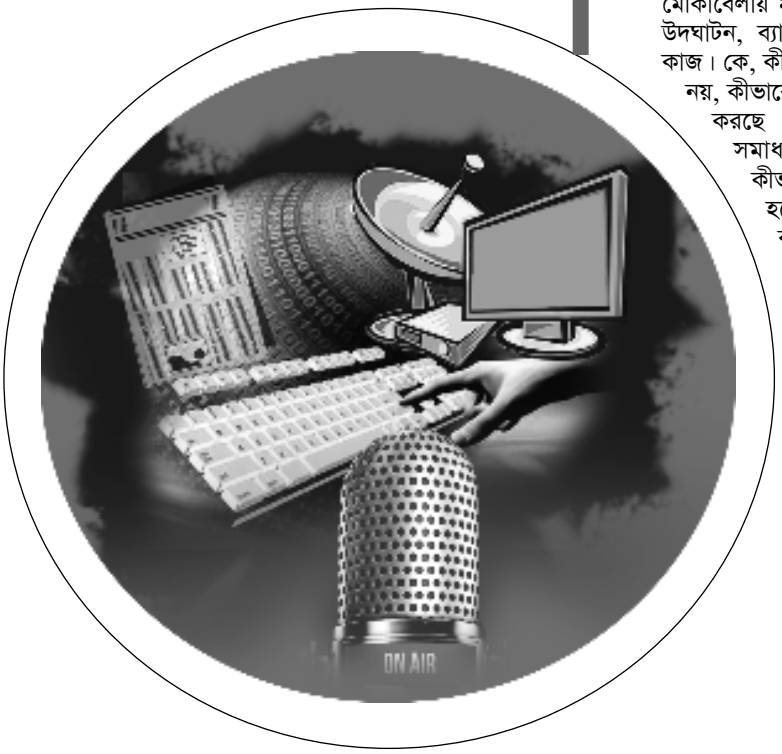

সমাজের সমস্যা বহুবিধ। এসব সমস্যার সমাধানে কেউ না কেউ কাজ করে। সনাতন সাংবাদিকতায় সামাজিক বা জাতীয় বিভিন্ন সমস্যার ওপর রিপোর্ট করা হলেও এসব সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বা প্রচেষ্টা সংবাদমাধ্যমে খুব বেশি স্থান পায় না। অনেক সময় সফলতার কাহিনীও রিপোর্ট করা হয়; কিন্তু কীভাবে সফলতা এলো বা সমস্যার সমাধান করা হলো তা খুব একটা গুরুত্ব পায় না। সফলতার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বা সমাধানের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার উদ্ভব। সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার প্রচার ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সলিউশনস জার্নালিজম নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। সলিউশনস জার্নালিজম (solutions journalism) বা সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা ধারণার প্রধান প্রবর্তকরা হলেন– সাংবাদিক ডেভিড বর্নস্টেইন, কোর্টনি-ই-মার্টিন এবং টিনা রোজেনবার্গ।

ভুল, অনৈতিক এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড উদঘাটন করাই সাংবাদিকের কাজ নয়, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় মানুষ কীভাবে কাজ করছে তা উদঘাটন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাও তার কাজ। কে, কী কাজ করছে শুধু তা উদঘাটন নয়, কীভাবে কাজগুলো হচ্ছে বা কেন তা করছে সেসব প্রশ্নের উত্তর থাকে সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায়। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে এখানে তা মুখ্য। স্কুলে ঝড়েপড়া (Dropout) রোধে সফলতার জন্য কোন মডেল কাজ করল? কীভাবে তারা সফল হলো? কী পদ্ধতিতে কাজ করে তারা অন্যের চেয়ে ভালো করল? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে রিপোর্টিং প্রক্রিয়াই সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা। সলিউশনস জার্নালিজম নেটওয়ার্কের মতে সমাধান-কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা হলো Rigorous, compelling reporting about responses to social problems।

সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় সমস্যার সমাধানে মানুষ কীভাবে সাড়া দিচ্ছে তা তুলে ধরা হয়। মারাত্মক একটি সামাজিক সমস্যা কীভাবে জনগণ মোকাবেলা করছে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় এ ধরনের সাংবাদিকতায়। এ প্রক্রিয়া জনগণকে সংবাদের সাথে সংযোগ করে। তারা গঠনমূলক কাজে অগ্রসর হয় এবং অর্থবহ পরিবর্তনে এগিয়ে যায়। সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা শুধু তথ্যই দেয় না, জনগণের ক্ষমতায়নেরও অন্যতম পথপ্রদর্শক।

সাংবাদিকদের কাজ হচ্ছে সমাজের সঠিক চিত্র তুলে ধরা। সলিউশনস জার্নালিজম নেটওয়ার্ক মনে করে– সফল হোক বা না হোক, জনগণ বা প্রতিষ্ঠান কোন প্রক্রিয়ায় সমস্যা সমাধানে কাজ করছে তা তুলে ধরতে ব্যর্থ হলে সাংবাদিকতাও ব্যর্থ। যদি আমরা সরকারি স্কুলের পদ্ধতিগত সমস্যাই শুধু রিপোর্ট করি এবং শিক্ষার উন্নয়নে কীভাবে কিছু প্রতিষ্ঠান প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা যদি অবজ্ঞা করি তাহলে সমস্ত ঘটনার আংশিক বলা হবে। কীভাবে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভালো করছে এবং কীভাবে তা অর্জন করেছে তা রিপোর্ট করলে অডিয়েন্স আগ্রহী হয় বেশি, অন্যরা তা অনুসরণ করে সার্বিকভাবে সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে।

কেন সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা?

* সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা সমাজ পরিবর্তনের উদীয়মান তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ ধরনের সাংবাদিকতার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরে এর সমাধানের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও ধারণা বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু সনাতন সাংবাদিকতায় সমস্যাটাই ফোকাস করা হয় বেশি; সমাধান প্রক্রিয়াকে অবজ্ঞা করা হয়।
* সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা ভালো সাংবাদিকতা। এ সাংবাদিকতায় একটা ঘটনার আংশিক নয়, পরিপূর্ণ দিক তুলে ধরা হয়। এ প্রক্রিয়া অধিক সঠিক ও সম্পূর্ণ। সাংবাদিকতায় সমাধান বা সাড়ার বিষয় তুলে ধরতে ব্যর্থ হলে সংবাদ-কাহিনী পক্ষপাতদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে।
* সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা পাঠক সংযুক্তকরণে সাহায্য করে; ফলে তাদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। সমাধানের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে। সনাতন সাংবাদিকতায় জনগণকে সহজে পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় আনা যায় না। কারণ এ ধরনের সাংবাদিকতায় শুধু সমস্যা তুলে ধরা হয়। কিন্তু জনগণ সমস্যার পাশাপাশি পরিবর্তন বা সমাধানের উপায় জানতে চায়। যখন তারা এসব ধারণা জানতে পারে তখন তা গ্রহণ করে, পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে।

সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনী তৈরিতে ১০টি বিবেচ্য বিষয়

* সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনীতে সমস্যার প্রকৃতি এবং কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে হবে। সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করে। সংবাদ-কাহিনী কী কী সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে–এ প্রশ্নের উত্তর থাকতে হবে।
* সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনীতে সমস্যার সমাধানে যেসব উদ্যোগ বা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তার বর্ণনা থাকতে হবে। সমাধানের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল বর্ণিত না হলে তাকে কোনোভাবেই সমাধানভিত্তিক সাংবাদিকতা বলা যাবে না।
* সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনীতে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তার অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসার জবাব থাকবে। যেমন, কোনো একটা এলাকা বা প্রতিষ্ঠানের ঝরেপড়া (Dropout) তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ঝরেপড়া রোধে কোনো মডেল কীভাবে কাজ করেছে তার বর্ণনা থাকতে হবে সংবাদ-কাহিনীতে। সমস্যা সমাধানে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
* সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনীর বর্ণনা অন্যান্য সংবাদের মতোই। কিন্তু এখানে বেশি প্রাধান্য পায় সমস্যার সমাধানে তথ্য ও উপাত্তের সমন্বয়। সংবাদ-কাহিনীতে কী সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়ার বর্ণনা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বা সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে–এ প্রশ্নের উত্তর থাকতে হবে।
* সংবাদ-কাহিনীতে সমস্যা সমাধানে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।
* সমস্যা সমাধানে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকতে হবে সংবাদ-কাহিনীতে। সমস্যার কোনো সমাধানই সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল একথা বলা যায় না। প্রত্যেক সমাধান প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি ও সীমাবদ্ধতা থাকে। সমাধানভিত্তিক ভালো সংবাদ-কাহিনীতে অবশ্যই সমাধান প্রক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে হবে।
* সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার অন্যতম লক্ষ্য হলো কোনো সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি এমনভাবে তুলে ধরা যাতে পাঠক বা দর্শক সংবাদ-কাহিনী থেকে কিছু শিখতে পারে। সংবাদ-কাহিনীতে পাঠক বা দর্শকের জন্য কী কোনো শিক্ষণীয় পাঠ রয়েছে–তার উল্লেখ থাকতে হবে।
* সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা বিশেষ কোনো মডেল, সংগঠন বা ধারণার পক্ষে অ্যাডভোকেসি করে না। বরং সাংবাদিক সংবাদ-কাহিনীর মাধ্যমে কোনো ধারণা, পদ্ধতি বা উদ্ভাবনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে। সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনীতে জনসংযোগের মতো প্রশংসাসূচক কথাবার্তা পরিহার করা গেছে কীনা তা যাচাই করতে হবে।
* বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিদের সূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা তখনই জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন এসব ব্যক্তির বাস্তব ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা সংবাদ-কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়।
* সমাধানভিত্তিক সংবাদ-কাহিনী ও 'ভালো সংবাদ' বা সাফল্যের সংবাদের মধ্যে পার্থক্য হলো সাফল্যের সংবাদে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ বা সাফল্য বিবৃত হয়। কিন্তু সমাধানভিত্তিক সংবাদে কাজের মডেল বা ধারণা অথবা কীভাবে তারা সামাজিক সমস্যার সমাধানে কাজ করেছে এবং সমাজে এর কী প্রভাব পড়েছে তার উল্লেখ থাকবে।

সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার সাতটি ধাপ

সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় সাতটি ধাপ অনুসরণ করা হয়। তবে ধাপগুলো সবসময় ধারাবাহিকভাবে একটার পর আরেকটা অনুসরণ করতে হবে তা কিন্তু নয়। কখনও-কখনও সমস্যার আগে সমাধান সম্পর্কে সাংবাদিক জানতে পারেন। সাফল্য জানার পর এ সমস্যা সম্পর্কে জানতে হতে পারে। নিচে সাতটি ধাপ উল্লেখ করা হলো :

১. বিষয় চিহ্নিতকরণ। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন, জননিরাপত্তা, স্কুল থেকে ঝরেপড়া প্রভৃতি।
২. জনগণের আলোচনায় না আসা বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ। এক্ষেত্রে কেউ ভালো কোনো কিছু করলে তা নির্দিষ্টকরণ।
৩. যা করা হচ্ছে তার সংবাদমূল্যর যথার্থতা নিরূপণ।
৪. সফলতার প্রমাণ চিহ্নিতকরণ ও এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ।
৫. রিপোর্ট করা। তবে সমাধানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিস্তৃত হলে সিরিজ রিপোর্ট করা।
৬. কোনো একসময়ে সম্পাদক বা মেনটোরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
৭. রিপোর্ট প্রকাশিত হলে তা বিভিন্ন প্ল্যাটফরমের অডিয়েন্সের নজরে নিয়ে আসা।

বাংলাদেশে সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার পঠনপাঠন ও চর্চা

২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সলিউশনস জার্নালিজম নেটওয়ার্ক গঠিত হওয়ার পর থেকে সমাধান কেন্দ্রিক সাংবাদিকতা ধারণাটির বিস্তৃতি ঘটতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশে ২০১৬ সালে 'সাংবাদিকতা: অফলাইন-অনলাইন' গ্রন্থে সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধই বাংলাদেশে সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতার প্রথম পথনির্দেশক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাই সমাধানকেন্দ্রিক সাংবাদিকতা এখনও সিলেবাসে স্থান পায়নি। আর যারা সাংবাদিকতা চর্চা করেন তাঁদের বেশির ভাগই তাত্ত্বিক বিষয় পাঠে অবজ্ঞার ভাব দেখান। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার যে ধারা সেখানে মনে করা হয়–সাংবাদিকতা চর্চার জন্য তাত্ত্বিক বিষয় জানার প্রয়োজন নেই। এজন্য তাঁরা নতুন জ্ঞান অর্জন ও চর্চায় পিছিয়ে পড়েন অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের তুলনায়। দু'-একটি সমাধানকেন্দ্রিক রিপোর্ট বাংলাদেশের মিডিয়ায় কখনও-কখনও প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। তবে তা রিপোর্টারের অজান্তেই সমাধানকেন্দ্রিক রিপোর্টে পরিণত হয়, লক্ষ্য স্থির করে নয়।

লেখক: মেট্রো সম্পাদক, ডেইলি স্টার

ফটো-সাংবাদিকতার সেকাল-একাল

মিনহাজ উদ্দীন

৫৩ বছর পর আজ শুধু ঢাকা শহরের কয়েক হাজার আলোকচিত্রী এই পেশায় নিযুক্ত আছেন

আলোকচিত্র সময়ের, সমাজের প্রতিচ্ছবি। যার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে মানুষের শোক, সাফল্য আর সংগ্রামের দৃঢ়প্রত্যয়। আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি। হাজার শব্দের চেয়ে একটি ছবির আবেদন বেশি হওয়ায় একটি ছবি মানুষের মাঝে সঞ্চার করতে পারে অসীম সাহস, যোগাতে পারে নব উদ্যম। এক মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারে অতীতের দুঃখজনক কোনো ঘটনায় অথবা আলোকোজ্জ্বল কোনো সাফল্যের মুহূর্তে। বাংলাদেশের ফটো-সাংবাদিকরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের প্রলঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধসহ নানা ঐতিহাসিক মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপৎসঙ্কুল বর্তমানকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করেছেন আগামী প্রজন্মের জন্য।

বর্তমানে দেশে প্রতিদিন শুধু ঢাকা শহর থেকেই শতাধিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া আছে আরও অসংখ্য অনলাইন, প্রায় অর্ধ-শতাধিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সাময়িকী, লাইফ স্টাইল ম্যাগাজিন বা সাহিত্য ও লিটল ম্যাগাজিন। যার একান্ত অপরিহার্য বিষয় হলো 'আলোকচিত্র'। বাংলাদেশের ফটো-সাংবাদিকতার ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। অনেক কালজয়ী ফটোগ্রাফার বা ফটো-জার্নালিস্ট কঠিন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ওবায়দুর রহমান প্রথম স্টাফ ফটো-সাংবাদিক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ৫৩

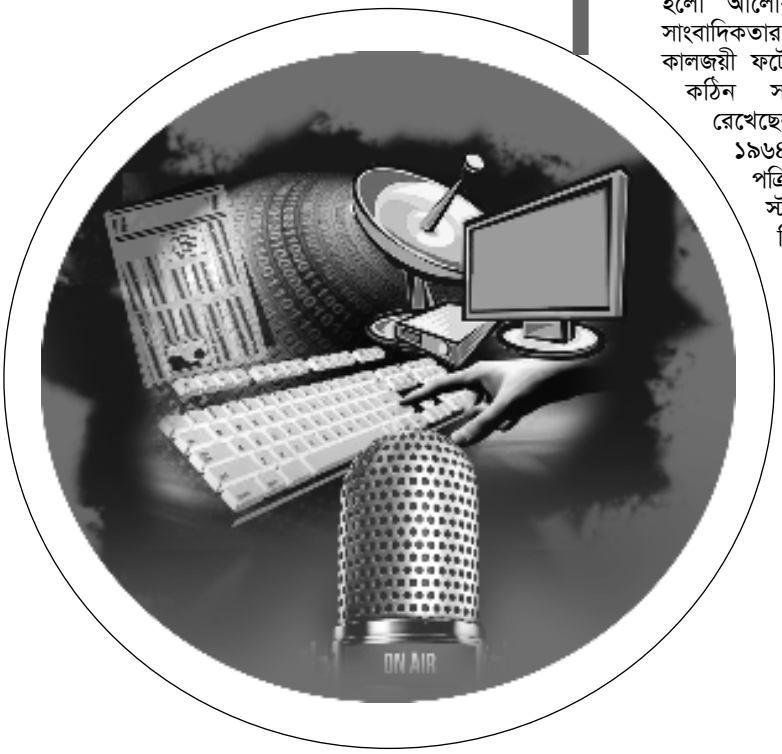

বছর পর আজ শুধু ঢাকা শহরের কয়েক হাজার আলোকচিত্রী এই পেশায় নিযুক্ত আছেন। পত্রিকাগুলোর চাহিদা বেশি হওয়ায় দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলার চোখ' ও 'ফোকাস বাংলা' নামের দুইটি ফটো এজেন্সি। যেখানে র্কমরত আছেন শতাধিক ফটো-সাংবাদিক। যারা তাঁদের দক্ষতার মাধ্যমে শুধু পেশাগত জীবনই নয়, খ্যাতি অর্জন করছেন দেশের বাহিরেও।

মীর মহিউদ্দিন সোহান বিগত ১৫ বছর ধরে ইত্তেফাকের ফটো-সংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এত বছরে ফটো-সাংবাদিকতা কতটুকু এগিয়েছে? 'আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন দেশে হাতেগোনা কয়েকজন ফটো-সাংবাদিক ছিলেন। অথচ আজ এ সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।' সময়ের সাথে ফটো-সাংবাদিকতা অনেক দূর এগিয়েছে বলেই জানালেন মীর মহিউদ্দিন। একজন সাংবাদিক ১০-১৫ বছর কাজ করে পত্রিকার বা টেলিভিশন চ্যানেলের সম্পাদক বা সিএনই হচ্ছে কিন্তু একজন জাত ফটো-সাংবাদিক ২০-২৫ বছর কাজ

করার পরও সিনিয়র ফটো-সাংবাদিক ছাড়া আর কোনো পদে যেতে পারে না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের উদাহরণ টেনে তিনি আরো জানান, দেশের সংবাদপত্রগুলোতে একজন ফটো এডিটরের পদ তৈরি করা উচিত। বছর ১৫ আগেও প্রতিদিনের সংবাদপত্রে একটি করে এক্সক্লুসিভ ছবি অবশ্যই ছাপা হতো। কিন্তু এখনকার সংবাদপত্রগুলোতে এ চর্চা একেবারে কমে গেছে। এছাড়া বাইরে গিয়ে ছবি হান্ট করা বা ঘটনার পেছনে লেগে থাকাও কমে গেছে বলে উল্লেখ করলেন তিনি। এছাড়া সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ছবি ভাগাভাগি বা লেনদেনের ফলে এ পেশায় গুণগত মান আরো কমছে বলেও জানান মীর মহিউদ্দিন সোহান।

ফটো-সাংবাদিকতায় নারীরাও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের ফটো-সাংবাদিকতার পথিকৃৎ হলেন সাঈদা খানম। তাঁর পথ অনুসরণ করে অনেক নারী ফটো-সাংবাদিক আজ প্রতিষ্ঠিত। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ফারজানা গোধূলী। একজন নারী হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্বের প্রথম সারির নিউজ এজেন্সি অ্যাসোসিয়েটস প্রেস, এপি'র স্টাফ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। যা অনেক ঝানু পুরুষ ফটো-সাংবাদিকের কাছেও আজীবন লালিত স্বপ্ন। বর্তমানে অনেক নারী পেশা হিসেবে ফটো-সাংবাদিকতাকে বেছে নিচ্ছে। এঁদের একজন দৈনিক কালের কণ্ঠের স্টাফ ফটোগ্রাফার কাকলী প্রধান। কয়েক বছর আগেও হার্ডনিউজ ফটো-সাংবাদিকতায় মেয়েদের একেবারে অযোগ্য মনে করা হলেও এখন সময় অনেক বদলেছে। মেয়েরা এই পেশায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছে। আর এক্ষেত্রে দেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোও অনেক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখাচ্ছে বলে জানালেন কাকলী প্রধান। তবে কিছু সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তিনি। ক্যামেরা হাতে রাস্তায় বের হলে এখনো অনেক মানুষ একজন নারী ফটো-সাংবাদিককে 'নায়িকা-নায়িকা' মনে করে। মনে করে, গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের শৌখিন কোনো আলোকচিত্রী। তবে সমাজের অগ্রগণ্য নারী ও বিদগ্ধজনরা এ পেশায় আসা নারীদের বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়। যা নারী ফটো-সাংবাদিকদের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করেন কাকলী প্রধান।

২০০৮ সালের ২১ ও ২২ আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হয়েছিল এক অভূতপূর্ব আন্দোলন। যা ছড়িয়ে পড়েছিল সারাদেশে। তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঢাকায় কার্ফ্যু জারি করেছিল। সেই সময়ের একটি ছবি সবার নজর কেড়েছিল। প্রথম আলো'র ফটো-সাংবাদিক খালেদ সরকার ঐ ছবি তুলেছিলেন। কিন্তু দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশ করতে পারেনি। প্রথম আলো'র নীতিনির্ধারকরা ঐ ছবি প্রকাশ করতে বিরত থাকে। তবে ছবিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল 'ডেইলি স্টারে'।

বাংলাদেশে ফটো-সাংবাদিকদের প্রথম সংগঠনের পথচলা

১৯৭২ সালের মাঝামাঝিতে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনকার পত্রিকার সাংবাদিকদের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধায় ডেকে পাঠান। যাঁদের মধ্যে রফিকুল ইসলাম, আকিল খান, মোয়াজ্জেম হোসেন বুলু, আবদুল মতিন ও বাসন্তী খ্যাত ছবির ফটোগ্রাফার আফতাব আহমেদ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁদের জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি'তে এশিয়ান ফেয়ারে বাংলাদেশের জন্য একটি স্টল বরাদ্দ করেছেন। যেখানে বাংলাদেশকে অবশ্যই অংশ নিতে হবে। কিন্তু, সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা দেশ থেকে বিশ্ববাসীর কাছে তেমন কিছু তুলে ধরার ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধু এই সাংবাদিকদের দিল্লির মেলায় বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ছবিগুলো তুলে ধরতে বললেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের যার যার কাছে যত ভালো নেগেটিভ আছে তা সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। আরও জানালেন, ভারত সরকার ঐ ছবিগুলো বিনাখরচে সবচেয়ে বড় সাইজে প্রিন্ট করে দেবে। একাজের জন্য বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে ১০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেন। ঐদিনই এই ফটো-সাংবাদিকরা দেশের আলোকচিত্রীদের জন্য প্রথম সংগঠন বাংলাদেশ ফটো একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৮৫ সালে সংগঠনটি বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্বদরবারে ফটো-সাংবাদিকতা বা ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান কিন্তু কম নয়। বিগত দিনে আমরা অনেক প্রতিভাবান ফটো-সাংবাদিককে পেয়েছি যাঁরা তাঁদের ছবির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। দেশবরেণ্য ফটোগ্রাফার শহীদুল আলমের দৃক ও পাঠশালা সংগঠন দু'টি বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফিকে অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠা করেছে। পুরাতন বিচিত্রা'র আলোকচিত্রী শামসুল ইসলাম আলমাজীর 'রং সাইড অব লাইফ' ছবির জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশ। এছাড়া পেশাদার ফটো-সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন কমনওয়েলথ প্রতিযোগিতায় ৮ টি পদক পাওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন। আনোয়ার হোসেনের অকালপ্রয়াত স্ত্রী ডলি আনোয়ারও একজন মেধাবী আলোকচিত্রী ছিলেন। দেশে ফটো-সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য দুইজন একুশে পদক পেয়েছেন। এঁরা হলেন মো. কামরুজ্জামান ও আফতাব আহমেদ। ২০০৮ সালে রয়টার্সের রফিকুর রহমানের 'ক্যামেরা অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারও দেশের জন্য একটি বিরল কৃতিত্ব। কারণ এটা রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পেশাগত পুরস্কার। সংবাদ-ফটো নিয়ে সবশেষ পুরস্কারটি আসে রানা প্লাজার ছবির জন্য। 'সবশেষ আলিঙ্গন' শীর্ষক ছবির জন্য মর্যাদাকর 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো' পুরস্কার জিতে নেন তাসলিমা আক্তার। এছাড়া রানা প্লাজা বিপর্যয়ের ছবি তুলে আরও অনেকেই পুরস্কার জিতেছেন।

'ভাবপ্রকাশ বা মনোযোগ আকর্ষণে একটি ছবি, সহস্র শব্দের চাইতে বেশি কার্যকর'। ছবি কোনো ঘটনাকে আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরতরে গেঁথে দেয়। স্মরণ রাখতে সহযোগিতা করে ঐতিহাসিক কোনো মুহূর্ত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। পাকিস্তানি বর্বরতায় ভয়ার্ত, অসহায়, নিরন্ন এসব মানুষের ছবি তখন প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায়। ঐ ছবিগুলো তখন বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিল। ভাতের থালা হাতে অপুষ্টিতে ভোগা অসহায় এক শিশুর ছবি স্থান পেয়েছিল জর্জ হ্যারিসন-পণ্ডিত রবি শঙ্করের 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশে'র টিকিট আর পোস্টারে। ২০০৩ সালে মার্চে ইরাক যুদ্ধের শুরুতে বাগদাদে মার্কিন বাহিনীর বোমা হামলায় দুই হাত হারায় পাঁচ বছরের শিশু আলী। ঝলসে যায় আলীর শরীরের বাকি অংশ। ২০০৯ সালে ইসরায়েল গাজায় স্কুলে নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ফিলিস্তিনী শিশুদের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঐ ছবিগুলো বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন ফটো-সাংবাদিকরা। বাংলাদেশে বিডিআর বিদ্রোহে নিহত সহকর্মীর কফিন কাঁধে অশ্রুসজল সেনা কর্মকর্তার ছবি আমাদের অনেকের মনেই দাগ কেটেছে। সিরিয়ার ধ্বংসলীলা ও হত্যাযজ্ঞও উঠে এসেছে ক্যামেরার ল্যান্সে। শুধু যুদ্ধ মৃত্যু আর প্রতিবাদই নয় পৃথিবীর নানা প্রান্তের আনন্দ-উৎসবের রঙ বেরঙের ছবি আমরা প্রতিদিনই পত্রিকাতে দেখি। ছবি দেখে অনেকেই আগ্রহী হয়ে সংবাদে আকৃষ্ট হই। আর তাই বর্তমান বিশ্বে ছবি ছাড়া কোনো দৈনিক পত্রিকা বা কোনো সাময়িকী আজ কল্পনাও করতে পারা যায় না। কিন্তু যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে এসব ছবি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন তাঁদের পেশাগত জীবনে এখন চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতা আর ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে তাদের কর্মক্ষেত্র। ফটো-সাংবাদিকদের তীর্থস্থান প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বের নামিদামি অনেক ফটো-সাংবাদিক। সম্মেলনে বলা হয়– বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্র আর সাময়িকীগুলো দিনে দিনে ছবিতে তাদের বাজেট ছাঁটাই করে আসছে। কারণ বড় কোনো ঘটনার পরেই পেশাদার বা অপেশাদার কোনো সাংবাদিক তার তোলা ছবি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে পত্রিকার মালিকরা ছবির জন্য বেশি টাকা খরচ করতে আগ্রহ হারাচ্ছে। ফরাসি ফটোএজেন্সি 'গামা' ২০০৯ সালে তিন মিলিয়ন ইউরো লোকসান গুণেছে। ফলে চাকরি হারিয়েছেন অনেক ফটো-সাংবাদিক। শৌখিন অভিজ্ঞ ফটো-সাংবাদিকদের সাথে সম্পর্ক চুকাতেও বাধ্য হয়েছে 'গামা'। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সত্যিই কি আগামীতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে ফটো-সাংবাদিকতা?

যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্নালিজমের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক লুথার মট প্রথম ফটোগ্রাফি ও সাংবাদিকতার সমন্বয়ে ফটো জার্নালিজম শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। যে ছবিতে তাৎক্ষণিকতা, বস্তুনিষ্ঠতা আছে, আছে কোনো ঘটনার বর্ণনা সেই ছবিই ফটো-সাংবাদিকতার যোগ্য। ১৯২৫ সালে আধুনিক ফটো-সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছিল জার্মানিতে। কারণ এ বছরই জার্মান প্রযুক্তিবিদরা আবিষ্কার করে ৩৫ মিলিমিটারের 'লাইকা' ক্যামেরা। ঐ ক্যামেরা ফটো-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা বিশাল মাইলফলক। কিন্তু ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মান চ্যান্সেলর নির্বাচিত হবার পর ফটো-সাংবাদিকতার পথচলায় বিঘ্ন ঘটে। হিটলারের গেস্টাপো বাহিনী অনেক নামি ফটো-সাংবাদিক ও ফটো-সম্পাদককে হত্যা করে। বন্ধ হয়ে যায় অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা। এ সময় অনেকেই জার্মানি ছেড়ে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

বৈশ্বিক ফটো-সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগ

১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে ফটো-সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময় লন্ডন থেকে 'পিকচার পোস্ট' ও 'দ্য ডেইলি মিরর' প্যারিস থেকে, 'প্যারিস ম্যাচ' বার্লিন থেকে, 'বার্লিন ইলাস্ট্রেটর' যুক্তরাষ্ট্র থেকে লুক, লাইফ ও নিউইয়র্ক টাইমসের মতো ইতিহাস বিখ্যাত দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। যাতে প্রকাশ করা হতো নানা ধরনের ছবি। এছাড়া এসব পত্রিকাগুলোর মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা যা ছবির উৎকর্ষ বাড়াতে সাহায্য করেছে। সেসময়ে রবার্ট কাপা, আলফ্রেড আইজেনস্টেজেন, মার্গারেট বুরকি, হোয়াইট এবং ডব্লিউ উজেনস স্মিথের মতো কালজয়ী ফটো-সাংবাদিকরা বিশ্বের নানা প্রান্তে তাদের ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। তুলেছেন সব ইতিহাস বিখ্যাত ছবি। সৈনিক টনি ভেক্কারিও ফটো-সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরগাস সি-থ্রি মডেলের ক্যামেরা দিয়ে যুদ্ধকালীন ছবি তুলে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া নানা সরঞ্জাম দিয়ে তিনি ছবি প্রিন্টও করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। এছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ছবি তুলে বিখ্যাত হয়েছিলেন রবার্ট ক্যাপা নামের এক সৈনিক। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণকারী নরম্যান্ডি ইনভেশনে ওমাহা বেঞ্চে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধে ডি-ডে'তে তিনি কিছু অসাধারণ ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্যাপা যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়েই তিনি ইন্দোচীনে মারা যান। এছাড়া ডব্লিউ উজেনস স্মিথ জাপানে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জাপানে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বের নানাপ্রান্তে অনেক সৈনিক ছবি তুলেছিলেন। সমৃদ্ধ করেছিলেন ফটো-সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগকে। এরপর ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ফটো-সাংবাদিকতার প্রভাব কিছুটা কমতে থাকে। কারণ এ সময় টেলিভিশন অনেকটাই জায়গা দখল করে নেয়। তবে সত্তর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় ফটো-সাংবাদিকতা নতুনমাত্রা পেয়েছিল। এরপর আশির দশকের মাঝামাঝিতে রঙিন ফটো-সাংবাদিকতার প্রচলন হয়। ১৯৯০ সালে এসে তা পূর্ণতা পায়। সারাবিশ্বেই ব্যাপকভাবে প্রচলন হয় রঙিন ছবির। আর এরই ধারাবাহিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রচলন হয় ডিজিটাল ক্যামেরার। যা ফটো-সাংবাদিকতায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে।

মিশেল লরেন্ট

১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাত্রির পর পাকিস্তানি বাহিনীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেসব সাংবাদিক ঢাকায় অবস্থান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম এপি'র ফটো-সাংবাদিক মিশেল লরেন্ট। পাকিস্তান বাহিনীর কড়া নজরদারি ফাঁকি দিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (বর্তমান রূপসী বাংলার) একটা ভ্যানে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যান মিশেল ও সাইমন ড্রিং। মিশেল গণহত্যার ভয়াবহ কিছু ছবি তোলেন। এরপর কয়েকদিন হোটেলে তাঁরা লুকিয়ে থাকেন। তারপর ছবির নেগেটিভ টুথপেস্টের টিউব, বেলেন্টরে ভেতরের অংশসহ বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখে পাকিস্তান ছাড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সফল হয়নি। অন্য যাত্রীর নম্বর নিয়ে খানিকটা নির্বিঘ্নে ঢাকা ছাড়তে পারলেও করাচিতে গিয়ে তাঁদের কঠিন চেকআপের সম্মুখীন হতে হয়। সেখানে তার বেশির ভাগ রিল-ই শুল্ক কর্মকর্তারা জব্দ করে। তখন ঢাকা থেকে কলম্বো-করাচি হয়ে আন্তর্জাতিক রুটের বিমানগুলো চলাচল করত।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আবার ঢাকায় আসেন মিশেল। সেবার তাঁর সাথে ছিলেন এপি'র আরেক কালজয়ী যুদ্ধ ফটো-সাংবাদিক হ্রস্ট ফাস। ১৮ ডিসেম্বর মিশেল-ফাস বিখ্যাত এক ফটোস্টোরি শুট করেন। সেদিন বিকেলে পল্টনের স্টেডিয়ামে কয়েকজন বিহারিকে হত্যা করা হয়। শত শত মানুষের সামনে। এই ছবিগুলো সারাবিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যেগুলোর জন্য ফাস-মিশেল যৌথভাবে পুলিৎজার পুরস্কার পান। এপি'র এই গুণী ফটো-সাংবাদিক মিশেল লরেন্ট ১৯৭৫ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত হন। সাইমন ড্রিং জানান, ভিয়েতকং যোদ্ধারা কাছ থেকে গুলি করে মিশেলকে হত্যা করেছিল।

শুরুর দিকের ফটো-সাংবাদিকতা

ধারণা করা হয় ফটো-সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়। বিশ্বে প্রথম ফটো-সাংবাদিকের খেতাব পেয়েছিলেন কার্লো সাজানথমারি। যিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সংগঠিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ছবি তুলেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধের মধ্যদিয়ে পূর্ণতা লাভ করে ফটো-সাংবাদিকতা। সেসময়ে টাইম, লাইফ ও প্যারিস ম্যাচের মতো পত্রিকাগুলো কাড়ি কাড়ি অর্থব্যয় করেছে ফটো-সাংবাদিকদের পেছনে। কিন্তু তীব্র প্রতিযোগিতা আর বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমে আসায় অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে। এখন আর কোনো সংবাদপত্র বা সাময়িকী দিনে ২৫০ ডলার খরচ করে কোনো সাংবাদিককে ছবি তোলার জন্য অ্যাসাইমেন্টে পাঠাতে চান না। বরং এ ক্ষেত্রে পত্রিকা কোনো অপেশাদার সাংবাদিকের ছবি, টেলিভিশন থেকে কাটা ছবি বা কোনো ফাইল ছবি ব্যবহার করেই কাজ চালাতে বেশি আগ্রহী। আর এ কারণেই অবস্থা করুণ হচ্ছে ফটো-সাংবাদিকতার। ফটো-সাংবাদিকতার এ অবস্থার জন্য আরেকটি বিষয় দায়ী তাহলো নগর সাংবাদিকতা (সিটিজেন জার্নালিজম)। বর্তমানে বিশ্বে নগর সাংবাদিকতার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া প্রযুক্তির সহজলভ্যতার জন্য এখন মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমে অনেক ভালো ছবি তোলা সম্ভব। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ৭ জুলাই লন্ডনে পাতাল রেলে বোমা হামলার ধ্বংসলীলার ছবি আমরা একজন নগর সাংবাদিকের মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমেই দেখেছিলাম।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে ফটো-সাংবাদিকতায় চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে বিশ্বের অন্যতম গামা, সিগমা, সিপা ও ম্যাগনাম ফটো এজেন্সির সাংবাদিকরা ফটো-সাংবাদিকতার রাজধানী প্যারিসে এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। যাতে চরম উদ্বেগের সাথে তুলে ধরা হয় ফটো-সাংবাদিকতার করুণ চিত্র। এতে আয়েডা'র মুখপাত্র ওলিভিয়া রিয়ান্ট বলেন, ফটো এজেন্সিগুলোকে টিকিয়ে রাখতে কর্মী ছাঁটাই ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বর্তমানে ফটো ব্যবসার মডেল আর কাজ করছে না। আর তাই এখনই পরিবর্তন আনা না হলে এ পেশাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। রিয়ান্ট বলেন, ফটো-সাংবাদিকতার দিন শেষ হয়ে আসছে। আর তাই গামা এখন দৈনিক সংবাদপত্রের বদলে সাময়িকী আর সংবাদ ম্যাগাজিনের দিকে ঝুঁকেছে।

প্যারিসের ফটো-সাংবাদিকদের উৎসবের আয়োজক জ্যাক ফ্রান্সিস লেরো আক্ষেপ করে বলেন, বর্তমানে বিশ্বে অনেক কালজয়ী ফটো-সাংবাদিক কাজ করছে; কিন্তু আমরা দিনে দিনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে শুধু সেলিব্রেটিদের দিকে ছুটছি। যাকে তিনি ফটো-সাংবাদিকতার অন্যতম মারাত্মক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন, মাইকেল জ্যাকসনের মৃত্যু একটা বড় সংবাদ ছিল কিন্তু তাই বলে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ফটো-সাংবাদিক পাঠানোর কোনো অর্থ হয় না। লরেনজো ভিরজিল নামের আরেক ডাকসাইটের ফটো-সাংবাদিক জানান বেতন কম আর চাকরি অনিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁরা বেসরকারি সংস্থার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে পেশাজীবী ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকরা সাংবাদিকতার নীতি হারিয়ে ফেলছে। টাইম ম্যাগাজিনের হয়ে টানা ২৯ বছর হোয়াইট হাউসে কাজ করা ড্রিক হ্যালস্টেড তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতা বইতে লিখেছেন, আমরা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম ফটো-সাংবাদিকতা আজ তারও বেশি নাজুক অবস্থায় পৌঁছেছে। বর্তমানে যারা ফটো-সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন তাঁদেরকে তিনি পাগল বলেও অভিহিত করেছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রখ্যাত ফটোএডিটর জন জি মরিস এ বিষয়ে বলেন, এখন আমার বয়স ৯২, আমি আমার জীবনে ফটো-সাংবাদিকতার অনেক চড়াই-উৎরাই দেখেছি। কিন্তু বর্তমান নাজুক অবস্থাকে কারো সাথে তুলনা করা যায় না। কিন্তু তারপরও আমি আশাবাদী। শত বছর পুরোনো এই পেশা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তা মানতে নারাজ জন জি মরিস।

তথ্যসূত্র

১. সাক্ষাৎকার, আফতাব আহমেদ (আলোকচিত্রী)
২. সাক্ষাৎকার, সাইমন ড্রিং (বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক, বাংলাদেশের যুদ্ধদিনের বন্ধু)
৩. সাক্ষাৎকার, মীর মহিউদ্দিন সোহান (আলোকচিত্রী)
৪. 'বাংলাদেশ ফটো জার্নাল এসোসিয়েশন' এর প্রকাশনা
5. https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/242photo-journalism/historyofphotography.html
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Photojournalism
7. http://www.americanhistory.si.edu/maroon/pj.htm
8. https://lens.blogs.nytimes.com/2017/02/15/the-uncertain-future-of-photojournalism/

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটিশ ভারতে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ইতিবৃত্ত

সাইফুল সামিন

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন পত্রিকা

ব্রিটিশ ভারতে সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ক্রমধারা মোটেই মসৃণ ছিল না। শুরু থেকেই সংবাদপত্রের পথ ছিল বন্ধুর। পুরো ব্রিটিশ আমলজুড়েই এই প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল বিদ্যমান। ব্রিটিশ ভারতে সংবাদপত্রের পথপরিক্রমার ইতিহাসে কান পাতলে বোধ করি একটি মর্মস্পর্শী আত্মচিৎকার বারবার ঘুরে-ফিরে কানে আসবে 'জন্ম থেকে জ্বলছি'।

ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চলে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে প্রণীত হয়েছে নিপীড়নমূলক নানান আইন। চলেছে গর্হিত সব অপপ্রয়াস। উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগটি থেকেই এই অশুভ তৎপরতার সূত্রপাত। তারপর যুগে যুগে চলেছে সংবাদপত্র দলন। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত নিপীড়নমূলক আইন ও প্রয়াস সম্পর্কে জানতে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে দূর অতীতে–ইতিহাসের পাতায়।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত নিপীড়নমূলক আইনসমূহের মধ্যে ছিল লর্ড ক্যানিং প্রবর্তিত ১৮৫৭ সালের পনের আইন (গ্যাগিং অ্যাক্ট); ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি (মূলত ১২৩-ক, ১২৪-ক, ১৫৩-ক, ৪৯৯ ও ৫০৫ ধারা); প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক্স অ্যাক্ট ১৮৬৭; ১৮৭৮ সালের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট; ১৮৭৮ সালের সমুদ্র শুল্ক আইন (১৯ ও ১৮১-ক থেকে ১৮১-গ ধারা); ১৮৮৫ সালের টেলিগ্রাফ আইন (৫ ধারা); ১৮৯৭ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি (সংযোজিত); ডাকঘর আইন ১৮৯৮ (২৭-ক থেকে ২৭-ঘ ধারা); ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ (৯৯-ক থেকে ৯৯-ছ ধারা); নিউজ পেপার অ্যাক্ট ১৯০৮; প্রেস অ্যাক্ট ১৯১০; রাষ্ট্র আইন (অনুরাগের বিরুদ্ধে রক্ষা) ১৯২২; সরকারি তথ্য গোপনীয়তা আইন ১৯২৩; আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬; সংবাদপত্র আইন ১৯৩১ (জরুরি ক্ষমতা); বৈদেশিক সম্পর্ক আইন ১৯৩২ (ধারা-৩); রাষ্ট্র (রক্ষা) আইন ১৯৩৪ (৩-ধারা) ইত্যাদি।

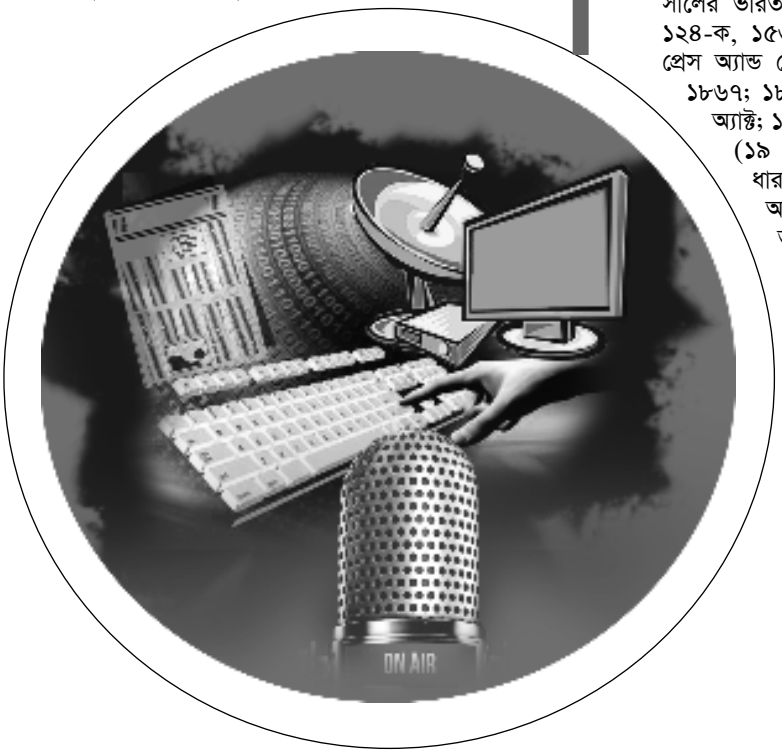

জন্মের আগেই মৃত্যু

১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। তৎকালীন কলকাতার কাউন্সিলসহ বেশ কয়েকটি স্থানে উইলিয়াম বোল্টস্ স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ লক্ষ্য করা যায়। নোটিশের সারকথা হলো, এদেশে যেহেতু ছাপাখানা নেই, তাই বিভিন্ন বিষয়ে খবরা-খবর প্রচারে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এই অসুবিধা

দূর করতেই বোল্টস্ শিগগির একটি ছাপাখানা স্থাপন করবেন। আর যতদিন না ছাপাখানা বসছে, ততদিন আগ্রহী ব্যক্তিরা বোল্টস্‌ের বাড়িতে এসে সংবাদপত্র পড়তে ও তা সংগ্রহ করতে পারবেন।

বোল্টস্ ছিলেন কোম্পানির কর্মচারী। কোম্পানির নাম ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর বেশ দুর্নাম ছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত কোম্পানি তাঁকে তিরস্কার করে। ভর্ৎসনার তীব্রতায় শেষ পর্যন্ত চাকরিই ছেড়ে দেন বোল্টস্। কোম্পানির চাকরি ছাড়ার পরই বোল্টস্ সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের এটিই ছিল প্রথম উদ্যোগ। কোম্পানির অন্দরের অনেক খবর জানতেন বোল্টস্। তাই তাঁকে নিয়ে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেয়নি কোম্পানি। বোল্টস্‌কে জোর করে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগটির জন্মের আগেই এভাবে মৃত্যু হয়।

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মরল হিকির গেজেট

১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ভারতের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র। নাম বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার। জেমস অগাস্টাস হিকি ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। তাই সবার কাছে পত্রিকাটি 'হিকির গেজেট' নামেই বেশি পরিচিত ছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল। 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই হিকির সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধ শুরু হয়। অনেকেই বলতেন, গভর্নর জেনারেল পরিষদের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ছিলেন এই ব্যাপারে হিকির পরোক্ষ ইন্ধনদাতা। কথাটি হয়তো মিথ্যাও নয়। কারণ, হিকি কখনোই ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি। হিকির আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, মিসেস হেস্টিংস ও বিচারপতি এলিজা ইম্পে। ফ্রান্সিস যতদিন ভারতে ছিলেন, হেস্টিংস ততদিন হিকির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নিতে সক্ষম হননি। কিন্তু ফ্রান্সিস ভারত ত্যাগ করার পরপরই হিকির ওপর নেমে আসে হেস্টিংসের ক্রোধের খড়্গ। প্রথমে হিকিকে ডাক বিভাগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর কারাদণ্ড এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তাঁকে পথে বসান হেস্টিংস। এভাবেই কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে মরে এ অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র 'হিকির গেজেট'।

পনের আইনের খড়্গে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন পত্রিকা। ১৮৪৭ সালে রংপুর থেকে এই বাংলা সাপ্তাহিকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। টিকে ছিল প্রায় এক দশক। রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ যে সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এদেশের সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ক্রমশ রাজনীতিমুখী হতে শুরু করে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে পত্রিকাটির প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে তৎকালীন রাজনীতি। সে কারণেই ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার পরপরই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে লর্ড ক্যানিং প্রবর্তন করেন 'পনের আইন'। ফলে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

মরার পরও রক্ষা নাই

১৮৫৭ সালের পনের আইনের কারণে অনেক সংবাদপত্রই রাজনৈতিক ভূমিকার দিক দিয়ে একবারেই দমে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী ভূমিকার কারণে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবার ইংরেজ ও নীলকরদের ক্রোধ থেকে নিস্তার পায়নি। বিভিন্ন সময়ে হরিশচন্দ্রের পরিবারের সদস্যদের ভোগ করতে হয়েছে নানা অত্যাচার।

সোমপ্রকাশের দেহত্যাগ

১৮৫৮ সালের জুনে ক্যানিং প্রবর্তিত গ্যাগিং অ্যাক্ট (পনের আইন) প্রত্যাহার করা হয়। কিছুকাল পরেই লর্ড লিটনের সময় ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ দেশি ভাষার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে জারি করা হয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। এই আইনের ফলে ১৮৭৮ সালে কলকাতার সোমপ্রকাশের প্রকাশনা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

সমালোচনা রুখতে কঠোর আইন

১৮৮০ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট রহিত করা হয়। কিন্তু এর এক দশক পরেই সংবাদপত্রের ওপর একের পর এক আরোপিত হতে থাকে কঠোরতর বিধিনিষেধ। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে রাজনীতি ও ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা।

সংবাদপত্রগুলোর এই প্রবণতা আইন করে ঠেকিয়ে রাখার সব ধরনের চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯১ সালের ২৫ জুন এক ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। ১৮৯৭ সালে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে সংযোজন করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও শ্রেণিদ্বেষ সম্পর্কিত '১২৪-ক' ও '১৫৩-ক' ধারা।

স্বদেশী আন্দোলন দমাতে 'নিউজ পেপার অ্যাক্ট'

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পরপরই সারাদেশে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে এখানকার সংবাদপত্রগুলো সমর্থন দেয়। এই অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের দু'টি ধারা ছিল। একটি প্রকাশ্যে স্বদেশী আন্দোলন। অন্যটি গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। এই দুই ধারার আন্দোলনই সংবাদপত্রগুলো থেকে ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

পরিস্থিতির প্রতিকূলতা উপলব্ধি করে ব্রিটিশ সরকার জারি করে 'নিউজ পেপার অ্যাক্ট-১৯০৮' (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্স)। এটি ছিল সংবাদপত্র সম্পর্কিত এ যাবৎকালের কঠোরতম আইন। আইনটি তীব্র ভাষায় সমালোচিত হয়। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার আইনটি রহিত করেনি। বরং ১৯১০ সালে একটি নতুন প্রেস অ্যাক্ট জারি করে ১৯০৮ সালের আইনটিকে আরও কঠোর রূপ দেয়া হয়।

ব্রিটিশ রোষে দৈনিক জ্যোতিঃর অপমৃত্যু

১৯২১ সালে চট্টগ্রামের সাপ্তাহিক জ্যোতিঃ পত্রিকাটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। মনে করা হয়, জ্যোতিঃ ছিল বাংলাদেশের প্রথম বাংলা দৈনিক। অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার কারণে শাসকগোষ্ঠীর রুদ্ররোষে পড়ে দৈনিক জ্যোতিঃ। অচিরেই বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকাটি। এতে অপমৃত্যু হয় বাংলাদেশের সম্ভবত প্রথম বাংলা দৈনিকের।

কণ্ঠরোধে জেল-জুলুম-জরিমানা

বিশেষ করে বিশ শতকের শুরু থেকে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে সহগামীর ভূমিকা পালনের কারণে পূর্ববঙ্গেও সংবাদপত্রগুলোর প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অসংখ্যবার জেল-জুলুম ও জরিমানার মতো শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে।

১৯২৩ সালের এক সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, আপত্তিকর লেখা মুদ্রণের জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয় কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরকে।

১৯২৬ সালে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশের বাণীর সম্পাদক কে সি রায় চৌধুরীর কাছ থেকে মোট ৪০০ টাকা জরিমানা দাবি করা হয়। অনাদায়ে চার মাসের কারাদণ্ডের বিধান দেওয়া হয়। একই পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক মথুরানাথ চক্রবর্তীকে ১৯৩১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড, ২৫০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

১৯২৬-১৯৩৯ সালের মধ্যে কম করে হলেও দেশের বাণী পত্রিকাটিকে ১৫ বার সতর্ক করে দেয়া হয়। প্রায় সমান সংখ্যকবার কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ পাওয়ার ঘটনা ঘটে কুষ্টিয়ার 'জাগরণ', বরিশালের 'বরিশাল হিতৈষী' ও চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে।

এছাড়া এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে 'বগুড়ার কথা', ময়মনসিংহের 'চারুমিহির', ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইস্ট বেঙ্গল টাইমস', চট্টগ্রামের অর্ধ-সাপ্তাহিক 'সুনীতি', ফরিদপুরের সাপ্তাহিক 'ফরিদপুর হিতৈষিণী' প্রভৃতি পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের রোষের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ

সুব্রত শংকর ধর, **বাংলাদেশের সংবাদপত্র;** বাংলা একাডেমি, ঢাকাস ১৯৮৫

লেখক: সাইফুল সামিন, সাংবাদিক, প্রথম আলো

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও গণমাধ্যম

ড. মাহাবুবুর রহমান

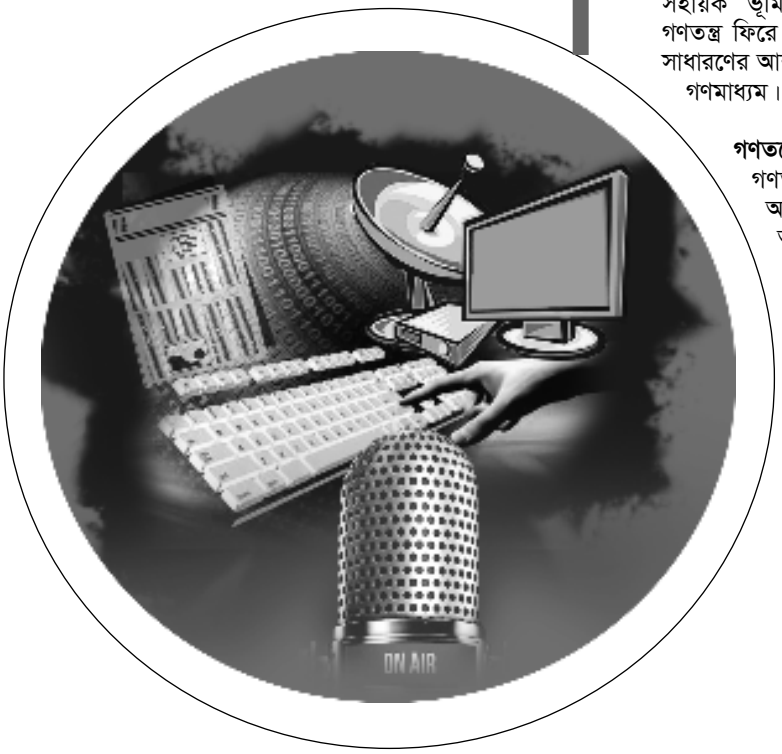

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় পাহারাদার, বিশেষত আমাদের মতো দেশে–যেখানে জনগণের অধিকার রক্ষায় নিরন্তর পাহারার বিকল্প নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে সমাজের নানা শক্তির অপকর্মকে সবার সামনে তুলে ধরে গণমাধ্যম। মানুষের স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে নিজেকে সদা ব্যস্ত রাখে। অসত্য-অসুন্দর, অন্যায় আর অকল্যাণের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলে। গণমাধ্যমে ভরসা খোঁজে অসহায় মানুষেরা। শত দোষ, দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা আর ব্যর্থতার পরও অসত্য-অসুন্দর আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখনো সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে গণমাধ্যম। যেটুকু কালিমা, যেটুকু ব্যর্থতা, যেটুকু সীমাবদ্ধতা, তার দায়ও তাদের- যারা নানাভাবে গণমাধ্যমকে, অপব্যবহার করে, কলঙ্কিত করে। এই দেশ, এই জাতির যা কিছু অর্জন, তার পেছনে গণমাধ্যমের রয়েছে বিশাল ভূমিকা; সেই '৫২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত। যে যত সমালোচনাই করুক না কেন, গণমাধ্যম ছাড়া এদেশের বাস্তবতা কতটা ভয়ংকর হতে পারত, তা বোধকরি অনেকে কল্পনাও করতে পারবে না। গণমাধ্যমের সহায়ক ভূমিকা ছাড়া এদেশে বারবার গণতন্ত্র ফিরে আসত না। তাই শেষ পর্যন্ত সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ কেন্দ্রবিন্দু গণমাধ্যম।

যেকোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়

গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি

গণতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বহুবিধ বিতর্ক থাকলেও সম্প্রতি মুক্তবাজার অর্থনীতিই হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয়। যাই হোক, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা উৎপাদনের বৃহৎ ইউনিটগুলোকে সরকারের হাতে রেখে সমতা ও সমাজ কল্যাণকে অর্থনৈতিক নীতির মর্মবাণী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নাগরিকগণকে চিকিৎসা, বেকার ও অন্যান্য কল্যাণমূলক ভাতা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে। রক্ষণশীল গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। উল্লেখ্য, যেকোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত নয়; বরং সরকারি মালিকানা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংমিশ্রণ। আজকাল অবশ্য যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে গণতন্ত্র ও বাজার অর্থনীতি সমান্তরালভাবে চলে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম তিন/চার বছর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রচেষ্টা চালালেও শেষাবধি পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারগুলো নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসন কিংবা আধা-সামরিক/আধা-গণতান্ত্রিক অথবা সামরিক বেসামরিক মিশ্র-শাসনামলে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অধিক হারে প্রত্যাহার করে ব্যক্তিখাতকে বিকাশের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার শুরু থেকেই অদ্যাবধি সঠিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবে অর্থনীতির অগ্রগতির পরিবর্তে অধোগতিই পরিলক্ষিত হয়েছে।

গণতন্ত্র সম্পর্কে এ আলোচনাকে অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য বাজার অর্থনীতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা দরকার। বাজার অর্থনীতি হচ্ছে এমন এক অর্থব্যবস্থা, যার লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল রচনা করা। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন এবং উৎপাদক ও ভোক্তার পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাজারদর নির্ধারণ করাই হচ্ছে বাজার অর্থনীতির প্রাণভোমরা। এতে অর্থনীতি সকল প্রকার নিষ্ক্রিয়তা এবং আবদ্ধতার বাইরে এসে পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বিশ্বে Stagflation-এর কারণে মুক্তবাজার অর্থনীতি নতুনভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে এবং পশ্চিমা বিশ্বের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে এর ঢেউ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশকেও আন্দোলিত করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির সাফল্যের পূর্বশর্ত অনেক। যেমন, ক্রয়ক্ষমতায় সকলের মোটামুটি সমান অধিকার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ, ব্যাপক সামাজিক গতিশীলতা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি। অর্থনীতিবিদগণ বাজার অর্থনীতির সাফল্যের চাবিকাঠি উল্লিখিত মানদণ্ডে নির্ধারণ করলেও বিশুদ্ধ মুক্তবাজার অর্থনীতি কম ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে। বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোতে এসব পূর্বশর্ত বহুলাংশেই অনুপস্থিত। এদেশের অর্থনীতি রুগ্‌ণ, উৎপাদন ব্যবস্থা নানা কারণে দুর্বল, দক্ষতা নিম্নমানের, ব্যবস্থাপনায় সঙ্কট তীব্র।

এসব কারণে পণ্যের মান নিচু হলেও দাম বেশি। ফলে, ভোক্তারা একই দামের উন্নত গুণসম্পন্ন বিদেশি দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অবস্থায় উদার আমদানি নীতি বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরো বিঘ্নিত করতে পারে। বাজার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে শিল্প উদ্যোক্তার অভাব এবং ব্যবসায়ী পুঁজির অত্যধিক দৌরাত্ম্য বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে ব্যাহত করছে। তাই প্রথমেই ব্যবসায়ী পুঁজির আকর্ষণ কমিয়ে শিল্প বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে দেশে উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখোমুখি নিয়ে যেতে হবে। উৎপাদনক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অতি জরুরি। এজন্য প্রয়োজন কর্মের প্রতি যত্নবান শ্রমিকশ্রেণি ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন। গণতান্ত্রিক পরিবেশে শ্রমিক যেমন সামাজিক নিরাপত্তাবোধ করে, তেমনি ট্রেড ইউনিয়নও স্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। স্বাধীনতা ও সামাজিক নিরাপত্তা মানে কর্ম থেকে মুক্তি নয় বরং স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকগণের দায়িত্বই হচ্ছে কর্মে অধিকতর মনোনিবেশ ও কঠোর পরিশ্রমী হওয়া। একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই ব্যক্তির ন্যায় সমাজও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

অতএব বলা যায় যে, বিনিয়োগ, উৎপাদন, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, বাজারজাতকরণ ও স্বাধীন ভোক্তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন প্রতিযোগিতামূলক স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, বাজার অর্থনীতি ও গণতন্ত্র যেন একে অপরের পরিপূরক এবং একটি অপরটির কার্যক্রমের সহায়ক।

গণমাধ্যম যে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে–এ বিষয়টি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গণমাধ্যম কী উপস্থাপন করছে, কীভাবে করছে এবং কোন সব বিষয়ের উপস্থাপনা এড়িয়ে যাচ্ছে–জনমত গঠনে এসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম: সম্পর্ক নির্ণয়

বার্নাদেতি কোল তার বই '*Mass Media Freedom and Democracy in Sieara Leon*'-এ গণতন্ত্রের একটি কাজ চালানো সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মিডিয়ার সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রের মূলকথা হলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা যা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। কোলের প্রশ্ন হলো একটি নির্বাচনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী ঘটে? কীভাবে সরকার জনসাধারণের জিম্মাদার হিসেবে জবাবদিহিতা করে? আর সব বিশেষজ্ঞের মতো এক্ষেত্রেও কোলের জবাব হচ্ছে 'গণমাধ্যম'। কীভাবে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে এবং কীভাবে জনগণের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে গণমাধ্যম, প্রাত্যহিকভাবে সেগুলো খতিয়ে দেখতে পারে।

নোম চমস্কি'র প্রোপাগান্ডা মডেল-এর কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মিডিয়া অনিবার্যভাবেই শাসকশ্রেণির হাতিয়ার এবং মিডিয়াকে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন ভাবার কোনো ভিত্তিই নেই। এই মডেল অনুযায়ী মিডিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসিতদের সম্মতি উৎপাদনে অনিবার্যভাবেই ক্ষমতাশীল শাসক–এলিট শ্রেণিকে সক্ষম করে তুলতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। নোম চমস্কি এবং এডওয়ার্ড হারম্যান তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট বইতে বলেন, আমেরিকায় কোনো বিষয়ের রিপোর্টিং পাঁচটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যথা: (১) মালিকানা; (২) বিজ্ঞাপন; (৩) দাপ্তরিক উৎসসমূহ; (৪) বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ কৌশল এবং (৫) ভাবাদর্শ।

গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপরিহার্য উপাদান। বলা যায়, গণমাধ্যম গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। গণমাধ্যম বাহিত হয়ে রাজনৈতিক তথ্য ভোটারদের কাছে পৌঁছায় এবং এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং এ সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার প্রচার-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম জনসমক্ষে তুলে ধরে। আর এ কাজ করার জন্য সমাজের ওপর নজরদারি করার অধিকার গণমাধ্যমের রয়েছে। তাহলে যুক্তি দেখানো যায় যে, এসকল কাজ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট পরিমাত্রা বজায় রেখে এবং গণতান্ত্রিক সমাজ এমন একটি নির্দিষ্ট অনুমিতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

গণমাধ্যমের কাছে গণতন্ত্র একটি বহুল কাম্য বিষয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য গণমাধ্যম অনেকরকম কাজ করে এবং বহু ধরনের সেবা সরবরাহ করে থাকে। সাইকেল পিউরেভিচ এবং জে জি ব্লুমার তাদের বহুল উদ্ধৃত 'Political Communication System and Democratic Values' শীর্ষক প্রবন্ধে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের আটটি কাজের তালিকা দিয়েছেন:

১. সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবেশের ওপর নজর রাখা এবং এই প্রতিবেশের স্থিতি-পরিবর্তন নাগরিকদের কল্যাণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে কি-না সে সম্পর্কে প্রতিবেদন করা;
২. দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি চিহ্নিত করা এবং যে সকল কারণে এটি তৈরি হচ্ছে অথবা যা এগুলো সমাধান করতে সহায়ক হবে তার সবকিছু মিলিয়ে আলোচ্যসূচি তৈরি করা;
৩. রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণের মিথস্ক্রিয়ার জন্য প্ল্যাটফরম/বাতাবরণ/পাটাতন তৈরি করা;
৪. বিভিন্ন অভিমত-দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ক্ষমতাসীন এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ করে দেয়া;
৫. সরকারি কর্মকর্তারা কীভাবে ক্ষমতার ব্যবহার করছে সে ব্যাপারে তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা;
৬. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকদেরকে উৎসাহিত করা;
৭. বাইরের যে শক্তি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করতে চায় তা প্রতিরোধ করা;
৮. দর্শক-শ্রোতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং রাজনৈতিক প্রতিবেশ সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করে তোলা।

কিন্তু গণমাধ্যম এসকল কাজ ঠিকমতো করতে পারছে না বলে একটি উদ্বেগ ক্রমশ পৃথিবীর সকল অঞ্চলে প্রসারিত হচ্ছে। গণমাধ্যম সমালোচকরা দাবি করছেন যে, কতিপয় বহুজাতিক করপোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যিক গণমাধ্যম সমাজের অবস্থাকেই সমর্থন করছে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সংবাদে এখন তথ্যের চেয়ে বেশি বিনোদন, যার ভেতরে থাকে মুখরোচক আলোচনা, দুর্নাম, যৌনতা এবং সন্ত্রাসের মিশ্রণ। রাজনৈতিক খবরগুলো যত না ভাবাদর্শকেন্দ্রিক তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিবাচক। এটাও দাবি করা হয় যে, Watchdogs are barking to the wrong things। গণমাধ্যম রাজনীতিবিদদের একান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের স্ক্যান্ডাল খুঁজে বেড়ায়; কিন্তু তাদের নীতিমালার গুরুতর প্রতিক্রিয়া

এড়িয়ে চলে। রাজনৈতিকভাবে আহত অথবা অবনমিত রাজনীতিবিদদের ওপর মিডিয়া হামলে পড়ে ভোজ-উৎসবে লিপ্ত শত হাঙরের মতো। মাঝে-মাঝেই ভুল বিষয়ে ভীতি ছড়ায় গণমাধ্যম। ক্ষুদ্র কোনো বিপজ্জনক বিষয়কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভয়ংকর করে তোলে, অথচ সমাজের অনেক বেশি ভয়াবহ বিষয় অগোচরে থেকে যায়। অতিরঞ্জিত ভয়, অনেক সময় দরকার নেই এমন ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন কিংবা এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। *গিউরেভিচ এবং ব্লুমার* বলেছেন, 'এসকল লক্ষ্য অর্জন খুব যে সহজ তা নয়। চার ধরনের প্রতিবন্ধকতা এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।'

প্রথমত, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হতে পারে সংগঠনের ভেতরে সমঝোতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা। যেমন, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমে জনগণের ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ। এই দু'টি নীতি-আদর্শের ভেতরে এক ধরনের টানাপোড়েন আছে। জনগণের তাৎক্ষণিক রুচি ও আগ্রহের সাথে জনগণের যা জানা উচিত এই বিষয়ও পরস্পর বৈপরীত্যপূর্ণ। গণমাধ্যমকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত এবং এর বাইরে যারা আছে তাদের মতামত উপস্থাপন করতে গিয়েও এক ধরনের অসুবিধায় পড়তে হয়।

দ্বিতীয়ত, কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক যোগাযোগকারীগণ অধিকাংশ সময়েই সমাজের এলিটবৃত্তের লোক। আম-জনতার পরিপ্রেক্ষিত এবং অবস্থা থেকে তাদের দূরত্ব অনেক। বস্তুত রাজনৈতিক যোগাযোগ হলো এমন লোকজনের মধ্যে বার্তা এবং চাপের পারস্পরিক আদান-প্রদান যারা দৃশ্যমানভাবে অসম এবং অসমতার একপ্রান্তে প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এবং সক্রিয় লোকজন এবং অন্যপ্রান্তে ক্ষমতাবঞ্চিত ও উদাসীন মানুষরা।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সকল দর্শক-শ্রোতাই রাজনীতিতে নিমগ্ন নন এবং তা হতে তারা বাধ্যও নন। একটি সচ্ছল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একদিকে যেমন রাজনীতিতে সক্রিয় নাগরিকবৃন্দ দরকার তেমনি অন্যদিকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার অধিকারও নাগরিকদের আছে। ফলে, রাজনৈতিক বার্তার ক্ষেত্রে দুই রকমের মুশকিল তৈরি হয়।

১. বার্তাগুলো আমাদের মনোযোগের বড় একটা অংশ আকর্ষণ করে বলেও মনে হয় না;
২. স্থান ও সময়ের জন্য বিনোদন বার্তার সাথে এগুলোর প্রতিযোগিতা করতে হয়। দর্শক-শ্রোতার মনোযোগ সেভাবে আকর্ষণ করে না বলে গণতান্ত্রিক কাজে গণমাধ্যম পুরো অঙ্গীকার নিয়ে সম্পৃক্ত হয় না।

চতুর্থত, যে আর্থ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশের ভেতরে গণমাধ্যম কাজ করছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেবল এমনসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই গণমাধ্যম এগিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে। রাজনৈতিক যোগাযোগ যে সমাজের অংশ তারই অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক এবং উপাদান নিয়ে তৈরি। এমনকি যেখানে গণমাধ্যম স্বায়ত্তশাসিত এবং এই স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত, সেখানেও গণমাধ্যম বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থারই অংশ। এই সমাজের জন্যই গণমাধ্যম কাজ করে এবং এর প্রাধান্যশীল আকাঙ্ক্ষার প্রতি সাড়া দেয়।

গণমাধ্যমের গণতান্ত্রিক ভূমিকা কেমন হবে তা নির্ধারিত হয় গণমাধ্যমের অর্থনৈতিক লক্ষ্য দ্বারা। রাজনৈতিকভাবেও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সমাজের ক্ষমতা কেন্দ্রগুলোর সাথে জড়িত। বাজার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা গণমাধ্যমের গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালনের সহায়ক নয়। গুরিভিচ এবং ব্লুমারের পর্যবেক্ষণ হলো, এ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পশ্চিমের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যম অন্ততপক্ষে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়। গণমাধ্যম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে সমাজে চার ধরনের জনপ্রিয় ধারণা প্রচলিত।

প্রথমত, গণমাধ্যম প্রতিদিনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং মতপার্থক্য তুলে ধরে ও এভাবে প্রাত্যহিক সংবাদের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি খারিজ করতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন সংবাদপত্র সাধারণ নাগরিকদের কাছে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক বিষয়ে গণমাধ্যমের অধিকাংশ রিপোর্ট এমনভাবে পরিকল্পিত বলে ধরে নেয়া হয় যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার যা করছে তা সাধারণ মানুষের আগ্রহ, সমস্যা এবং উদ্বেগের সাথে যুক্ত করে ভাবতে তাদেরকে উৎসাহিত করা।

চতুর্থত, গণমাধ্যম গণতান্ত্রিক সমাজে এক অপরিহার্য সেতুবন্ধনের কাজ করে। রাজনৈতিক জগৎ এবং এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ফারাক অনেক।

গণমাধ্যম রাজনীতির জগৎ থেকে দূরের সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতির ঘটনা ও বিষয়গুলো সহজবোধ্য করে তোলে। অমর্ত্য সেন মনে করেন, রেনেসাঁ যুগের দার্শনিকগণ যে ধরনের শুদ্ধি-ক্ষমতা প্রত্যাশা করেছিলেন গণমাধ্যমের সেই সক্ষমতা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেন স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা (transparency guarantee) দাবি করেন। যেমন, স্বাধীন প্রেস এবং তথ্যের অবাধপ্রবাহ। তিনি মনে করেন, তথ্য এবং ক্রিটিক্যাল জন-আলোচনা ভালো জননীতির জন্য অপরিহার্য। তাঁর মতে, দুর্নীতি, আর্থিক দায়িত্বশীলতা এবং ঘুষ আদান-প্রদান প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও মনে করেন, মিডিয়া কেবল দুর্নীতি নয়, দুর্যোগের বিরুদ্ধেও ওয়াচডগ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম স্বাধীন না হলে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারে না।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সীমা আছে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সীমানা দেশের সংবিধান, জাতীয় যোগাযোগ নীতিমালা, আন্তর্জাতিক আচরণবিধি অথবা কোনো মাধ্যমের নিজস্ব নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। স্বাধীনতার এই সীমা নিয়ে গণমাধ্যমের উদ্বেগ এবং সংগ্রাম কেমন হবে এ প্রশ্ন সাধারণত দু'টি বিষয় দ্বারা মীমাংসিত হয়; অর্থনৈতিক এবং ভাবাদর্শ। জনদায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার থাকে বলে প্রতিদিন গণমাধ্যমকে ভাবাদর্শ এবং অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির মধ্যকার টানাপোড়েনের ভেতরে একটি ভারসাম্য তৈরি করতে হয়। খুব ভেতরে ভেতরে গণমাধ্যম এমন একটা অবস্থা চায় যেখানে আদর্শ এবং অর্থনীতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সবচেয়ে কম। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গণমাধ্যমের জন্য এমন একটি কাম্য অবস্থার নিশ্চয়তা দেয়।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যম

বিগত দশক হতে গণমাধ্যম রাজনৈতিক অগ্রগতিতে প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নাগরিকরা তাদের বেশির ভাগ তথ্য গণমাধ্যম থেকে পেয়ে থাকে বিশেষ করে টিভি থেকে। তারা তাদের মতামত এবং রাজনৈতিক আচরণকে আইনসম্মত মনে করে যেখানে গণমাধ্যমের তথ্যই প্রধান। তার মানে এই নয় যে তারা গণমাধ্যমকে অন্ধ অনুকরণ করে। মূলত গণমাধ্যম অন্যান্য ক্ষেত্র হতে বিচিত্র হলেও এর মালিকানায় নানা ফাঁকফোকর আছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো যোগাযোগবিদরা বহু বছর আগেই বলেছেন যে, গণমাধ্যমের শ্রোতা-দর্শকমণ্ডলীরা নিষ্ক্রিয় নয়, বরং তারা বার্তার প্রাপক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের বার্তার ফলেই জনগণ প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবান্বিত করতে গণমাধ্যম বিভিন্ন ইমেজ, শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার করে। এভাবে জনগণ/বার্তার প্রাপকরা সেই বার্তাকে তাদের অনুধাবন, মূল্যায়ন, স্বার্থ এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সংকল্পবদ্ধ নয় এবং এখানে রাজনৈতিক অথবা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা জনগণের মতামতকে সর্বশেষ প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করেন। যাহোক, মিডিয়া কাঠামো রাজনৈতিক দিক বিবেচনায় সমালোচিত। এর প্রান্তীয় কাঠামো নাগরিকদের চিন্তা-ভাবনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তন আনতে পারে না। রাজনীতিতে গণমাধ্যমের নিজস্ব ভাষা ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। রাজনৈতিক চরিত্র বেগবান কিংবা কমাতে, বার্তার সাধারণীকরণ ইমেজ তৈরিতে, রাজনৈতিক চরিত্র পরিস্ফুটনে গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে।

সর্বোপরি, গণমাধ্যম রাজনীতি ও রাজনৈতিক অনুশীলনকে পরিবর্তন করে এবং রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করে। ফলাফলটা এ রকম নয় যে, গণমাধ্যমের কারণে মানুষ রাজনৈতিকভাবে কম সক্রিয় থাকে। প্রকৃতপক্ষে, গণমাধ্যম উদঘাটন করে এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে ইতিবাচকভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। যদিও এখানে কার্যকরণ সম্পর্কও উভয় পদ্ধতিতে কাজ করতে পারে। যা হোক, এটা বিশ্বাসযোগ্য যে, গণমাধ্যম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং এটার পরিণামে (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকরণ, ভাবমূর্তি তৈরি, আগ্রহী দাতাদের প্রতি আর্থিক নির্ভরতা, রাজনৈতিক অপবাদ) রাজনৈতিক বৈধতার সঙ্কট পরিলক্ষিত হয় । অন্যথায়, এটা এমন নয় যে, মানুষ রাজনীতি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। বরং তারা পূর্ববর্তী রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের অবিশ্বাস করে। বিকল্প রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আত্মনিয়োগ করে বা তৃতীয় রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। গণভাবে সমর্থন দেয় অথবা দেয় না । কিংবা প্রথাগত দল ব্যবস্থাও বাইরের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসন্ধান করে।

রাজনৈতিক ইস্যুর বৈধতাদানের সঙ্কটের পেছনে বিভিন্ন কারণ অবশ্যই রয়েছে। তার মধ্যে গণমাধ্যম-রাজনীতির সর্বব্যাপিতা বিবেচিত হতে পারে। কারণ, এটা রাজনৈতিক প্রতিনিধি এবং নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক

গড়ে তোলে। দলের গঠনতন্ত্র থাকে, একই সাথে থাকে স্বজনপ্রীতি, আমলাতন্ত্র। কিন্তু তারপরও ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান ও সুশীলসমাজের বিভিন্ন সমষ্টিগত ধরন যেমন-শ্রমিক ইউনিয়ন, দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন ও সমমনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ থাকে। গণমাধ্যম রাজনৈতিক দলের মধ্যে আংশিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং রাজনৈতিক বার্তা প্রদানকারী ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। যারা গণমাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখে এবং তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের সম্পর্ক দিয়ে ভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিকল্প তৈরি করে। এই কৌশল নাগরিকদের সন্তুষ্ট করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কিন্তু যখন জনগণের মন রুষ্ট হয়, তখন পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ফলাফল প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকে না।

গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণমাধ্যম

প্রশ্ন উঠতেই পারে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণে গণমাধ্যম কতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারে? খুব কি বেশি? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকে গণমাধ্যম কতটা গণমুখী হতে পেরেছে তার ওপর। শ্রেণিভেদে এই প্রভাবের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে। গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এর প্রভাব খুব বেশি না থাকারই কথা; কেননা সংবাদপত্র গণমানুষের (masspeople) দরজায় এখনও কড়া নাড়তে পারেনি। সংবাদপত্রের পাঠকরাই কেবল বেশি বেশি তাড়িত হয় ঐ কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পেছনে। ইলেকট্রনিক মাধ্যম হিসেবে প্রথমে আসে বেতার ও টেলিভিশনের কথা। এগুলো সংবাদপত্রের থেকে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় বিধায় প্রভাবিত করতে পারে বেশি। তাই বলে সংবাদপত্রের পাঠক ছাড়া অন্যরা যে সংবাদপত্রে চিত্রিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি দিয়ে প্রভাবিত হয় না – তাও বলা যাবে না। কেননা, এমন প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্রামে-গঞ্জে একজন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ সংবাদপত্র পড়ে আর অনেকে তা শোনে। আবার একজন পড়লে কথায় কথায় তা অনেকের মাঝে ছড়িয়ে যায়। নীতিনির্ধারণকারী শ্রেণি হিসেবে শিক্ষক যেমন গ্রামের অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, সেই লোকটি যদি সংবাদপত্রের পাঠক হন তো ব্যাপক অংশের মধ্যে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। এমনি করে গ্রামের মাতব্বর, মসজিদের ইমামদের ক্ষেত্রেও একথাটি সমানভাবে সত্য। তাই একটি কথা আমরা বলতেই পারি, সমাজের একটা বড় অংশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাঝেই গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের একটা প্রভাব আছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলোতে গণমাধ্যমের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে কোনো সরল-সোজা রাস্তা আমরা পাব না। একেকটি গণমাধ্যম একেকটি ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম আর আমাদের গণমাধ্যমের মধ্যে একটি প্রবল ঐক্যের জায়গা থাকলেও বিরোধের জায়গাটাও কম নয়। নোম চমস্কি আর এডওয়ার্ড এস হ্যারমানের গণমাধ্যমের ফিল্টারগুলো দিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের প্রবণতাগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন, যদিও অনেকখানি কাজই হয়ে যায় এগুলোর মাধ্যমে। আমাদের ভুলে গেলে চলে না যে, কর্পোরেট পুঁজির অধীনতাই আমাদের সংবাদমাধ্যমগুলোর একমাত্র জায়গা নয়। প্রথম আলো, যুগান্তরদের ক্ষেত্রে একথাটি পুরোপুরি সত্য হলেও অন্য পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রে এ কাঠামোর মাঝ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। জনকণ্ঠ গ্লোব গ্রুপের পত্রিকা হলেও এর রাজনৈতিক স্বার্থের মাঝে অন্যদিক আছে। দিনকালের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সত্য একথাটি। অন্যদিকে আবার ইনকিলাবের জায়গাটা ভিন্ন।

গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে গণমাধ্যমের করণীয়

গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়। সতের শতক থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চর্চায় এবং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ কী মতামত দিবে তা গণমাধ্যম ঠিক করে দেয় এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রভাবিত করতে পারে। জনগণকে শিক্ষাদান করে, মৌলিক অধিকার রক্ষা করে, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে কাজে উৎসাহিত করে এবং সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণমাধ্যম গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। আবার জনগণের মধ্যে ভয়, বিভ্রান্তি ও সংঘাত তৈরি করতে পারে গণমাধ্যম। গণতন্ত্রকে বিকশিত করার পরিবর্তে মিডিয়া গণতন্ত্রের জন্য সঙ্কটও তৈরি করতে পারে।

আবার গণতন্ত্রের সঙ্কট দূর করতে গণমাধ্যমই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। একচেটিয়া মালিকানা এবং স্বেচ্ছাচারিতা দমন করতে গণমাধ্যম কাজ করে থাকে। এছাড়াও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠনগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার এবং অনৈতিক সাংবাদিকতা চর্চার জন্য গণমাধ্যমের যে অদক্ষতা তৈরি হয় তা গণতন্ত্রের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

গণতন্ত্র ও উন্নয়নকে পরিচালনার জন্য বিভিন্নভাবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যম সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি প্রকাশ করতে পারে, রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে এবং সরকারকে পুনর্গঠনের জন্য আইন তৈরির কাজে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়াও গণমাধ্যম জনগণকে শিক্ষিত এবং জ্ঞানদান করার মাধ্যমে অনেক নতুন গণতন্ত্রের সূচনা করতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং রাজনীতি ও সমাজের উন্নতির সূচনা করতে পারে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব। গণতন্ত্রের বিকাশ ও চর্চায় মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সতের শতকের শুরুর দিকে ক্ষমতা অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মিডিয়াকে প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এরপর থেকে মিডিয়াকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ব্যাপক প্রচার করা হয়। এই কারণে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে মিডিয়া শিক্ষাকে বেশি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। আধুনিককালে মিডিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রের সকল কর্মকাণ্ড অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা যায়। এছাড়া বর্তমানে গণমাধ্যমে মিথ্যাচার, সংবেদনশীল এবং ভাসাভাসা তথ্য প্রচারের প্রবণতা বেশি । তারা এগুলোকে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে দেখে ।

সমকালীন গণতন্ত্রে সরকারের সকল কাজের হিসাব নিতে মিডিয়ার ভূমিকা অনন্য। সনাতন ও আধুনিক গণতন্ত্রে মিডিয়াকে প্রহরী মনে করা হয় এবং ঘটনার একমাত্র নথি হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়, যদি জনগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের থেকে ভুল তথ্য পায় তাহলে সরকার জবাবদিহি করে না। তাই মিডিয়াকে প্রহরী হিসেবে জনগণের আগ্রহের অভিভাবক মনে করা হয় যেখানে গণমাধ্যম জনগণকে সতর্ক করে দেয় কেউ যেন জনবিরোধী কোনো কাজ না করতে পারে।

পক্ষপাতযুক্ত গণতন্ত্র যেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠনগুলো দুর্বল এবং রাজনৈতিক চাপে জর্জরিত সেখানে নির্ভীক এবং কার্যকরী রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করতে পারে। যখন বিচারপতিগণ এবং অন্যান্য নীতি-নির্ধারকরা ক্ষমতাবানদের সামনে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে কিংবা তারা নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে সেই ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে কাজে আসতে পারে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রয়োজন সম্ভাব্য ঝুঁকি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিধানকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেটদের অমিতাচারের তথ্যগুলো প্রকাশ করে নির্ভীক বীরের মতো ভূমিকা পালন করা। গণমাধ্যম শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সঞ্চালক বা সংযোগকারী হিসেবেও কাজ করতে পারে। আবার সর্বসাধারণের তর্কের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করতে পারে যেটা কিনা আরো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কৌশল নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত ইউএস টিভির একজন সাংবাদিক তাঁর কলামে লেখেন যে, প্রেস নাগরিকদের জনতার মঞ্চের দিকে ধাবিত করবে এবং এমন একটি সংস্কৃতির যোগান দেবে যেখানে লোকসমাজের বা কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরে জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর প্রশ্ন করার মাধ্যমে আলোচনা হবে। গণতন্ত্রের নতুন ধারণায় মানুষের চাওয়া (আশা) থাকে যে, গণমাধ্যম পৌর সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এবং তার সাথে আরো যা করবে তা হলো আলোচনা এবং তর্কের একটি ঐতিহ্য গড়ে তুলবে যা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে কখনও সম্ভব ছিল না।

শুধু সাংবাদিকরাই নয়, বরং বিখ্যাত চিন্তাবিদরা যেমন নোবেল বিজয়ী *অমর্ত্য সেনও* গণমাধ্যমকে সমাজের সকল কিছুকে পবিত্রকরণ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখেছেন যা রেনেসাঁ যুগের দার্শনিকদের কল্পনার সাথেও মিলে যায়। *অমর্ত্য সেন* স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর মতে, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য দরকার স্বাধীন গণমাধ্যম এবং তথ্যের অবাধপ্রবাহ। তিনি মনে করেন, গণমুখী পলিসির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো তথ্য এবং জনগণের সমালোচনাপূর্ণ আলোচনা । তিনি মনে করেন দুর্নীতি, আর্থিক দায়িত্বহীনতা এবং শঠতাপূর্ণ লেনদেন রক্ষার্থে গণমাধ্যম বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। অমর্ত্য সেন গণমাধ্যমকে শুধুমাত্র দুর্নীতির বিপক্ষে রক্ষাকর্তা হিসেবেই দেখছেন না বরং এটি দুর্যোগ থেকেও রক্ষাকর্তার কাজ করতে পারে বলে মনে করছেন। তিনি বলেছেন, 'যেখানে বহুদলীয় গণতন্ত্র কার্যকর সেখানে কখনোই দুর্ভিক্ষ হয়নি।'

১৯৬০ সালের শেষের দিক হতে দাতাদেশ এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলো স্বাধীন প্রেসের গুণাবলি প্রচার করে আসছে । জাতীয় বন্ধুত্ব স্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র (উপায়) হিসেবে কাজ করে। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, প্রেস ভালো এবং কৈফিয়ত দেয়ার মতো শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে, বরং এর আরো একটি কারণ হলো এটি দারিদ্র্য বিমোচন, সর্বসাধারণের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। UNDP-এর মতে, দারিদ্র্যকে শিরোনাম করে কোনো কাজ করার জন্য শুধুমাত্র আর্থিক সম্পদ দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার সাথে প্রয়োজন উন্নয়নের জন্য সহায়ক তথ্য দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া । যাতে করে তারা প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে। সর্বোপরি, দরিদ্র মানুষরা তাদের অধিকার দাবি করতে পারবে না যদি তারা না জানে যে, তাদের অধিকারসমূহ আসলে কোনগুলো । যদি তারা সেই আইন-কানুন বা পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে সচেতন না হয়, যেগুলো ব্যবহার করে তারা তাদের নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারবে অথবা সেই প্রক্রিয়াগুলো না জানে, যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের সাথে হওয়া বঞ্চনাগুলো প্রতিকার করতে পারে, তাহলে তারা সবসময় দরিদ্রই থেকে যাবে। গণতন্ত্র কখনোই স্থায়ী হতে পারে না, যদি গরিব ও ক্ষমতাহীন মানুষগুলোকে জনতার মঞ্চের বাইরে রাখা হয়। এখানে যুক্তিটা হলো এই যে, কার্যকরি গণমাধ্যম এই ক্ষেত্রে চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। কারণ, এটিই গরিব মানুষকে জনজীবনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারে।

আদর্শগতভাবে গণমাধ্যম দারিদ্র্য, জেন্ডার, নৈতিকতা ও ধর্মীয় কারণে কোণঠাঁসা হয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে কথা বলতে শেখায়। এই গোষ্ঠীগুলোকে গণমাধ্যমে জায়গা করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের মতামত, শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বা এর কারণ, জনসাধারণের তর্ক-বিতর্কের যে মূলস্রোত তার একটি অংশে পরিণত হয় এবং তার সাথে আশাব্যঞ্জকভাবে এগুলো তাদের সাথে হওয়া অবিচারগুলোর যে প্রতিকার হওয়া দরকার সেই বিষয়ে সমাজে সকলের মধ্যে মতের ঐক্য গড়ে তোলে। এভাবে গণমাধ্যম সমাজে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে পুনর্মিলনে ভূমিকা রাখতে পারে। গণমাধ্যমের সহায়তায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বার পুনর্গঠন সম্ভব।

লোক পরিসর, মিডিয়া এবং গণতন্ত্র

গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র বিষয়ক আলোচনায় লোক পরিসর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণমাধ্যমসমূহ লোক পরিসর হিসেবে কাজ করে। সাধারণভাবে লোক পরিসর বা জনপরিসর সেই স্থান যেখানে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি ও জনমত গড়ে ওঠে। জনপরিসরের ধারণার সাথে জড়িয়ে আছে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সেই পরিপ্রেক্ষিত, যেখানে নাগরিকগণ তার অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক স্থানীয় ও উন্মুক্ত সামাজিক পরিসর গড়ে তোলেন। এই পরিসরে জনস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। জন পরিসরে অংশগ্রহণকারী এই নাগরিকরা রাষ্ট্রের গোলামি করতে বা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে আসে না। জন পরিসরে অংশগ্রহণকারী সামাজিক অধিবাসীরা মনে করেন যে, কোনো সামাজিক কাজ বা জননীতি মূল্যায়নের পূর্বশর্ত সাধারণ ও যৌথ কল্যাণ, তাই এই বিষয়টি সামনে রেখে সামাজিক সুযোগ-সুবিধার সমবণ্টনের মাধ্যমে জনকল্যাণের ভিত্তি মজবুত করতে হবে। কারণ পেইজ মনে করেন, গণতান্ত্রিক সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি শক্তিশালী এবং সমান সমান অংশগ্রহণের সুযোগসম্পন্ন জনপরিসর যেখানে সমাজের যৌথ চিন্তা-ভাবনা অবারিতভাবে প্রবাহিত হয় এবং রাজনৈতিক দল, কর্পোরেট ও রাষ্ট্রক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা প্রত্যেক সরকারি নীতি নিয়ে বিতর্ক চালাতে পারে। এখানেই জনমত আকার নেয়, আর চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনমত পুঁজির অধিকতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমাজের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী গণমানুষের একমাত্র হাতিয়ার। অনেকের কাছে আজ এরকম একটি জনপরিসরের অস্তিত্ব জরুরি। বিশেষত যখন তাদের সাধারণ বিপর্যয়ের ফলশ্রুতিতে পুঁজির বিনিয়োগ ঘটছে।

জনপরিসরের ধারণা তত্ত্বায়নে পথিকৃৎ হয়ে আছেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক যার্জেন হাবেরমাস। তিনি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 'The Structural Transformation of Public Sphere' গ্রন্থে প্রথম জনপরিসরের ইংরেজি Public Sphere শব্দটি ব্যবহার করেন। হাবেরমাসের মতে, 'জনপরিসরের মূলে আছে এমন এক সংস্কৃতি-তাড়িত সামাজিক প্রক্রিয়া যা জনমতের মুক্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

শান্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যম

যে দেশগুলোতে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব বিরাজ করে সে দেশগুলোতে কখনোই মুক্ত ও স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। গণতন্ত্র কিছু প্রতিনিধিত্বকারী দল তৈরি করে এবং সবার কথা বলার সমান অধিকার প্রদান করে যার ফলে তারা নিজেদের মধ্যে সমস্যাগুলো শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে পারে। যদি এটা সংঘাত ও দ্বন্দ্ব দ্বারা বারবার প্রতিহত হতে থাকে তাহলে গণতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। দুঃখজনক হলেও অধিকাংশ নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলো যারা পুরাতন শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কগুলো বন্ধুত্বে পরিণত করতে চায়; কিন্তু সেখানে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এগুলো থেকেই বোঝা যায় দ্বন্দ্ব তৈরিতে গণমাধ্যমের কোনো হাত থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলো চাঞ্চল্যকর বিষয়গুলো তুলে ধরে আবার অনেক সময় অর্ধেক সত্য বলে আবার পূর্বানুমানের মাধ্যমে এক ধরনের চাঞ্চল্যতা ধরে রাখে। গণমাধ্যমের সমালোচনায় অনেক সময় বলা হয় গণমাধ্যমগুলো সংঘাতপূর্ণ সংবাদ প্রচার করে প্রকৃত সত্য না জেনেই। গণমাধ্যম সমালোচকরা মনে করেন, বর্তমানে গণমাধ্যম শান্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংবাদ প্রচার করে না বরং সংঘাতমূলক সংবাদকে পূর্ণ কভারেজ দিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম সংঘাতমূলক বক্তব্য প্রচার করে সংঘাতকে আরো উস্কে দেয়। ১৯৯০ সালে রুয়ান্ডার একটি রেডিও চ্যানেল আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু করে। পরে দেখা যায়, মিডিয়া প্রতিনিয়ত দাতা সংস্থার মতাদর্শকেই কভারেজ দিতে শুরু করে।

যখন গণমাধ্যমগুলো সংঘাতের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে ঠিক সেই সময় অনেক এনজিও একপ্রকার সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যাকে বলা হয় 'শান্তি সাংবাদিকতা', যেটা খুব সতর্কভাবে রিপোর্ট করা হয় এবং চেষ্টা করা হয় বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপিত করতে। সংঘাত জড়িত উভয়পক্ষকে সমান গুরুত্ব সহকারে কথা বলার সুযোগ করে দেয় এই ধরনের সাংবাদিকতা।'শান্তি সাংবাদিকতা' সমাজের বিদ্যমান নেতিবাচক সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে মনোযোগ দেয় যুদ্ধের পরিবর্তিত প্রভাব এবং দুই দেশের বা জাতির যুদ্ধ বন্ধের জন্য অ্যাডভোকেসির ওপর। 'শান্তি সাংবাদিকতা'য় যে সকল সাংবাদিক অংশগ্রহণ করে তারাও সবাই সাধারণত বিভিন্ন ধর্মের ও আলাদা আলাদা জাতি থেকে এসে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত সংক্রান্ত খবর কভার করে থাকে।

Alliance of Independent Journalism (AJI) ইন্দোনেশিয়ার একটি সংস্থা। এই সংস্থা ২০০১ সালে আম্বন শহরের মোলাক্কাস দ্বীপে একটি মিডিয়া সেন্টার চালু করে, যেখানে মুসলিম ও খ্রিষ্টান সাংবাদিকরা একসঙ্গে কাজ করে এবং একে অন্যের সাথে তথ্য ভাগাভাগি করে নেয়। ১৯৯৭ সালে আম্বন শহরে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার সংঘাতের পর শান্তি সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যমগুলো সংঘাত প্রশমনে উদ্যোগ নেয়। পূর্বে মুসলমান ও খ্রিষ্টান সাংবাদিকরা আলাদা আলাদা কাজ করত। আর এই কারণে তথ্যের বিভক্তি ঘটত। যৌথ অংশগ্রহণের ফলে এই শত্রুতা বন্ধ হয় এবং দুই জাতির মধ্যে এক ধরনের বিশ্বস্ততার সৃষ্টি হতে থাকে। এর মাধ্যমে খ্রিষ্টান ও মুসলমান সাংবাদিকরা একে অন্যের অঞ্চলে প্রবেশে অনুমতি পায়। এটা যেমন সাংবাদিকদের এক হতে সাহায্য করেছে ঠিক তেমনি সরকার, পুলিশ, মিলিটারি, এনজিওগুলোর মধ্যে একধরনের সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এই বিশ্বাসই পরবর্তীতে জনগণের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

এমনি আরেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে মেসিডোনিয়া। ১৯৯৫ সালে এখানে বিভিন্ন দেশের রিপোর্টারদের নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়, যার ফলে বিভিন্ন দল ও দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এখানে Macedonian-language daily, Albanian language daily, Turlaish language paper, Macedonian-language radio station নামক চারটি প্রতিষ্ঠানের একজন করে রিপোর্টারকে নিয়ে কাজ করা হয়েছিল। তাদের একটি টিম–এ সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠানো হতো এবং তারা একসঙ্গে রিপোর্ট করত। তারা সংবাদের জন্য একসাথে সাক্ষাৎকার নিত এবং একসঙ্গে মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে যেত মেসিডোনিয়ার তৎকালীন পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য। তাদের রিপোর্টের মূল উপজীব্য ছিল পারস্পরিক সংঘাতের ফলে মেসিডোনিয়ায় যে সকল দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে তারা কেমন করে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে এবং জীবনযাপনের জন্য কীভাবে প্রত্যেকদিন তাদেরকে কীভাবে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যমের প্রচেষ্টা খুঁজে পাওয়া যাবে প্রচুর। পরিশেষে বলা যায়, পুঁজির প্রবল দাপটের কাছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা বর্তমানে বেশ প্রশ্নবিদ্ধ-একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আদর্শিক সাংবাদিকতার ঐতিহ্য অন্বেষণে

শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

জননীর মর্যাদায় আসীন কবি বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের 'বেগম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক

'সাংবাদিকের নীতি-নৈতিকতার নির্দেশনা কিন্তু কোনো আইন নয়। এটা আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। আইনি বাধ্যবাধকতা নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারে না (হ্যান্ডবুক, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১০)।' 'নীতিনিষ্ঠতা সাংবাদিকের পেশাদারির দাবি; মানুষ ও সত্যের প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্বের দাবি। নীতি-নৈতিকতা এ পেশাকে ভালোবাসার দাবি এবং তার ফসল, কেননা কাজটিকে ভালো না বাসলে ভালো সাংবাদিকতা করা যায় না (হ্যান্ডবুক, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০১০)।' ইউনিসেফ হ্যান্ডবুকের মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা ঐতিহাসিকভাবে আদর্শিক ধারার এবং মাটি, মানুষ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। এ অঞ্চলে সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশের যুগে এটি ছিল এক ধরনের সমাজকর্ম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্ম-কর্মও। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য অপরিহার্য যে মুদ্রণপ্রযুক্তি তা এ উপমহাদেশে প্রথম চালু করেছিলেন পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণ। তারা পর্তুগালের লিসবন থেকে রোমান হরফে বাংলা বই ছাপিয়ে এনেছিলেন। ফলে পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকদের কাছেও এদেশের তথা ভারতবর্ষের মানুষ, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা ঋণী। কেননা, মুদ্রণপ্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতির পথ ধরেই এদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটেছে। এর সাথে নাথানিয়াল ব্রাসি

হ্যালহেড, পঞ্চানন কর্মকার, উইলিয়াম ক্যারি প্রমুখ মনীষীদের নামও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। ইংরেজ শাসক ও শোষকশ্রেণি এবং তাদের তল্পিবাহকদের মুখোশ উন্মোচনে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ ও লেখালেখির কারণে ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকিকে তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোপানলে পড়ে ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়েছিল। সেই থেকে শুরু এদেশের মুদ্রিত সংবাদপত্রের পথচলা।

এরপর থেকে পরাধীন ব্রিটিশ-ভারত, পাকিস্তানি আমল-এ দীর্ঘ সময়ে এখানকার রাজনীতি, সাংবাদিকতা, সাহিত্য জগতে যাঁরাই অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সবাই যে জনস্বার্থ তথা দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন একথা সর্বজনস্বীকৃত; যদিও অনেক সময় ঐসব নেতৃবৃন্দের চলার পথ ছিল ভিন্ন। তবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাঁদের সমর্থক কোনো কোনো গোষ্ঠীর উদ্যোগেও বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্র প্রকাশিত

হয়েছে। কিন্তু এসব পত্রিকা এদেশের সাংবাদিকতার মূলধারা হিসেবে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এর কারণ হচ্ছে-দেশ ও জনগণের প্রতি এদের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে এদেশে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার আদর্শিক ধারা যাঁদের হাত ধরে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়েছিল সেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য,রাজা রামমোহন রায়, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরিশচন্দ্র মুখার্জি, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মওলানা আকরাম খাঁ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতো মনীষীদের কেউ ছিলেন শিক্ষক, মিশনারি, কেউ কবি বা সাধক, আবার কেউবা একাধারে ছিলেন বিপ্লবী, বড় মাপের রাজনীতিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পরাধীন দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তি আর অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন করে জনগণের রাজত্ব কায়েম করা, সে লক্ষ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে জনমত তৈরি করাই ছিল তাঁদের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক জীবনের ব্রত। ১৯২২ সালে সাংবাদিক-কবি, সাধক কাজী নজরুল ইসলামের পত্রিকা 'ধূমকেতু'তেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার নামে পূর্ববাংলা'র (বর্তমানে যা বাংলাদেশ) মানুষের মাথার ওপর চেপে বসা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিকে সচেতন করার দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এদেশের একদল মনীষী, তাও রাজনীতি ও সাংবাদিকতাকে একসাথে পুঁজি করেই। এঁদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণেই সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জগতটি অর্জন করেছিল এক সম্মোহনী শক্তি। এ পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া,খায়রুল কবীর, আহমেদুল কবীর, চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিন, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, রণেশ দাসগুপ্ত, মওলানা আকরাম খাঁ, জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূর উদ্দিন, আবদুস সালাম, মাহবুবুল হক, সিকান্দর আবু জাফর, শহীদুল্লা কায়সার, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, কবি তালিম হোসেন, বজলুর রহমান, কে জি মোস্তফা, সন্তোষ গুপ্ত প্রমুখ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের নাম বাঙালির মানসপটে চিরভাস্বর হয়ে আছে। রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদের পক্ষে 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার 'পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর'-এর মতো গ্রন্থ লেখা সম্ভব হয়েছিল আদর্শিক সাংবাদিকতা ও রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন বলেই।

আজকের বাংলাদেশে জননীর মর্যাদায় আসীন কবি বেগম সুফিয়া কামাল ছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের 'বেগম' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের মালিকানা এবং পরিচালনায় কবি নজরুল ইসলাম বের করেছিলেন কলকাতার প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ও সংগ্রামীজীবনের চালিকাশক্তিই ছিল দৈনিক ইত্তেফাক এবং এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। পাকিস্তান আমলে এই দৈনিক ইত্তেফাকই বাঙালির স্বাধিকারের চেতনাকে জনগণের মাঝে জাগিয়ে তুলেছিল সফলভাবে। ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরিতে এদেশের প্রগতিশীল সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসন আমলে সাড়া জাগানো 'সমকাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং সমকাল প্রকাশনীর কর্ণধার সিকান্দর আবু জাফর কর্তৃক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত ' জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই'–এই গানটিতেই প্রথম বলা হয়েছিল: 'প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত'। আর পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা' এবং বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এদেশের মুক্তিকামী মানুষকে যেভাবে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ওইসব সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদক-সাংবাদিকদের সবাই ছিলেন দেশ, জনগণ ও তাদের নিজেদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। আর সে কারণে আজও তাঁদেরকে স্মরণ করতে হয় শ্রদ্ধাভরে। সাংবাদিকতা-সাহিত্য ও রাজনীতির জগতের সেসব মনীষীদের আজীবন সংগ্রাম ও সাধনার ফসল হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা যে এক সম্মোহনী ও আকর্ষণীয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিল, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর আজ তার দায়বদ্ধতা ও আদর্শিকতা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্ন ওঠে-সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম তুমি কার? এ ব্যাপারে দীর্ঘ প্রায় ৫০বছর এদেশের সাংবাদিকতার দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদেরই একজন ওয়াহিদুল হক যিনি এদেশের সাংস্কৃতিক জাগরণের ক্ষেত্রেও ছিলেন একজন অগ্রপথিক। ২০০৫ সালে এদেশের রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার ইতিহাসের এক দুঃসময়ে তিনি লিখেছিলেন, 'বাংলার প্রেস আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম ম্যানেজ্ড প্রেসের একটি। এটি এখন কোনক্রমে রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পরিমাণ ও গুণগতভাবে বৃদ্ধি করার কোন প্রতিষ্ঠান নয়। আবদ্ধ প্রেস অন্ধকারে ও শৃঙ্খলে আবদ্ধ প্রাণীর মতোই বিকাশহীন ও পচনশীল হতে বাধ্য। এতসব বাধা-বিপত্তির পরেও বাংলাদেশের প্রেসের মূলধারা এবং প্রবণতাটি দালালির বিপরীতে। বীরত্বের প্রবণতা তার।' (তথ্যসূত্র: স্বাধীনতা ও সংবাদপত্র, দৈনিক সংবাদের বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ২৬ মে ২০০৫, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২)। ২০০৫ সাল পেরিয়ে এখন চলছে ২০১৭ সাল। সাংবাদিকতার আদর্শিক দিকটুকু এখন কোন পর্যায়ে আছে তা সংশ্লিষ্ট সচেতন মহল সকলেরই জানা। আদর্শিক সাংবাদিকতা যে এখন পেশাদারি সাংবাদিকতায় পরিণত হয়েছে, বড় বড় গণমাধ্যম (মিডিয়া হাউস) ও দৈনিক পত্রিকাগুলো যে কর্পোরেট হাউসগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সেকথা বলতে এখন কেউ আর কোনো দ্বিধা করে না। এই পেশাদারি সাংবাদিকতার মধ্যে অবস্থান করে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আদর্শিক সাংবাদিকতা করাই এ সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ও আদর্শ তুলে ধরার জন্য একজন সাংবাদিকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তার ব্যক্তিগত সাহস। এ প্রসঙ্গে দৈনিক যুগান্তরের প্রথম সংখ্যায় প্রখ্যাত সাংবাদিক-রাজনীতিক নির্মল সেনের একটি লেখা উল্লেখযোগ্য। নির্মল সেন লিখেছেন, 'অধুনা অবলুপ্ত দৈনিক বাংলা দৈনিক পাকিস্তান নামে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, বার্তা সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক। তখন পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন চলছিল। মুসলিম লীগের প্রার্থী ছিলেন জেনারেল আইয়ুব খান। বিরোধী দলের প্রার্থী ছিলেন মরহুম মোহাম্মদ আলী জিন্না'র বোন মিসেস ফাতেমা জিন্নাহ। ফাতেমা জিন্না'র সমর্থনে প্রচারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন জেনারেল আজম খান। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন মোনেম খান। একদিন সন্ধ্যায় দৈনিক পাকিস্তান অফিসে গিয়ে দেখি বার্তা সম্পাদক মোজাম্মেল হক ছটফট করছেন। আমি তার কক্ষে ঢুকতেই আমার হাতে একটি খবর ধরিয়ে দিলেন। লেখা আছে জেনারেল আজম খান গোপালগঞ্জের সাতপাড়ে মিস জিন্না'র সমর্থনে প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন। তাকে কালো পতাকা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ওই সংবাদে কোনো প্রেরকের নাম নেই। ঠিকানা নেই। কোনো স্বাক্ষর নেই। খবরটি এসেছে মোনেম খানের গভর্নর ভবন থেকে। আমি রাতের পালায় কাজ করছি। মোজাম্মেল দা বললেন–এ খবর কী তুমি ছাপবে? তুমি না ছাপলেও প্রেস ট্রাস্টের ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' এই খবর ছাপবেই। তখন দৈনিক পাকিস্তানের অস্তিত্ব নিয়েই টান পড়বে। মোজাম্মেল দা এরপর একটু দম নিয়ে বললেন, দৈনিক পাকিস্তানের মুখ চেয়ে সবাই এ খবরটি ছাপতে বলছে। ইংরেজি লেখা খবরটি তুমি নিজে অনুবাদ করো। শেষের পাতায় ১৮ পয়েন্ট শিরোনাম দিয়ে ছেপে দিও। এই বলে মোজাম্মেল দা বাইরে গেলেন এবং একটু পরে আবার ফিরে এলেন এবং আমার কাছ থেকে খবরটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি বললেন, 'It is unethical' এটা সংবাদপত্রের নীতিমালার পরিপন্থী। শুধু গভর্নর ভবন থেকে ফোন করলে হবে না, স্বাক্ষর দিতে হবে। স্বাক্ষরহীন খবর আমি ছাপব না। প্রয়োজন হলে পদত্যাগ করব'। আমাকে কোনো কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে তিনি বাসায় চলে গেলেন। কিন্তু পরেরদিন মোজাম্মেল হকের চাকরি যায়নি। যারা তাকে ওই খবর দিতে বলেছিলেন–তারাই তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন কঠিনভাবে। কাজেই মনে করি, সাহস সাহসের জন্ম দেয়। আইন আর মালিকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে সাহসী হওয়া যায় না। অনুগত কেরানি হওয়া যায়। ইত্তেফাক নিয়ে এমন একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল। ইত্তেফাক নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে সেকালের পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্রে ধর্মঘট হয়, পরের দিন আমি রাতের শিফটে কাজ করছি। তখন তোয়াব খান বার্তা সম্পাদক। সেদিন রাতে তিনি আসেননি।' নির্মল সেন লিখেছেন-পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলতাফ হোসেন আমাকে ফোন করে বললেন, সংবাদপত্রের ধর্মঘট সম্পর্কে একটি খবর যাবে। এ খবরটি আপনাকে দৈনিক পাকিস্তানে ছাপাতে হবে। আমাদের ব্যবস্থাপনা

সম্পাদক আহসান আহমদ আশক্ও আমাকে ফোন করে একই কথা বললেন। রাত ১২টার দিকে খবর এলো, এপিপি'র খবরে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকা সত্ত্বেও ঢাকায় ঐদিন পাঁচটি দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। তবে ঐ পাঁচটি দৈনিকের মধ্যে দৈনিক পাকিস্তানের নাম নেই। আশক্ সাহেব বললেন, আপনি নামটি ঢুকিয়ে দিন। আমি বললাম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সংবাদটি এপিপি দিয়েছে। সংশোধন এপিপিকেই করতে হবে। আমি করতে পারব না। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এপিপিই সংশোধনী দেবে। রাত ১২টার পর এপিপি'র সংশোধনী এলো। আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি–এই ডাহা মিথ্যা খবর আমি ছাপব না। আমি কৌশলগ্রহণ করলাম। আমি বার্তা সম্পাদক তোয়াব খানকে একটি চিঠি লিখলাম। আমি লিখলাম– রাত ১২টার পর এই খবরটি এসেছে। এর আগে সব সহ-সম্পাদক বাড়ি চলে গেছেন। এ খবর অনুবাদ করার মতো কেউ নেই। আমার চাকরির শর্তে অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ খবর অনুবাদ করতে আমি অক্ষম। আপনার জ্ঞাতার্থে খবরটি রেখে গেলাম। আমার বিরুদ্ধে এজন্যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আমার চাকরিও যায়নি। আমি কোনো সতর্কীকরণের চিঠিও পাইনি। অনেকে বলতে পারেন-সেকালে শক্তিশালী ইউনিয়ন ছিল; তাই এ সাহস দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু সত্যি কি তাই? এ পেশায় আসতে হলে কিছুটা হলেও সাহস দেখাতে হয়। সাহস থাকতে হয়। এ সাহস কেউ ধার দেয় না। আমার এ লেখা শেষ করার আগে আর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। সেও রাতের পালা। জাতীয় সংসদের এক ডেপুটি স্পিকার চাঁদপুর থেকে ফোন করলেন। ফোনে তিনি বললেন–আমি ডেপুটি স্পিকার অমুক বলছি। একটি খবর দিতে হবে। আমি বললাম– চাঁদপুরে আমাদের সংবাদদাতা আছে। তাকে খবরটি দেন। তিনি একটু উষ্ণ হলেন। বললেন–জানেন, আমি অমুক ডেপুটি স্পিকার বলছি। আমি বললাম–জানি না, কারণ ফোনে তো মুখ দেখা যায় না। এবার তিনি আরো চটলেন। বললেন– সম্পাদক শামসুদ্দীন আছে? আমি বললাম– শামসুদ্দীন নয়, বলুন আবুল কালাম শামসুদ্দীন আছেন? তিনি বললেন–ম্যানেজিং এডিটর আশক্ আছে? আমি বললাম-আশক্ নয়, বলুন, আশক্ সাহেব আছেন?

নির্মল সেন লিখেছেন 'ফোন কেটে গেল। কিছুক্ষণ পর আশক্ সাহেব ফোন করলেন। বললেন–কি হয়েছে? জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। বললাম–তাকে এপিপি'তে খবর দিতে বলুন। আমি ফোনে তার খবর নেব না। গভীর রাতে সে খবর এপিপি দিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই সে খবর আমি দেইনি। শুনেছি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে তিনি আমার বিরুদ্ধে ১৮ পাতার স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। আমার কিন্তু চাকরি যায়নি। আর আমি যতদূর জানি, পেশার জন্য সাহস দেখিয়ে আমাদের মধ্যে যাদের চাকরি গেছে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়।' (তথ্যসূত্র: সাহস দেখাতে হবে, নির্মল সেন, দৈনিক যুগান্তর, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৫৩)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের গণমাধ্যম জগতে সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ব্যাপক পরিবর্তন বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের একটি মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'সামরিক শাসন থেকে গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জগতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে এক্ষেত্রে। গণমাধ্যমকে দেশ, জাতি ও সমাজের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে প্রয়োজন নির্মোহ, বস্তুনিষ্ঠ তথা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা'। (সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১১)।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র তথা সমগ্র গণমাধ্যম আজ পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন এবং কোনো গণমাধ্যম ইচ্ছা করলেই যেকোন বিষয়ে সঠিক তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারে। বর্তমান সরকারের আমলে তথ্য অধিকার আইন পাসের মাধ্যমে এদেশে অবাধ তথ্যপ্রবাহের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার একটা বড় দায়িত্ব সাংবাদিকদের ওপরই বর্তায়। এ দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা পূরণে, এর ঐতিহ্যবাহী আদর্শিক দিকটিকে সচেতনভাবে ধারণ ও লালন করার জন্য আজকের দিনের গণমাধ্যমের মালিক, গণমাধ্যমকর্মী তথা সাংবাদিকদের ভূমিকা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, সময়ের চাহিদা ও এর পরিবর্তন-রূপান্তর-বিবর্তনের মধ্যদিয়ে আজকের দিনের গণমাধ্যমের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা ও নির্ভরতা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল প্রসারের এই সময়ে সাংবাদিক তথা গণমাধ্যমের এই মহান দায়িত্ব পালনে আরো সচেতন, আত্মপ্রত্যয়ী ও প্রতিশ্রুতিশীল করে তুলতে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিকতা এবং অতীতের গুণী-জ্ঞানী ও সমাজ-হিতৈষী সম্পাদক ও সাংবাদিকদের জীবনী ও কর্ম আজকের দিনের সাংবাদিকদের চলার কঠিন পথকে সহজ করে তুলতে পারে।

66

অনেকে বলতে পারেন-সেকালে শক্তিশালী ইউনিয়ন ছিল; তাই এ সাহস দেখাতে পেরেছেন। কিন্তু সত্যি কি তাই? এ পেশায় আসতে হলে কিছুটা হলেও সাহস দেখাতে হয়। সাহস থাকতে হয়। এ সাহস কেউ ধার দেয় না

99

ভুলে গেলে চলবে না যে, সাংবাদিকতা শুধুই মাত্র রুটি-রুজির উপায় নয়, এর সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আদর্শিকতা যুক্ত হলে এ পেশায় নিয়োজিত লোকদের জন্য এনে দিতে পারে সমাজসেবার এক মহান সুযোগ। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ পেশায় নিয়োজিত অনেকে এখনো সাহসী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন অনেক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে। ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ২৩৭ বছর (১৭৮০-২০১৭) এবং বর্তমান বাংলাদেশ ভুখণ্ডে সাংবাদিকতার দীর্ঘ প্রায় ১৭০ বছরের (১৮৪৭–২০১৭) গৌরবোজ্জ্বল দিকসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট গুণী ও নিবেদিত-প্রাণ সাংবাদিকদের জীবন ও কর্মগুলোর বিশ্লেষণ এ পেশায় নিয়োজিত সকলের মাঝে সঞ্চার করতে পারে নতুন উদ্দীপনা ও প্রতিশ্রুতির।

নির্মল সেন ও আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মত এমন সৎ ও সাহসী সাংবাদিক এখনো আছেন। আদর্শিক সাংবাদিকতার পতাকাবাহী এসব গুনী সাংবাদিক তাদের মেধা ও সাহস দিয়ে আজও নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে আছেন। মিডিয়া হাউজ ও ব্যবসায়িক গ্রুপগুলো গণমাধ্যমের মালিকানা কিনে নিলেও সাংবাদিকের মাথা ও কলম তারা কিনে নিতে পারেনি।

লেখক: রিসার্চ অফিসার, পিআইবি

সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্য থাকলে রুটি-রুজির আন্দোলন সফল হতো

... কে জি মোস্তফা

‘তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে’, ‘আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন, কপোলের কালো তিল পড়বে চোখে’, ‘তোমরা যাদের মানুষ বলো না’ এই গানগুলো যখন আমরা শুনি তখন স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে কে লিখেছেন এগুলোর সুললিত বাণী? এ রকম আরো অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গীতিকার আর কেউ নন তিনি হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কে জি মোস্তফা। সাংবাদিক হলেও কে জি মোস্তফা নন্দিত গীতিকার হিসেবে বেশি পরিচিত। তিনি একজন স্বনামধন্য কবি এবং কলামিস্টও।

আমাদের সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায় তাঁর আসন অতি উচ্চে। ষাট দশক থেকে গানের জন্য শ্রোতাদের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে আছেন তিনি। যারা কে জি মোস্তফার নাম জানেন না তারাও তার গানের সাথে পরিচিত। এই নির্লোভ ও প্রচারবিমুখ মানুষটি আজও বাংলার গ্রাম-গঞ্জে বিশেষ করে সঙ্গীতপ্রিয় মানুষের কাছে অতি পরিচিত। প্রায় এক হাজারের বেশি গান লিখেছেন তিনি। উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিল্পী তালাত মাহমুদসহ অনেকেই তাঁর গানে কণ্ঠ দিয়েছেন। সাহিত্য-সঙ্গীত, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতে কে জি মোস্তফা একটি অনন্য নাম। নিরীক্ষা'র পাঠকদের জন্য এই গুণী সাংবাদিক, গীতিকারের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মো. কবির হোসেন কাব্য।

প্রশ্নঃ আপনার জন্ম ও শিক্ষাজীবন নিয়ে বলুন?

কে জি মোস্তফা: ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানায় নানা বাড়িতে আমার জন্ম। নোয়াখালী জেলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং চৌমোহনী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ১৯৬০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করি।

প্রশ্নঃ সাংবাদিকতায় কীভাবে এবং কেন এলেন?

কে জি মোস্তফা: দৈনিক ইত্তেহাদে ১৯৫৮ সালে শিক্ষানবিশ হিসেবে সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। ছেলেবেলা থেকে আমার লেখালেখির প্রতি ঝোঁক ছিল, স্কুলে পড়ার সময় ছড়া লিখতাম। আর আমি সাংবাদিক হতে চেয়েছিলাম বলেই এ পেশায় আসা।

প্রশ্নঃ আপনার সাংবাদিক জীবনে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন?
কে জি মোস্তফা: 'ইত্তেহাদে' শিক্ষানবিশি হিসেবে কাজ শুরু করি ১৯৫৮ সালে। ওই বছরই 'দৈনিক মজলুমের' সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হই এবং পত্রিকাটির বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত কাজ করেছি। এরপর দীর্ঘ বিরতি। ১৯৬৮ সালে সাপ্তাহিক 'জনতায়' সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হই। ১৯৭০ সালে সাবেক মন্ত্রী মরহুম কফিল উদ্দিন চৌধুরীর প্রেস সেক্রেটারি নিযুক্ত হই। ১৯৭২ সালে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' এবং পরে 'দৈনিক স্বদেশের' চিফ রিপোর্টার, তারও পরে 'দৈনিক জনপদের' কূটনৈতিক রিপোর্টার হিসেবে কাজ করি। 'নুপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকারও সম্পাদনা করতাম। ১৯৭৬ সালে বিলুপ্ত সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক হিসেবে বিসিএস (তথ্য) ক্যাডারভুক্ত হই এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হই। পদোন্নতি পেয়ে প্রথমে সম্পাদক, পরে সিনিয়র সম্পাদক পদে উন্নীত হই। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর থেকে প্রকাশিত কিশোর পত্রিকা 'নবারুণ', সাহিত্য মাসিক 'পূর্বাচল', সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ সংবাদ' এবং সর্বশেষ 'সচিত্র বাংলাদেশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ওই সময় বাংলাদেশ স্কাউটসের মুখপাত্র 'অগ্রদূত'-এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলাম।

প্রশ্নঃ আপনার কবি এবং গীতিকার হয়ে ওঠার পেছনের গল্প বলুন?
কে জি মোস্তফা: ছাত্রজীবন থেকে আমি ছড়া, কবিতা লিখতাম। ১৯৫৬ সাল থেকে কবিতা ও ছড়া পত্রপত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) থেকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সনদপত্র লাভ করি। ১৯৬০ সালে আবু হেনা মোস্তফা কামালের উৎসাহে গান লেখা শুরু করি। সেই থেকে গীতিকার জীবনের বীজ বপন হলো। সেই সময় সহপাঠীরা কেউ কেউ শিল্পী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার লেখা গান গাইতেন। এঁদের মধ্যে মোস্তফা জামান আব্বসী, কাজী আনোয়ার হোসেন, ফেরদৌসি বেগম, আঞ্জুমান আরা, নাজমুল হুদা বাচ্চু, সৈয়দ আবদুল হাদী প্রমুখের কথা মনে পড়ছে। মূলত এঁদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় গান লেখা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ চলচ্চিত্রের গান লেখা কীভাবে শুরু করলেন?
কে জি মোস্তাফা: তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে শেষ বর্ষের ছাত্র। পরিচালক এহতেশাম ও সঙ্গীত পরিচালক রবীন ঘোষ 'রাজধানীর বুকে' ছবির জন্য তালাত মাহমুদের কণ্ঠে দুটো গান লিখবার জন্য একজন তরুণ গীতিকার খুঁজছিলেন। তাঁরা আমাকে এই দুটো গান লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সরাসরি সিনেমায় গান লেখার অফার, তাও আবার উপমহাদেশের তৎকালীন প্রখ্যাত গায়ক তালাত মাহমুদ। শুরুতে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। তবে আত্মবিশ্বাস হারাইনি, এভাবেই ১৯৬০ সালে 'রাজধানীর বুকে' চলচ্চিত্রের মধ্যদিয়ে চলচ্চিত্রে গান লেখা শুরু। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রে গান লিখেছি।

প্রশ্নঃ সিনেমার গান এখন কেমন হচ্ছে এবং এর ভবিষ্যৎ কী?
কে জি মোস্তফা: সময়ের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের সিনেমা শিল্প, কৈশোর অতিক্রম করে টগবগে যৌবনের পটভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সিনেমা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূর এগিয়ে গিয়েছে। এ হাঁটা তাদের অগ্রগমন কিন্তু আমাদের হচ্ছে পিছু হাঁটা। তবে আমাদের সঙ্গীত জগতে নতুন গীতিকার আসছে- এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। অনেকে জীবনমুখী গানে আজকের সমস্যার কথা বলছে বেশ ঝাঁঝালো সুরে। চমৎকারভাবে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের যুবসমাজের প্রতিবাদ ও চেতনা। কিন্তু একই সঙ্গে এমন কিছু গীতিকার ও শিল্পীর গান শুনতে বাধ্য হচ্ছি যেগুলো কোনো অর্থেই গান নয়। বলা যায়, সেগুলো সুরে সুরে বলা কথা। আগামীদিনে শ্রোতাদের কাছে যদি এই গানগুলো বেঁচে থাকে তবে তা এক সাংঘাতিক সাংস্কৃতিক দুর্ঘটনা হয়ে ওঠবে-এটাই আশঙ্কা।

প্রশ্নঃ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের সাথে আপনার স্মৃতি সম্পর্কে বলুন?
কে জি মোস্তফা: আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমার এই জীবনে অনেক গুণী দেশি ও বিদেশি সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পেরেছি। তাঁদের মধ্যে রবীন ঘোষ, সত্য সাহা, ননীন চ্যাটার্জি, সুবল দাশ, আনোয়ার উদ্দিন খান প্রমুখ।

প্রশ্নঃ বর্তমান সাংবাদিকতাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
কে জি মোস্তফা: বর্তমান সাংবাদিকতায় কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসার খুব বেশি অভাব। আমি আশাবাদী সবকিছু সাধারণ হলে আমরা আবার গর্ব করব এই সাংবাদিকতা নিয়ে।

প্রশ্নঃ সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে আপনার পরামর্শ কী?
কে জি মোস্তফা: সাংবাদিকদের ভাষাগত শিক্ষার উন্নতি করতে হবে, বেশি বেশি বই পড়তে হবে। ভাষা ও বানানের অজ্ঞতার উন্নতি ঘটাতে হবে।

প্রশ্নঃ সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো আজ বহুধা বিভক্ত এ বিষয়ে কিছু বলুন?
কে জি মোস্তফা: আসলে সাংবাদিকদের সংগঠনগুলো বিভক্তির মূল কারণ রাজনীতি। আসলে সাংবাদিকদের মধ্যে এরকম হওয়া কাম্য নয়। কেউ আওয়ামী লীগ বা বিএনপিপন্থী, কেউবা অন্য একটা থাকতেই পারে। কিন্তু দুঃখজনক আমাদের এখানে দলগত বিভাজন হয়ে গেছে। আমি আশা করব, সাংবাদিকরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেন সাংবাদিক থাকে। সাংবাদিকদের মধ্যে যদি ঐক্য থাকত তাহলে রুটি-রুজির দাবি আদায়ে প্রতিটি আন্দোলনই ইতিবাচক ফল নিয়ে আসত।

প্রশ্নঃ আপনার প্রথম প্রেম এবং সংসার জীবন?
কে জি মোস্তফা: তথাকথিত প্রেম বলতে যা বোঝায় ওভাবে প্রেম করা হয়নি আমার। আমার প্রেম বলতে কবিতার সঙ্গে প্রেম, বইয়ের সঙ্গে প্রেম। আমি বই পড়তে অনেক বেশি পছন্দ করতাম। পারিবারিক পছন্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় বৈবাহিকী জীবন শুরু করি। আমার স্ত্রী গৃহিণী এবং আমাদের তিন ছেলে সন্তান রয়েছে।

প্রশ্নঃ আপনি নাটক বা চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন কি?
কে জি মোস্তফা: একসময় আমি নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালনার দিকে ঝুঁকেছিলাম। আমি 'মায়ার সংসার', 'অধিকার' ও 'গলি থেকে রাজপথে' ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি।

প্রশ্নঃ আপনার প্রকাশিত গ্রন্থ কী কী?
কে জি মোস্তফা: কাব্যগ্রন্থ:- ১. কাছে থাকো ছুঁয়ে থাকো, ২. উড়ন্ত রুমাল, ৩. চক্ষুহীন প্রজাপতি, ৪. সাতনরী প্রাণ, ৫. আয়নাতে ঐ মুখ দেখবে যখন, ৬. এক মুঠো ভালোবাসা, ৭. প্রেম শোনে না মানা।
ছড়ার বই:-১. শিশু তুমি যিশু, ২. কন্যা তুমি অনন্যা, ৩. মজার ছড়া শিশুর পড়া।
গানের বই:-১. তোমারে লেগেছে এতো যে ভালো
২. তৃষ্ণা আমার হারিয়ে গেছে।
গদ্যগ্রন্থ:-১. কোথায় চলেছি আমি, ২. যেতে হবে কত দূর, ৩. কত দূর অচিনপুর, ৪. কত চিঠি কত স্মৃতি (প্রকাশিতব্য)

প্রশ্নঃ আপনার জীবনের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলুন?
কে জি মোস্তফা: আমার জীবন শুরু হয়েছে শূন্য থেকে। আমার জীবনের মূল সম্পদ পড়া। আমি না চাইতে অনেক বেশি পেয়েছি?।

প্রশ্নঃ আপনার সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বলুন?
কে জি মোস্তফা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডাকসু' শ্রেষ্ঠ কবির সনদপত্র-১৯৫৯,
কুমিল্লা অলক্ত সাহিত্য সংসদ সংবর্ধনা পদক-১৯৮৭,
জাতীয় প্রেস ক্লাব লেখক সম্মাননা ও পদক- ২০০৩ ও ২০০৯,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ললিতকলা বিভাগ 'সফেন'- এর সম্মাননা ও পদক ২০০৪,
সৃজনী সঙ্গীত গোষ্ঠীর সম্মাননা ও পদক-২০০৫,
বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ লেখক পুরস্কার-২০১০,
বাংলাদেশ স্কাউটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক-১৯৯২,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতবিভাগ কর্তৃক দেশবরেণ্য গীতিকার হিসেবে সম্মাননা ও পদক-২০১৬,
বরেণ্য গীতিকার হিসেবে 'শুভজন' সম্মাননা ও পদক প্রদান- ২০১৬,
লক্ষ্মীপুর জেলা সাহিত্য সংসদ দেশবরেণ্য গীতিকার, কবি ও কলামিস্ট হিসেবে সংবর্ধনার মাধ্যমে পদক প্রদান ২০১৭

প্রশ্নঃ আপনার অবসর কাটে কীভাবে?
কে জি মোস্তফা: অবসর তেমন একটা পাই না, যতটুকু পাই বই পড়ি, আর হোমিও চিকিৎসায় সময় দিচ্ছি।

প্রতিবেদক: মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
কে জি মোস্তফা: আপনাকেও ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে নিরীক্ষা'র পাঠকদের প্রতি এবং পিআইবি পরিবারের প্রতি আমার শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার ও আবেগমূল্য

শুভ কর্মকার

বিজ্ঞাপনে রঙের সঠিক ব্যবহার করা গেলে মানুষ তাঁর জীবনকে খুঁজে পাবে সেই বিজ্ঞাপনের মাঝে

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে রঙের ব্যবহার খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়। ১৯৯২ সালেও দেশের প্রাধান্যশীল সংবাদপত্রসমূহ সাদাকালোতেই প্রকাশিত হতো। শুরুর দিকে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা রঙিন প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে রঙের ব্যবহার বাড়তে থাকে। তবে চিত্রশিল্পীরা অনেক আগে থেকেই রঙের ব্যবহার করে আসছেন। রাসায়নিক রঙের পূর্বে তারা প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন রঙ তৈরি করতেন ও ছবি আঁকতেন। তেমনই একজন চিত্রশিল্পীর নাম পাবলো রুইজ ই পিকাসো। যিনি পাবলো পিকাসো নামে পরিচিত। বিশ্ব বিখ্যাত এ চিত্রশিল্পীর 'উইমেন অব আলজিয়ার্স' ছবিটি বাংলাদেশী মুদ্রায় ১৪০ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। মজার বিষয় হলো তার এই তৈলচিত্রটিতে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ছিল। বিখ্যাত এ শিল্পী রঙের ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, 'ভালো ফিচারের মতো রঙ মানুষের আবেগ পরিবর্তন করে দেয়।' রঙ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আবেগকে ফুটিয়ে তোলে।

ফরাসি দার্শনিক, লেখক এবং সাংবাদিক আলবেয়ার কাম্যু *"দি আউটসাডার"* উপন্যাসে প্রাত্যহিক জীবন ও আবেগ প্রকাশে রঙের ব্যবহার সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার এই উপন্যাসের নায়ক মারসোর মা মারা গেলে লেখক মারসোকে কালো রঙের পোশাক পরান। লেখক এখানে কৌশলে বলেন, আমাদের সমাজে আবেগের পরিবর্তন করতে হলে কিংবা সাধারণ মানুষের কাছে নিজের ভেতরের আবেগ বোঝাতে হলে রঙ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। শুধু ফরাসি সমাজ নয় বাঙালি সমাজেও এর প্রমাণ রয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবসে কালো রঙের শাড়ি, পাঞ্জাবি পরি। স্বাধীনতা দিবসে লাল-সবুজ, পহেলা ফাল্গুনে বাসন্তী রঙের শাড়ি-পাঞ্জাবি পরতে দেখা যায়। কবি সৈয়দ আলী আহসান বাংলার রূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে *আমার পূর্ব বাংলা* কবিতায় বলেন, 'আরো অনেক গাছ লতাপাতা, নীল হলুদ বেগুনি অথবা সাদা'। গান, কবিতা কিংবা উপন্যাস নয় রঙ মিশে আছে আমাদের জীবনের সাথে। আর মানুষের জীবনকে নিয়ে কাজ করে বিজ্ঞাপন। রঙের সাথে বিজ্ঞাপনের রয়েছে এক আত্মিক সম্পর্ক। মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে কৌশলে রঙের ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার নিয়ে লেজলি ক্লারিজ বলেন, মানুষের জীবনের প্রতিবিম্বই হলো রঙের ব্যবহার (Claridge, 2005, P. 168)। তাই রঙের সাথে জড়িত মানুষের মানসিকতা, অভিজ্ঞতা,

সংস্কৃতি। এই কারণে বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়। রঙ ব্যবহারে একটু অসতর্ক হলেই পুরো বিজ্ঞাপনই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর বিজ্ঞাপনে রঙের সঠিক ব্যবহার করা গেলে মানুষ তাঁর জীবনকে খুঁজে পাবে সেই বিজ্ঞাপনের মাঝে। আর তখন বিজ্ঞাপন তার উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে অনেকাংশেই সফল হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহার এবং রঙের বিভিন্ন আবেগ সম্পর্কে অবগত থাকা একজন বিজ্ঞাপন নির্মাতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞাপন ও রঙ

১৯৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করেন প্রিজমের মধ্যে দিয়ে সাদা আলো প্রবাহিত হলে এটা সকল দৃশ্যমান রঙকে বিভাজিত করে ফেলে। রঙের মূল উৎস আলো। আলোর কারণে আমাদের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রঙ দৃশ্যমান হয়। রঙ বস্তুর কোনো গুণ বা ধর্ম নয়। বস্তু থেকে আগত আলোর গুণ বা ধর্ম। একই বস্তুকে বিভিন্ন ধরনের আলোতে দেখলে ভিন্ন ভিন্ন রঙের মনে হয়। (দাশগুপ্ত, ২০০৬) টি বেনদুহন বলেন, যেখানে আলো আছে সেখানে রঙ আছে (Benduhn, 2010, P. 4)। আবার Arthur T. Turnbull and Russell N Baird তাদের "*The Graphics of Communication*" গ্রন্থে বলেন, 'The source of all colors is light. When we look at red rose we see it only because light reflects from it into our eyes, making the rose and its color discemible'।

বিজ্ঞাপনদাতাকে প্রায়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন শুনতে হয় সেটা হলো–বিজ্ঞাপনের কোথায় রঙ ব্যবহার করা হবে। আমাদের বহিঃজীবনে রঙ একটি অপরিহার্য উপাদান। রঙ হলো বহিঃপ্রকৃতির একটি চিহ্ন এবং এটা প্রায় হাজার হাজার বছরের পুরোনো। তবে ম্যাগাজিন বা বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। উনিশ শতকের শেষ অর্ধেকে প্রথম ম্যাগাজিনে রঙ ব্যবহার করা হয়। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার অত্যন্ত সাম্প্রতিক ঘটনা। বিগত কয়েক দশক হলো সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। (Frey, 1953, P. 477)

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে রঙের সম্পর্ক আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হয় এর ফলাফলের কারণে। বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহার করলে পণ্যের বিক্রি অনেক বেড়ে যায়; তাই বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহার করতে চায়। এ বিষয়ে যে সকল গবেষণা পরিচালিত হয়েছে সেই সকল গবেষণার ফলাফল দেখলেই বোঝা যাবে বিজ্ঞাপন ও রঙের সম্পর্কের বিষয়টি। এখানে বিজ্ঞাপন ও রঙ বিষয়ক কয়েকটি গবেষণা তুলে ধরা হলো।

লেমন বেভারেজের বিজ্ঞাপন চলছিল অনেকদিন ধরেই। কিন্তু বিক্রির গতিতে কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছিল না। ১৯৪২-১৯৪৫ সালে যে পরিমাণ বিক্রি হয়েছিল, ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে এসেও পণ্যের বিক্রি একই পরিমাণ ছিল। তাই প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত নেয়–তারা পণ্যের বিক্রি বাড়াতে চায়। পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে লেমন বেভারেজের বিজ্ঞাপনে লেমনের রঙিন ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। যার ফলে বিক্রয় বাড়ে ৩০%। গবেষণায় দেখা যায়, এখানে নারী পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণেই বিক্রি বেড়ে যায়। (Scott, 1953, P. 116) অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার করলে কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। কারণ বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহৃত হলে গ্রাহকের কাছে বিজ্ঞাপনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। সাদাকালো ছবিতে কোনো উপাদান সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু একটা রঙিন ছবিতে সেটা ভালোভাবে ফুটে ওঠে। ১৯৩৯-'৪০ সালের দিকে ন্যাশেস দেখান যে, উজ্জ্বল হলুদ, সবুজ এবং লাল রঙ মানুষের জীবনবোধ ফুটিয়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে সাদাকালো রঙ ছবি জীবন্ত করতে পারে না; বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তো নয়ই। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকার ফোর্ড গাড়ি কোম্পানিকে তুলে ধরা যেতে পারে। হঠাৎ করে ফোর্ডের গাড়ি বিক্রয় কমে যায়। কোম্পানিটি গাড়ি বিক্রয় কমার কারণ উদ্ধারে গবেষণা শুরু করে। গবেষণায় কোম্পানিটি দেখতে পায় যে, কালো রঙের গাড়ি বাজারে ছাড়ার ফলে বিক্রয় কমে যায়। তাই ফোর্ড ১৯৩৮ সালে ঘোষণা দেয়-তারা মার্কার মার্কউ নামে নতুন গাড়ি বাজারে ছাড়ছে। এই গাড়িটির শুধু রঙেই বৈচিত্র্য নেই, আকারেও বড়। এরপর থেকে পুনরায় ফোর্ডের গাড়ির বিক্রয় বাড়তে থাকে। (Stevenson, 2008)

আমেরিকার কালার ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায়, পণ্যের গুণাগুণ একই রকম হলেও শুধুমাত্র রঙের কারণে মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একই উপাদান দিয়ে তিনটি রঙের মোড়কে একটি সাবান বাজারে ছাড়া হলো। সাবানগুলোর রঙ ছিল নীল, হলুদ এবং মিশ্র রঙ (অনেকগুলো রঙের মিশ্রণ)। সাবানগুলো ভোক্তাদের মাঝে ব্যবহারের জন্য দেয়া হলো। ব্যবহার শেষে ভোক্তাদের মতামত হলো-হলুদ রঙ ব্যবহার করা যায় না, নীল কাপড় পরিষ্কার করে না, মিশ্র রঙের সাবানটা ভালো। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণ্যের গুণগত মান নয়, মূল বিষয় হচ্ছে রঙ।

বিজ্ঞাপনকে সামাজিক মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা হিসেবে দেখা হয় (Dyer, 1992)। বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাই অঞ্চল এবং সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। সংস্কৃতি এবং অঞ্চলভেদে মানুষের রঙের পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমেরিকার প্যান্টন কালার ইনস্টিটিউট ২০১৭ সালের মার্চ মাসে রঙ নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় লরি প্রেসম্যান দেখান যে, ছেলেমেয়েদের যেমন আলাদা আলাদা রঙ পছন্দ, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ধরনের রঙ পছন্দ করে থাকেন। প্যান্টন কালার ইনস্টিটিউট শরৎকালের ফ্যাশনের ওপর নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের মানুষের ওপর গবেষণা করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, লন্ডন এবং নিউইয়র্কের মানুষ আলাদা আলাদা রঙ পছন্দ করেন। তবে কিছু রঙ রয়েছে যেগুলো লন্ডন এবং নিউইয়র্ক উভয় এলাকার মানুষই পছন্দ করেন। (Pressman, 2017)

পণ্য বিক্রির অন্যতম উপায় হতে পারে রঙ। উদাহরণ হিসেবে ব্রাজিলের একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। ব্রাজিলে কফির প্যাকেটের রঙ পাল্টে হলুদ আর কমলা রঙের করে দেয়া হয়। তখন দেখা যায়, ব্রাজিলে কফি বিক্রি অনেক বেড়ে গেছে। বিক্রির কথা বিবেচনায় রেখে অলঙ্কারের বিক্রেতারাও চেষ্টা করেন, অলঙ্কারের প্যাকেটটি মেরুন রঙের করতে। স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা বলেন, মেরুন আভিজাত্যের প্রতীক। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে পণ্য, ভোক্তাশ্রেণি, সংস্কৃতি ও অঞ্চলকে বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহার করতে হবে। তবেই বিজ্ঞাপনটি সফল বিজ্ঞাপনে পরিণত হতে পারে।

বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার

বিজ্ঞাপন ও রঙের সম্পর্কের মধ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিজ্ঞাপনকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার করতে হয়। পাঠক তার জীবনের মাঝে রঙকে খুঁজে পায়, তাই সে বিজ্ঞাপনের মাঝেও রঙকেই খুঁজে থাকে। নিচে বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহারের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. রঙ মনোযোগ আকর্ষণ করে: সাদাকালোর মাঝে এক চিলতে রঙ (সাদাকালো বাদে অন্য রঙ) ক্ষণিকের জন্য হলেও আপনার চোখ আটকে দেবে। কারণ রঙ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সাদাকালোর চেয়ে রঙিন ছবি বিজ্ঞাপনের দিকে ভোক্তার বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে (Mackay, 2005, P. 168)। স্যান্ডেজ প্রমুখ বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহারকে 'মনোযোগ আকর্ষণ' বলে উল্লেখ করেছেন (Sandage et al, 1983, P. 243)। এখানে তিনি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের কথাই বলেছেন। রঙ শুধু পাঠকের মনোযোগই বৃদ্ধি করে না, পাঠকসংখ্যাও বৃদ্ধি করে (Frey, 1953, P. 478)। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ও পাঠকের সংখ্যা বাড়ানো।

২. অধিক গুরুত্ব বোঝাতে রঙ সাহায্য করে: বিজ্ঞাপনের কোন উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ আর কোন উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা ঠিক করে দেয় বিজ্ঞাপনের রঙ। বিজ্ঞাপনে ট্রেডমার্ক অথবা কোনো চিহ্নকে গুরুত্ব দিতেই রঙের ব্যবহার করা হয়। তথ্য কিংবা পণ্যের বিশেষ অংশের গুরুত্ব বোঝাতে রঙের ব্যবহার করা হয়ে থাকে (Cohen, 1972, P. 482)। বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহার করা হয় কোনো চিহ্ন, তথ্য বা পণ্যের বিশেষ কোনো দিককে গুরুত্ব দিতে।

৩. রঙ পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ তুলে ধরতে সাহায্য করে: রঙ পণ্যের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দেয়। পণ্যের সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে রঙের কোনো বিকল্প নেই। রঙ পাঠককে পণ্যের বাস্তব অনুভূতি দিতেও সাহায্য করে। সাদাকালো বিজ্ঞাপনে পাঠক পণ্যের প্রকৃত গুণাগুণ বুঝতে পারে না। ফলে পণ্যটির অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও ভোক্তা কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। রঙ পণ্যের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে পণ্যের রঙিন বিজ্ঞাপন পাঠকের সামনে হাজির করা হলে পণ্যটির ওপর পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় বহুগুণে (Frey, 1953, P. 479)। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য সহজেই চরিতার্থ হয়।

৪. রঙ পণ্যের ব্র্যান্ড ও ট্রেডমার্কের পরিচায়ক: রঙ বিজ্ঞাপিত পণ্যের পরিচিতি

তৈরি করে। পরিচয়দান করে পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানেরও। ট্রেডমার্ক হলো একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়দানকারী চিহ্ন। ট্রেডমার্ক তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা: TM (অনিবন্ধিত ট্রেডমার্ক), SM (সার্ভিস মার্ক), ® (নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক)। তিন ধরনের মধ্যে যেকোনো একটি ট্রেডমার্ক তৈরির সময় প্রতিষ্ঠানটি নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করে থাকে। এই রঙটিই প্রতিষ্ঠান তাদের সকল পণ্য, স্থাপনা, মোড়কসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকে। বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে বিজ্ঞাপন তৈরির সময় মনে রাখতে হবে, নির্দিষ্ট এই রঙটিই হবে বিজ্ঞাপন নির্মাণের সময় মূল রঙ। বিজ্ঞাপনের এই রঙটিই পণ্য, ব্র্যান্ড নেম এবং ট্রেডমার্কের সাথে পাঠককে পরিচিত হতে সাহায্য করে। বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে ফ্রে বলেন, 'Color is a better identification of product ' (Frey, 1953, P. 479)। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, আকাশী রঙ গ্রামীণফোনের পরিচায়ক, কমলা রঙ বাংলালিংকের পরিচায়ক। অর্থাৎ রঙই পণ্য এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

৫. রঙ বিজ্ঞাপনের গুণ ও সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে: রঙ বিজ্ঞাপনের গুণমান ও সম্মান বৃদ্ধি করে থাকে। বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে ডরোথি কোহেন বলেন, 'রঙ পণ্য এবং বিজ্ঞাপনদাতার সম্মান সৃষ্টি করে থাকে' (Cohen, 1972, P. 482)। তবে ফ্রে বলেন, রঙ 'গুণের উপদেশক' (Frey, 1953, P. 479)। রঙ বিজ্ঞাপনদাতা এবং পণ্যের সম্মান যেমন বাড়ায় তেমনি পণ্যের গুণাগুণকেও তুলে ধরে।

এই তিনটি রঙ থেকেই অন্যান্য রঙ তৈরি হয়, তাই এদেরকে প্রাথমিক রঙ বলা হয়। তবে বর্তমানে প্রাথমিক রঙ হিসেবে চারটি রঙের কথা বলা হচ্ছে। চতুর্থ রঙটি হচ্ছে সবুজ (Nelson, 1973, P.158)। অন্যদিকে মাধ্যমিক রঙ হচ্ছে প্রাথমিক রঙের মিশ্রণে সৃষ্ট নতুন রঙ। এ সম্পর্কে বেনদুইন বলেন, 'Two primary colors are mixed together to make a secondary color'। নেলসন সেকেন্ডারি রঙের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বেগুনি হয় লাল এবং নীলের মিশ্রণে, সবুজ হয় নীল ও হলুদের মিশ্রণে আর কমলা হয় লাল ও হলুদের মিশ্রণে। নেলসন আরেক ধরনের রঙের কথা বলেন যাকে তিনি স্ট্যান্ডার্ড কালার হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, স্ট্যান্ডার্ড কালার হলো প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কালারের মিশ্রণ।

রঙের আবেগমূল্য

রঙ শুধু রঙ নয়, এর রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অর্থ। আর এ অর্থ সমাজ থেকে সমাজে, জাতি থেকে জাতিতে পার্থক্য হয়ে থাকে। এই বিষয়ে বভি এবং আরেন্স বলেছেন, 'Reaction to color is generally based on a person's national origin or culture' (Bovee and Arens, 1989, P. 299)। তারপরেও রঙের কিছু মৌলিক অর্থ সবার মধ্যেই বিদ্যমান। সেই অর্থগুলোই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

নীল: ঠাণ্ডা রঙ, শীতল, মনের বা আকাশের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

> *আমেরিকার কালার ইনস্টিটিউটের এক গবেষণায় দেখা যায়, পণ্যের গুণাগুণ একই রকম হলেও শুধুমাত্র রঙের কারণে মানুষের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একই উপাদান দিয়ে তিনটি রঙের মোড়কে একটি সাবান বাজারে ছাড়া হলো। সাবানগুলোর রঙ ছিল নীল, হলুদ এবং মিশ্র রঙ (অনেকগুলো রঙের মিশ্রণ)। সাবানগুলো ভোক্তাদের মাঝে ব্যবহারের জন্য দেয়া হলো। ব্যবহার শেষে ভোক্তাদের মতামত হলো-হলুদ রঙ ব্যবহার করা যায় না, নীল কাপড় পরিষ্কার করে না, মিশ্র রঙের সাবানটা ভালো। তাহলে দেখা যাচ্ছে পণ্যের গুণগত মান নয়, মূল বিষয় হচ্ছে রঙ*

৬. তথ্যের স্মরণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে: মানুষ সেটাই মনে রাখে যেটা তার মনে দাগ কাটে। সেদিক দিয়ে বিজ্ঞাপনের ভালো রঙ মানুষের মনে দাগ কাটতে পারে খুব সহজেই। তাইতো ফ্রে বলেন, 'It may increase the memory value of the advertisement' (Frey, 1953, P. 478)। রঙ এমনই বিষয় যা গেঁথে যায় মানুষের স্মৃতির সাথে। মানুষ বিজ্ঞাপনের আধেয় ভুলে যেতে পারে কিন্তু ভুলতে পারে না রঙ। তাই বিজ্ঞাপনে রঙের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন।

এর বাইরেও আরো কিছু কারণে বিজ্ঞাপনে রঙ ব্যবহার করা হয় এই বিষয়ে স্যান্ডেজ ও অন্যরা বলেন, পণ্যের ব্যাখ্যা বৃদ্ধিতে রঙ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, রঙ বিজ্ঞাপনের জীবনদান করে; অন্যথায় সে বিজ্ঞাপন দেখতে কালো লাগে (Sandage et al, 1983, P. 243)। আবার ফ্রে বলেন, রঙ পণ্যের সবচেয়ে ভালো পরিচয়দানকারী, রঙ বিজ্ঞাপনের লে-আউটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে, রঙ পণ্য এবং এর উৎপাদকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে (Frey, 1953, P. 478)।

রঙের প্রকারভেদ

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এই দুইভাগে রঙকে ভাগ করা যায়। বেনদুইন বলেন, কিছু রঙকে প্রাথমিক রঙ হিসেবে ডাকা হয়। নীল, লাল এবং হলুদ প্রাথমিক রঙ হিসেবে পরিচিত (Benduhn, 2010, P. 6)। মূলত এর ইতিবাচক দিক হলো স্বদেশপ্রেম, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, ধর্ম, অনুভূতি, শিষ্টাচার, স্বচ্ছতা। আর নেতিবাচক দিক হলো এটা ভয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত। বভি এবং আরেন্স বলেন, এই রঙ সাধারণত সিগারেট এবং বিয়ারের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হয় (Bovee and Arens, 1989, P. 299)।

লাল: রক্ত এবং আগুনের প্রতীক হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। এটা উত্তপ্ত রঙ। বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের প্রতীক হিসেবেই বেশি পরিচিত। এর ইতিবাচক দিক হলো উষ্ণতা, আশা, জীবন, মুক্তি, স্বদেশপ্রেম, সাহস ইত্যাদি। আর নেতিবাচক দিক হলো মৃত্যু, যুদ্ধ, অভ্যুত্থান, বিপজ্জনক, শয়তান, হিংসা, ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি। সেভিংক্রিমের বিজ্ঞাপনে লাল রঙ ব্যবহারের কথা বলেন বভি এবং আরেন্স (Bovee and Arens, 1989, P. 299)।

হলুদ: দর্শক-শ্রোতার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী রঙ। এটা আনন্দময় রঙ। এর ইতিবাচক দিক হলো স্বর্গীয়, সাম্রাজ্য, গয়না, সোনা, সম্পদ এবং নেতিবাচক দিক হলো কাপুরুষতা, পাগলামি ইত্যাদি। লেমনের বিজ্ঞাপনে হলুদ রঙ গ্রহণীয় বলে মনে করেন বভি এবং আরেন্স (Bovee and Arens, 1989, P. 299)।

সবুজ: সুস্বাস্থ্য, প্রফুল্লতা ও যৌবনের প্রতীক। মূলত এর মাধ্যমে প্রকৃতিকে বোঝানো হয়। সবুজের ইতিবাচক দিক হলো প্রকৃতি, আশা,

উন্নতি, তারুণ্য, সম্ভাবনা ইত্যাদি। শত্রুতা, হিংসা, বিরোধিতা, সন্ত্রাস, পাপ, অপরাধ ইত্যাদি সবুজের নেতিবাচক প্রতীক হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। বভি এবং আরেন্স বলেন, সবুজ রঙ টোবাকো প্রোডাক্টসে বেশি ব্যবহৃত হয় (Bovee and Arens, 1989, P. 299)।

কমলা: খাবারের বিজ্ঞাপনে সবুজের আধিক্য দেখা যায়। কমলার সাথে বাদামি আভার সম্মিলন ঘটলে তাকে খাদ্যশস্য হিসেবে দেখা হয়। জ্ঞান, সভ্যতা, উষ্ণতা, প্রাণশক্তি, গভীরতম বেদনাবোধ কমলার ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত।

কালো: স্পর্শকাতর রঙ হিসেবে পরিচিত। তবে এটা আভিজাত্য এবং দামির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এর ইতিবাচক দিক মর্যাদা ও আভিজাত্য। আর নেতিবাচক দিক দুঃখ-বেদনা, শোক। বভি এবং আরেন্স বলেছেন, ব্যয়বহুল পণ্যের বিজ্ঞাপনে কালো রঙ ব্যবহার করা হয়।

বেগুনি: বিলাসিতা এবং রাজকীয়তার প্রতীক। একাকিত্ব বোঝানোর জন্যও বেগুনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্ষমতা, অধিকার, স্মৃতি এর ইতিবাচক দিক। ফিরিয়ে দেয়া, অনুশোচনা ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়ও বোঝানো হয়ে থাকে এই রঙের মাধ্যমে।

সাদা: বিশুদ্ধতা, শান্তি, স্বচ্ছতা, সততা, নিশ্চয়তার প্রতীক সাদা রঙ। আর এর নেতিবাচক দিক হলো বিবর্ণতা, জীর্ণতা ইত্যাদি।

রঙের ভাষা প্রকাশ করতে গিয়ে ড. রঞ্জিত কুমার মিত্র বলেন, রঙের দুই ধরনের অর্থ আছে; এক. তার আবেগমূল্য এবং দুই. এর সাংকেতিকমূল্য। একই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় নেলসনের কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'Colors not only carry moods; they also carry symbolism' (Nelson, 1973, P. 159)। নিচে রঙের আবেগমূল্য ও সাংকেতিকমূল্য তুলে ধরা হলো (মিত্র, ১৯৯৭, পৃ. ২৩১-২৩২)

রঙ	আবেগমূল্য	সাংকেতিক মূল্য
লাল	চরিত্রগতভাবে উষ্ণ ও উত্তেজক রঙ।	রক্ত, আগুন, উত্তাপ, যুদ্ধ বিগ্রহ, হিংস্রতা, ক্রোধ, সাহসিকতা, শক্তি, ধ্বংস, ক্ষমতা, দম্ভ, ঘৃণা, বীভৎসতা, বীরত্ব, বিশৃঙ্খলা, তারুণ্য, উত্তেজনা।
নীল	শীতল রঙ। এর মিশ্রণজনিত যেকোনো রঙ, যার মধ্যে এর প্রাধান্য বেশি তাকে শীতল রঙ বলে। কখনো শীতল, কখনো শান্ত-স্নিগ্ধ, কখনো মর্যাদাব্যঞ্জক, স্থির মস্তিষ্ক; আবার কখনো হতাশাব্যঞ্জক, বিষাদময়তা, অবসাদগ্রস্ততা প্রভৃতি নানা আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক।	সম্ভ্রম, শীতলতা, তারুণ্য, প্রশান্তি, কোমলতা, রাজকীয় মর্যাদা।
সবুজ	শীতল ও শান্ত রঙ। এর মধ্যে কোনো উষ্ণ তা নেই। একে নিরপেক্ষ বা অক্রিয় প্রকৃতির রঙও বলা হয়। কেননা প্রকৃতির সঙ্গে এর অনুষঙ্গ রয়েছে। সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার অন্য রকম হয়ে ওঠে। সবুজ রঙ মানসিক প্রশান্তি, স্নিগ্ধতা, সারল্য, তারুণ্য, রোমান্টিকতা প্রভৃতি ভাবাবেগ প্রকাশের সহায়ক।	জীবন, তারুণ্য, যৌবন, শক্তি, সজীবতা, প্রসন্নতা, বিশ্বস্ততা, জয়, অমরত্ব, জীবন-বসন্ত, চিন্তাশীলতা।
হলুদ	উষ্ণ রঙ। মৃদু উত্তেজক। অন্য রঙের সঙ্গে মিশ্রণের দ্বারা হালকা বা গাঢ় অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। উ জ্জ্বলতা, প্রফুল্লতা, আনন্দ, কৌতুক, রুগ্ণতা, বিরক্তিকর প্রভৃতি নানা আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক।	উল্লাস, উজ্জ্বল্য, আলো, ঐশ্বর্য, উষ্ণতা, চাকচিক্য, আনন্দদায়ক, সূর্যালোক, উত্তেজনা।
কমলা	উত্তেজক রঙ, তবে লাল রঙ অপেক্ষা অনেক মৃদু উত্তেজক।	উত্তেজক-উৎসাহ, কর্মতৎপরতা, প্রফুল্লতা, উজ্জ্বলতা, উল্লাস, উষ্ণতা, উত্তাপ, পরিতৃপ্তি, দক্ষতা, সুখ।
বেগুনি	নীলের সাথে কিছু লাল। মোটামুটি ক্রিমসন ও ম্যাজেন্টা রঙের অনুরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বিষাদময়তা, রহস্যময়তা, হতাশাব্যঞ্জক, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি।	ভালোবাসা, মৃত্যু, বিষণ্ণতা, অবসাদগ্রস্ততা, সহানুভূতি, রহস্যময়তা, মানবিক আবেগ, দুঃখ ইত্যাদি।
ক্রিমসন	লাল রঙের গাঢ় অবস্থা। লাল+নীল। এটিও উত্তেজক রঙ। এটি ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের উদ্দীপক।	আগুন, রক্ত,হিংস্রতা, উত্তেজনা, পৃতিহিংসা, বিপদ, ক্রোধ প্রকাশ করে তেমনি আবেগ, সৌন্দর্য, ভদ্রতা, দানশীলতা, উদারতা প্রকাশ করে।
ম্যাজেন্টা	লাল ও নীলের সমপরিমাণ মিশ্রণে এর উদ্ভব। আলোয় অবস্থাবিশেষ ব্যবহৃত হয়। লাল রঙের গোত্রভুক্ত রঙ এটি।	উষ্ণ ও উত্তেজক। সেই সাথে শীতল, কোমল, রাজকীয়, জাঁকজমকপূর্ণ, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য, শক্তি, নায়কোচিত মহিমা, প্রশান্তি।

বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গবেষকরা বিভিন্ন গবেষণা চালান এবং তারা বিভিন্ন রঙ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেন। এখানে এই বিষয়গুলোই তুলে ধরা হলো–

ফলস্টাফ ব্রিউইং কোম্পানির এক গবেষণায় দেখা যায়, কোনো চিঠি আদান-প্রদান এবং প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে লাল, কমলা এবং হলুদ রঙ ব্যবহার করা ভালো। আবার আরেক গবেষণায় দেখা যায়, রঙ পছন্দের ক্ষেত্রে ছেলেদের বেশি পছন্দ নীল রঙ এবং মেয়েদের পছন্দ লাল রঙ। গবেষণায় আরো দেখা যায়, ঠাণ্ডা রঙ হিসেবে বিবেচিত সবুজ ও নীল এবং উষ্ণ রঙ হিসেবে বিবেচিত লাল ও হলুদ। নিরপেক্ষ রঙ হিসেবে ধূসরই সর্বাধিক পরিচিত। (Nelson, 1973, P. 159)

আরো গবেষণায় দেখা যায়, ছেলেদের সবচেয়ে পছন্দের রঙ নীল ও সবুজ এবং মেয়েদের পছন্দের রঙ গোলাপী, কালো, লাল, হলুদ। এভাবে রঙ শুধু ভাষাই তৈরি করে না বরং বিজ্ঞাপনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও পণ্যের বিক্রি বাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

রঙের ভাষা বুঝে যদি ঠিকঠিকভাবে বিজ্ঞাপনে রঙের ব্যবহার করা যায় তবে বিজ্ঞাপন তার উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে অনেকাংশেই সফল হয়। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল এই বিষয়টাকেই সমর্থন করে। রঙের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হচ্ছে তার আকর্ষণ ক্ষমতা। রঙ তার আকর্ষণ ক্ষমতায় আবেগমূল্য বসিয়ে যেকোনো মানুষের মন জয় করে ফেলতে পারে নিমিষেই। মানুষের মন জয়ের অর্থ পণ্যটির নতুন নতুন ভোক্তা তৈরি করা। বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য এখানেই নিহিত। যে কারণে বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে অবশ্যই রঙের ভাষা সম্পর্কে জানতে হয়। রঙ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। অঞ্চল ও সংস্কৃতি ভেদে রঙের ব্যবহার ভিন্ন হয়ে থাকে। এমনকি ভিন্ন লিঙ্গের মানুষের পছন্দের রঙও হয় আলাদা। পণ্যের মধ্যে মানুষের জীবনাচরণ ফুটিয়ে তুলতে হলে বিজ্ঞাপনে জীবনের ছোঁয়া থাকতে হবে। আর বিজ্ঞাপনে জীবনের ছোঁয়া এনে দেয় রঙ। রঙের মাঝে জীবন আছে আর বিজ্ঞাপন গড়ে ওঠে জীবনের মধ্যে থেকে। বিজ্ঞাপন নির্মাতাকে এ কারণে রঙের ব্যবহার ও আবেগমূল্য সম্পর্কে থাকতে হয় সচেতন।

তথ্যসূত্র

১. মিত্র, ড: রঞ্জিত কুমার (১৯৯৭)। *থিয়েটারে আলো*। কলিকাতা: বেস্টবুকস।
২. দাশগুপ্ত, ধীমান (২০০৬)। রঙ। কলকাতা: বাণীশিল্প প্রকাশনী।
3. Benduhm, Tea (2010). *What is color?*. New York: Crabtree Publishing Company.
4. Bovee, Courtland L. and William F., Arens (1989). *Contemporary Advertising.* USA: IRWIN.
5. Claridge, Leslie (2005). 'Printing'. Edited in Mackay, Adrian R.. *The Practices of Advertising.* Delhi:
6. Rajkamal Electric Press.
7. Cohen, Dorothy (1972). *Advertising.* New York: John Wiley and Sons, Inc.
8. Dyer, Gillian (1992). *Advertising as Communication.* London : Routledge
9. Frey, Albert Wesley (1953). *Advertising.* New York: The Ronald Press Company.
10. Nelson, Roy Paul (1973). *The Design of Advertising.* Medison: W. C. Brown Co.
11. Pressman, Laurie (2017). *Pantone Fashion Color Report, Fall 2017.* Retrieved from : http://www.pantone.com/fashion-color-report-fall-2017, on 25 May 2017
12. Sandage, C. H., Fryburger, Vernon and Rotzoll, Kim (1983). *Advertising Theory and Practice.* USA:
13. Richard D. Irwin, Inc.
14. Scott, James D. (1953). *Advertising Principles and Problems.* USA: Prentice-Hall, Inc.
15. Mackay, Adrian R. (2005). The Practice of Advertising. burlington: Elsevier
16. Butterworth-Heinemann.
17. Sandage, C. H. Fryburger, Vernon and Rotzoll, Kim (1993). Advertising Theory and Practive. USA: Richard D. Irwon, Inc.

লেখক : প্রভাষক, পিআইবি

নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন গণমাধ্যম কতদূর

শাহনাজ মুন্নী

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কাজ করছেন বহুদিন ধরেই, তবে এটা সবাই জানেন, সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত নারীদের চলার পথটি মসৃণ নয়। পরিবার, সমাজ এমনকি কর্মক্ষেত্রেও নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে সামনে এগোতে হয় তাদের। সাংবাদিকতা পেশাটি আর ১০টি পেশার মতো নয়, এই পেশাটি চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ। পেশাদারিত্ব, দায়িত্ববোধ এবং পেশার প্রতি আবেগ থাকলেই এ পেশায় টিকে থাকা সম্ভব। নারীরা যারা দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় আছেন তারা তাদের মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা, পেশাদারিত্ব এবং দায়িত্ববোধ নিয়েই টিকে আছেন। আমরা সাধারণভাবে বলতে ভালোবাসি, গত ২০ বছরে গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি বেড়েছে। এ পেশার পরিধি এখন শুধু সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনেই সীমাবদ্ধ নেই, সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনলাইন, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও। গণমাধ্যমের সংখ্যা বাড়লেও কঠিন বাস্তবতা হলো, অন্য পেশায় নারীদের সংখ্যা যতটা বাড়ছে, সে তুলনায় সাংবাদিকতায় সংখ্যাগতভাবে নারীদের উপস্থিতি ততটা বাড়ছে না।

সাংবাদিকতা পেশাটি আর ১০টি পেশার মতো নয়, এই পেশাটি চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ

বাংলাদেশের গণমাধ্যমে কত নারী কাজ করেন তার সাম্প্রতিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে কয়েকটি হিসাব দিয়ে আমরা পরিস্থিতিটা আন্দাজ করতে পারি। যেমন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের হিসাব। এখানে ১,২৫২ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে নারী সদস্যসংখ্যা মাত্র ৭২ জন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ছয় হাজার সদস্যের মধ্যেও নারীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি নয়। রিপোর্টার্স ইউনিটির দেড় হাজার সদস্যের মধ্যে নারী মাত্র ১০৪ জন।

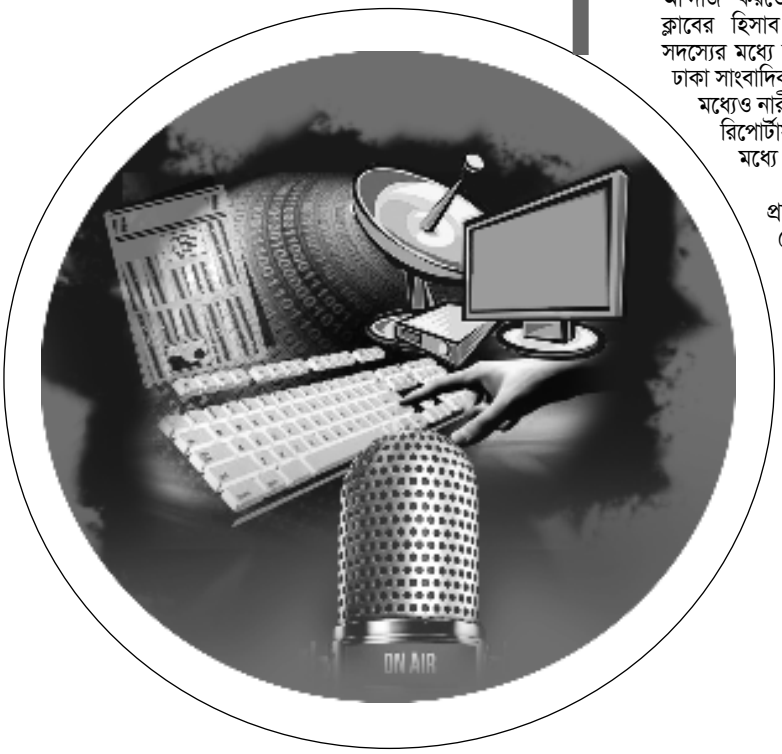

তাছাড়া এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাংবাদিকতায় এখনো নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি হাতেগোনা মাত্র। তথ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ইংরেজি, বাংলা, অনলাইনসহ প্রায় দুইশ' গণমাধ্যমে কর্মরত নারী সম্পাদক আছেন ৬ জন। এরা সবাই সম্পাদক হয়েছেন মালিকানা সূত্রে, সাংবাদিকতার সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নয়। ২৮টি টেলিভিশন চ্যানেলের মধ্যে নারী হেড অব নিউজ একজন, প্রধান বার্তা সম্পাদক একজন এবং বার্তা সম্পাদক মাত্র ২ জন নারী।

গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রোজেক্ট ২০১৫-এর প্রতিবেদনে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ৮৪ শতাংশ পুরুষ, আর নারী ১৬ শতাংশ। এর মধ্যে সংবাদপত্রে ৮ শতাংশ, রেডিও'তে ৩৩ শতাংশ এবং টেলিভিশনে ১৯ শতাংশ নারী সাংবাদিক কাজ করেন।

তবে গণমাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কম। যেমন, রেডিও'তে ৬৭ শতাংশ ও টেলিভিশনে ৬৬ শতাংশ উপস্থাপিকা নারী। অর্থাৎ সার্বিকভাবে রেডিও ও টেলিভিশনে ৬৬ শতাংশ নারী ও ৩৪ শতাংশ পুরুষ উপস্থাপক হিসেবে কাজ করছেন।

সংবাদ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নারীর অধিকসংখ্যক উপস্থিতির পেছনে কী মনস্তত্ত্ব কাজ করছে তা আশা করি কারো অজানা নয়। কিছুদিন আগে নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু বাংলা ট্রিবিউনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, 'টেলিভিশন মালিকরা বা কর্তৃপক্ষ মনে করেন, নারীরা দেখতে সুন্দর। তাই তাদের 'প্রেজেন্টার' বা উপস্থাপক পদে নিয়োগ দিচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু রিপোর্টার বা নীতিনির্ধারণী পদে নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপভাবে বাড়ছে না। মিডিয়ার অনেক প্রতিষ্ঠানের পলিসি হচ্ছে, মেয়েদের নেব না, মেয়েরা পারবে না-এটা একটা পশ্চাৎপদ মানসিকতা, যেখান থেকে নিয়োগদাতারা এখনও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। কোথাও কোথাও সহযোগিতা পেলেও অনেক প্রতিষ্ঠানই এখনও চায় না মেয়েদের নিয়োগ দিতে। তবে একেবারে কিছু হয়নি, তা নয়, কিছু না হলে মেয়েরা এতদূর আসতে পারত না। তবে ছেলেদের তুলনায় গণমাধ্যমে এখনও মেয়েদের রিকগনিজেশন বা স্বীকৃতি অনেক কম।'

গণমাধ্যমে নারীদের সংখ্যা না বাড়ার পেছনে অনেক কারণকেই দায়ী করা যায়, তবে বিভিন্ন সময় নারী সাংবাদিকরা নিজেরাই যেসব কারণকে চিহ্নিত করেছেন, সেসবই তুলে ধরছি, কেননা এসব কথা নারী সাংবাদিকদের প্রায় প্রত্যেকেরই মনের কথা এবং তাদের উপলব্ধির কথা। পাশাপাশি বৈষম্যের আরো নানা চিত্রও তাঁদের কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশে ৬২ বছরের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত ইত্তেফাকের সিনিয়র সংবাদকর্মী ফরিদা ইয়াসমিন জার্মান গণমাধ্যম ডয়েচে ভেলেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সাংবাদিকতায় পুরুষের তুলনায় নারীকে অনেক বেশি যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে হয়। প্রথমত তাঁকে প্রমাণ করতে হয় যে, পুরুষ যেটা করতে পারে সেটা করতে তিনিও সক্ষম। তারপর তাঁকে পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হয়।'

ফরিদা ইয়াসমিন জানান, 'অনেকের মধ্যেই একটা 'মাইন্ড সেট' কাজ করে যে, এই কাজ নারী পারবে না বা পারে না। বলাবাহুল্য, এই 'মাইন্ড সেট' নারীকেই ভাঙতে হয়। আমি যত জায়গায় কাজ করেছি সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বৈষম্যের শিকার আমি হইনি। তবে মনস্তাত্ত্বিক বাধা এখনও প্রবল।'

সাহসিকতার জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অ্যাওয়ার্ড ফর কারেজ' পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশী নারী সাংবাদিক নাদিয়া শারমিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'নারী সাংবাদিককে দু'ধরনের যুদ্ধ করতে হয়। তাঁকে প্রমাণ করতে হয় যে, সে যোগ্য। এছাড়া পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করতে হয়। এর বাইরে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তো আছেই। কোনো নারী যে ক্রাইম রিপোর্টার হতে পারে, এটাই অনেকের চিন্তায় আসে না।'

কর্মস্থলে বৈষম্য নিয়েও নারী সাংবাদিকদের অনেকেরই তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। নাদিয়ার মতে, 'দৃশ্যত কর্মস্থলে বৈষম্য না থাকলেও বৈষম্যমূলক আচরণ অনেকটা নির্ভর করে যিনি সুপারভাইজ করেন, তাঁর মানসিকতার ওপর।'

অনলাইন নিউজ পেপার বাংলা ট্রিবিউনের চিফ রিপোর্টার উদিসা ইসলাম ডয়েচে ভেলেকে জানান, 'নারীদের রাজনীতি, অর্থনীতি বা কূটনীতির মতো বিষয় নিয়ে সাংবাদিকতা করাকে অনেকেই মানতে পারেন না। তাঁদের ধারণা, নারী সাংবাদিক মানেই হলো তাঁরা হালকা বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন করবেন।'

উদিসার মতে, 'এই পেশায় আসা এবং টিকে থাকার জন্য পরিবারের সমর্থন একটা বড় ব্যাপার। আর নারী বিবাহিত হলে সেটা আরো বেশি প্রয়োজন। সাংবাদিকতা ২৪ ঘণ্টার পেশা। কোনো নারী রাতেও কাজ করবেন, এটা অনেকে ভাবতেই পারেন না।'

সিনিয়র সাংবাদিক ও ইংরেজি দৈনিক নিউজ টুডে'র সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমদ বিবিসি'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি বলেছেন, 'বাংলাদেশে সংবাদ কক্ষের নেতৃত্বে নারীদের এগিয়ে আসার মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি।'

'একজন নিউজ এডিটর যদি মহিলা হন, তাঁকে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করতে হবে, আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা এখনও মেয়েদের সপক্ষে নয়'।

তিনি বলেন, 'মেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব আছে এটা আমি বলব না; কিন্তু পরিবেশের কারণে তারা এগিয়ে আসতে পারছে না। দায়িত্ব তারা নেয়ও না, মালিক তাকে দায়িত্ব দিতেও চায় না।'

বিবিসি'র একই রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরীন বলছেন, 'সাংবাদিকতাটাকে নারীর পেশা বলে মনে করা হয় না, এরকম মনোভাব আমি অনেক পুরুষ সাংবাদিকের মধ্যেই দেখেছি'।

দৈনিক প্রথম আলো'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, সেই হিসাবে গণমাধ্যমের অর্ধেক জায়গা নারীদের জন্য বরাদ্দ রাখার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। বরং নারী সাংবাদিকরা যখন নারী ও শিশুর বিষয়ে লেখেন, তখন তাঁর কাজটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকরা যখন ভালো কাজ করেন, তখন শুনতে হয়, মেয়ে বলে বাড়তি সুবিধা দিয়ে কাজটি আদায় করেছে। আবার কোনো কাজে কৃতকার্য হতে না পারলে শুনতে হয়, পারবে কেমনে, ও তো মেয়ে। কাজের প্রয়োজনে সারাদিন সন্তানকে ছাড়া থাকতে হয় বলে মা হিসেবে নারী সাংবাদিকরা এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকেন। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় শুনতে হয়, ও কেমন মা ? সন্তানের খোঁজ রাখে না! আবার সন্তানের কথা অফিসে বললে শুনতে হয়, মেয়েরা শুধু সন্তানের অজুহাত দেয়। পুরুষ সাংবাদিকেরা যখন রাত আটটার পরে প্রেস ক্লাবে আড্ডা দিতে যাচ্ছেন, তখন কিছু বলা হয় না। আর কোনো মেয়ে সেই সময় একটু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে চাইলে কথা শুনতে হয়। এমনকি নারী কর্মীরা পদোন্নতি পেলেও শুনতে হয় মন্দ কথা।

রাজধানীকেন্দ্রিক দু'-একটি বড় পত্রিকা ছাড়া পত্রিকা অফিসগুলোতে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের অভাব, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র না থাকা, যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকা এবং পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে অবজ্ঞা-অবহেলা অনেক নারীকেই এই পেশায় দীর্ঘ সময় টিকে থাকাকে নিরুৎসাহিত করে। নারী সাংবাদিকদের কাজে ধরে রাখতে চাইলে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। গণমাধ্যমে নারীর সংখ্যা যত বাড়বে, পরিস্থিতি তত পাল্টাতে থাকবে।

আরেকটি বিষয় জরুরি, গণমাধ্যমে শুধু নারীরাই নিজেদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে কথা বললে হবে না, বরং নারীরা যেটা চাইছে সেটা পুরুষদেরও আন্তরিকভাবে চাইতে হবে। কর্মপরিবেশ বদলাতে হলে পুরুষ সহকর্মীর সক্রিয় ও সহমর্মী সহযোগিতা দরকার। কেননা, নারীর অবস্থা পরিবর্তনের দায় শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও। একটা দেশ বা সমাজ কতটা এগুলো তা অনেকখানিই নির্ভর করে সেই দেশ বা সমাজের নারীদের অবস্থানের ওপর। যে সমাজে ও প্রতিষ্ঠানে নারীরা সমতা ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থাকে, নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার পায়, সেই সমাজ ও প্রতিষ্ঠানকে ততটা উন্নত বলা হয়। সুতরাং নারীর উন্নয়ন বা নারীর মর্যাদা শুধু নারীর একার বিষয় নয় এটা পুরো সমাজের বিষয়, পুরো প্রতিষ্ঠানের বিষয় এবং পুরো মানব জাতির বিষয়। নারী সাংবাদিকদের সমস্যাকে তাই নারীর একার সমস্যা ভাবলে আমাদের খুব বড় ভুল হবে।

ইদানীং আরেকটি বৈষম্যমূলক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন অনেক পেশাদার নারী সংবাদকর্মী। যা তাদের পেশাগত জীবনে সামনের দিকে এগুনোকে বাধাগ্রস্ত করছে । অনেক প্রবীণ নারী সাংবাদিককে বলতে শুনেছি, মিডিয়া জগতে বয়স বাড়লে পুরুষ সহকর্মীকে বলা হয় 'অভিজ্ঞ' আর নারী সাংবাদিককে বলা হয় 'অযোগ্য'। এই সমাজে নারীরা নানা সামাজিক বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পরিণত বা মধ্যবয়সে যখন একজন পরিপূর্ণ সাংবাদিক হয়ে ওঠেন, গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারণী পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তখনই তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়ার পাঁয়তারা শুরু হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বয়স্ক ও অভিজ্ঞ নারী সাংবাদিকরা কাজ পান না। বয়স বাড়লে তারা কাজ হারান, চাকুরিচ্যুত হন। এটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ঘটছে বলেই মনে করেন কেউ কেউ।

তাছাড়া, ঢাকা'র বাইরে মফস্বলে যেসব নারী সাংবাদিক কাজ করেন তাঁদের অবস্থা আরো খারাপ। অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁদের টিকে থাকতে হয়।

ভারতীয় নারী সাংবাদিকদের নিয়ে করা সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে, অনেক সময়ই নারী সাংবাদিকরা চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি, অ্যাসাইনমেন্ট বিতরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যের কবলে পড়েন। কাজের জায়গায় পুরুষ সহকর্মী বা কর্মকর্তাদের যৌন হয়রানির কবলেও পড়তে হয় অনেককে। বাংলাদেশে এখনো এধরনের কোনো জরিপ বা গবেষণা হয়নি; কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা যে একেবারেই ঘটে না, তা কি নিশ্চিত করে বলা যাবে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাংবাদিকতার কোনো প্ল্যাটফরমেই নেতৃত্ব পর্যায়ে নারীদের উপস্থিতি খুব বেশি চোখে পড়ে না। অধিকাংশ নারী সাংবাদিকই মনে করেন, নারী সাংবাদিকদের বিষয়ে সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোকে আরো সংবেদনশীল হতে হবে। কেননা, সাংবাদিক ইউনিয়ন যতক্ষণ নারীর সমস্যাকে নিজের সমস্যা না ভাববে ততদিন অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না। এজন্য সাংবাদিক সংগঠনগুলোতে নারীদের বেশি মাত্রায় নেতৃত্বে আসা প্রয়োজন। শুধু একটি মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদ তৈরি করে সেখানে একজন নারীকে বসিয়ে দিলাম, আর সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল, তা নয়। সব পদেই নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকতে হবে। নেতৃত্বে আসার ক্ষেত্রে নারীদের আগ্রহ থাকলেও দেখা গেছে, প্রকাশ্য বাধা না পেলেও প্রবল মনস্তাত্ত্বিক বাধার মুখোমুখি হন তারা। উচ্চপদে ও শীর্ষ নেতৃত্বে এখনো নারীদের দেখতে অভ্যস্ত নয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।

এটা ঠিক গণমাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈষম্য একদিনে তৈরি হয়নি, ফলে রাতারাতি এটি দূর করাও সম্ভব নয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের সব পুরুষ সহকর্মীই একরকম নন। অনেকেই আছেন যারা জেন্ডার সংবেদনশীল, সহমর্মী এবং সচেতন। তারা সংখ্যায় কম হলেও, আমরা আশাবাদী গণমাধ্যমে এই ধরনের সহকর্মীর সংখ্যা বাড়বে এবং একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। গণমাধ্যমে নারীর সংখ্যা বাড়াতে হলে নিয়োগকর্তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হওয়া দরকার। নিয়োগ নীতিমালায় স্বচ্ছতা থাকাও জরুরি। বৈষম্য কমাতে ওয়েজবোর্ড ও সম্প্রচার নীতিমালায় নারীদের বিষয়টি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলেও মনে করেন নারী সাংবাদিকরা।

আমরা নারী-পুরুষ বৈষম্যমুক্ত গণমাধ্যম চাই। চাই নারীদের সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি সদস্য নারীকে মর্যাদা দিক, তাঁর চলার পথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ধরুক-এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষায় নারী সংগঠন

আফরোজা নাজনীন

নারীর পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই নারী সাংবাদিক সহায়ক কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠেছে

বলা যায় তারা এখনও গুটি গুটি পায়ে এগুচ্ছে। হাঁটছে, চলছে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আবার উঠেই দৌড়ে লক্ষ্য ছুঁয়েছে। নারী সাংবাদিকরা তাদের কর্মক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত করছে। তবে নারী সাংবাদিকরাও অন্যান্য সেক্টরের নারীদের মতো বৈষম্য ও বিরোধিতার শিকার। তাদের পাশে থেকে তাদের শক্ত পায়ে হেঁটে চলার জন্যই গড়ে ওঠছে বিভিন্ন সংগঠন।

সংবাদমাধ্যমে নারীর অবস্থান আজও তলানিতে পড়ে রয়েছে। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে কত নারী কাজ করেন তার সাম্প্রতিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যায়, দেশে পত্রিকা, অনলাইন ও টেলিভিশন মিলিয়ে সংবাদমাধ্যমে কর্মরত নারীর সংখ্যা এক হাজার। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন বা বিসিডিজেসি'র কয়েক বছর আগের জরিপ অনুযায়ী, এই সংখ্যা মোট সংবাদমাধ্যম কর্মীর শতকরা ছয় ভাগ। আরেকটি হিসাবে দিয়েও পরিস্থিতি বোঝা যায়।

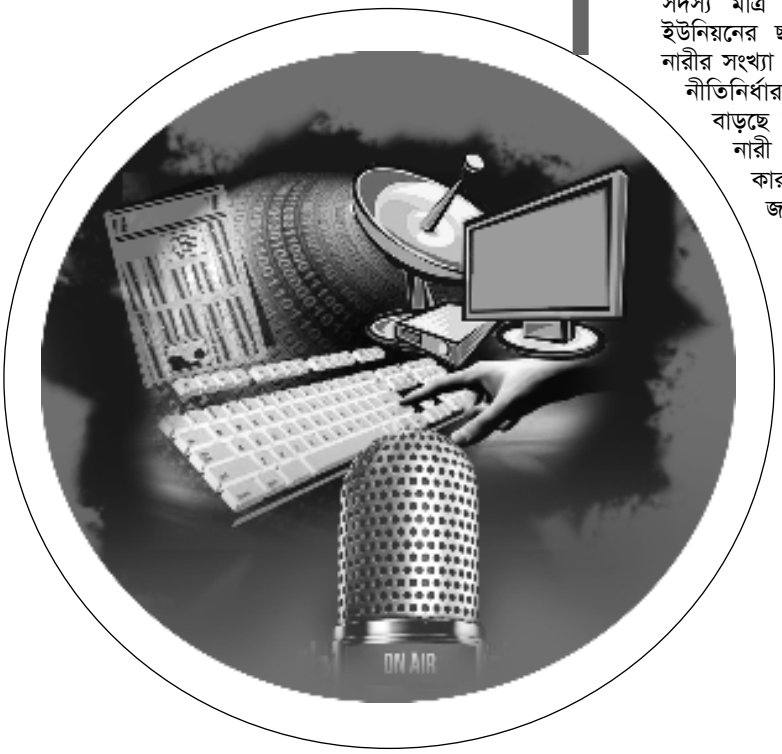

আর তাহলো, জাতীয় প্রেস ক্লাবের হিসাবে। সেখানে ২০১৮ জন সদস্যের মধ্যে নারী সদস্য মাত্র ৭২ জন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ছয় হাজার সদস্যের মধ্যেও নারীর সংখ্যা ১৫০ জনের বেশি নয়। তবে নীতিনির্ধারণী পদে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে না। বিগত সময়ের তুলনায় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ সত্তর দশকে ছিল মাত্র ১৫ জন।

২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় হেফাজতের সমাবেশে নির্যাতনের শিকার সাংবাদিক নাদিয়া শারমিনের কথায় নারীদের অংশগ্রহণ আশানুরূপ না হওয়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'নারী হওয়ার কারণেই আমাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।'

এ পেশায় বেতন বৈষম্যেরও শিকারও হন নারীরা। শিকার হন হয়রানিরও। এমনকি নিয়োগ দেয়ার সময়ও তাঁদের উপেক্ষা করা হয়। নানাবিধ অসঙ্গতি ধারণ করেই একজন নারীকে সাংবাদিকতার দুরহ পেশায় টিকে থাকতে হয়।

নারীর পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই নারী সাংবাদিক সহায়ক কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে অন্যতম নারী 'সাংবাদিক কেন্দ্র'। এ সংগঠনটি সক্রিয় এবং নারী সাংবাদিকের যেকোনো সংকটে পাশে দাঁড়ায়। সংগঠনটির যাত্রা শুরু ২০০১ সালের ৩১শে মার্চ। এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা পাঁচশ'। নাসিমুন আরা হক এ

প্রতিবেদককে বলেন, একজন নারীকে সাংবাদিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে লড়াই করে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। প্রতি পদে পদে তারা বাঁধার সম্মুখীন হন। তারা পুরুষের মতোই কাজ করেন, তাদেরও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। তবু সমাজের অন্য সেক্টরের মতো সাংবাদিকতায়ও নারী-পুরুষ বিভাজন রয়েছে।

তিনি বলেন,এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য এ পেশায় নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। কারণ সংখ্যা বাড়লে গুরুত্ব বাড়ে। সেই সঙ্গে গুণগতভাবে যোগ্যতাও বাড়াতে হয়। নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করেছি যে, সংবাদমাধ্যমে বিভিন্ন পদে অন্তত ৩০ ভাগ নারী নিয়োগ দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, নারী তার কর্মক্ষেত্রে অবস্থানগতভাবে দুর্বল, নিয়োগে, প্রশিক্ষণে, প্রমোশনে সবক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকরা বৈষম্যের শিকার। তাই তাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেখানে মেয়েরা নিজের কথা বলতে পারবে। নিজের কথা বলার জন্য প্রথমে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তাই তাদের পেশার অধিকার বাড়াতে আমরা বছরের বেশির ভাগ সময়েই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করি। এ ক্ষেত্রে প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ

বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকরা যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং সেন্সরশিপের সম্মুখীন হন তার বিরুদ্ধে আর্টিকেল ১৯ একটা প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের নানা ধরণের সমস্যা, হয়রানি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন

আমাদের সহযোগিতা করে। মূল কথা হলো, সাংবাদিকতায় নারীকে অনুপ্রাণিত করা, যোগ্যতা বৃদ্ধি করা ও তাদের কাজের পর্যবেক্ষণ বা মনিটরিং করা, এ তিনটি বিষয়ে আমরা জোর দেই। নারী তার কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্য ও অনিয়মের শিকার হয়। তাই তাদের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন। আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্পাদকদের কাছে নারী সাংবাদিকদের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান করেছি।

এ পর্যন্ত নারী সাংবাদিক কেন্দ্র ১৫জন নারী সাংবাদিককে বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়োগ দিয়েছে। পারিবারিকভাবে নির্যাতিত নারী সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মৌলবাদীর হাতে লাঞ্ছিত নাদিয়া শারমিনের পাশেও দাঁড়ায় এ সংগঠনটি।

বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষাকল্পে ইউকেভিত্তিক একটি ডাচ সংগঠন ফ্রি প্রেস আনলিমিটেডের সহযোগিতায় আর্টিকেল ১৯ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন প্রকল্প শুরু করেছে। বাংলাদেশের নারী সাংবাদিকরা যে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এবং সেন্সরশিপের সম্মুখীন হন তার বিরুদ্ধে আর্টিকেল ১৯ একটা প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা তাদের নানা ধরণের সমস্যা, হয়রানি, নিপীড়ন ও বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। এমনকি এসব সমস্যা সমাধানকল্পে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে তারা বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সুপারিশ বা উপদেশ পান। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নারী সাংবাদিকদের কর্মজগৎ কীভাবে আরো জেন্ডারবান্ধব করা যায় সে বিষয়েও তারা মত প্রদান করেন। তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনগত সুযোগ-সুবিধা, সহকর্মী এবং মালিকপক্ষের কাছে তাদের সমঅধিকারের ধারণা উপস্থাপন এবং পেশাজীবী সংগঠনগুলোতে তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়।

আর্টিকেল ১৯-এর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক তাহমিনা রহমান বলেন, 'নারী সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আপনারা যাতে অকুণ্ঠচিত্তে আপনাদের সমস্যা ও অসুবিধার কথা জানাতে পারেন সেজন্য আমরা একত্রিত হয়েছি। শুধু কাজ নয়, কাজের জন্য ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে এবং নিজেদের অধিকার ও দাবি-দাওয়াও আদায় করে নিতে হবে।'

সাংবাদিক শান্তা মারিয়া বলেন, আমাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে। এজন্য বিভাগীয় পর্যায়ে আমাদের নেটওয়ার্ক এবং সাপোর্ট গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে আমাদের একটি সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করতে হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যারা সাংবাদিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেন তাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, মিডিয়া হাউসগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা এবং একটা শক্তিশালী ওয়েবভিত্তিক ক্যাম্পেইন চালানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশে পৌঁছাতে পারব।

সাংবাদিকদের বিচারিক কাজে গতি আনা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির ইতিবাচক অগ্রগতির লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে ওয়েবসাইট 'নির্ভয়'। গত বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর, মানবাধিকার সংস্থা আর্টিকেল ১৯ আয়োজিত ' আমাদের রয়েছে জানার অধিকার, তথ্যের অধিকার:শঙ্কিত গণমাধ্যম ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' শীর্ষক সেমিনারে ওয়েবসাইটটির উদ্বোধন করা হয়। তথ্য সহায়ক চারটি ক্যাটাগরিকে প্রাধান্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওয়েবসাইট 'নির্ভয়'। এগুলো হলো: 'সুরক্ষা','সমীক্ষা', 'সহযোগিতা' ও 'সংস্কার'।

নারী সাংবাদিকদের কল্যাণের জন্য আরো রয়েছে মহিলা সাংবাদিক ফোরাম। বিশেষজ্ঞদের মতে, কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য কর্মসহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে বের হয়ে এসে গণমাধ্যমকে নারী সহায়ক করার উদ্দেশ্যে নারী উন্নয়ন, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক

গণমাধ্যমের সঙ্গে জনসংযোগ বিভাগের সম্পর্কোন্নয়নের কর্মপন্থা

নূর ইসলাম হাবিব

জনসংযোগ হচ্ছে একটি সুপরিকল্পিত এবং স্থায়ী কার্যাবলি যা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের বিকশিত হওয়ার জন্য অনুকূল আবহ বা পরিবেশ তৈরি করে।

জনসংযোগ এমন একটি দর্শন যা বিশ্বাস করে– আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শক্তির উৎস জনগণ এবং মানুষের সমর্থন।

জনসংযোগ অবশ্যই একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। জনসংযোগ বিভাগ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দর্শন জনগণের সামনে তুলে ধরে। অন্যদিকে এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা কী সে সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত রাখে। জনসংযোগ কোনো প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানিয়ে চলার কৌশল শেখায়। যাতে জনগণ বুঝতে পারে প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের সমর্থন নিয়েই এটি টিকে থাকবে। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনআস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে জনসংযোগ বিভাগ সহায়তা করে। জনসংযোগ পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে যার ফলে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে।

জনসংযোগের মূল কথা হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানই আধুনিক যুগে বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না

জনসংযোগের মূল কথা হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানই আধুনিক যুগে বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না। পারিপার্শ্বিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করবেই।

বৈশ্বিক গ্রামের সদস্য হয়ে কোনো কিছু থেকেই নিজেকে আর গুটিয়ে রাখার সুযোগ নেই। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। অন্যথায় তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং তা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানের দর্শনে পরিবর্তন নিয়ে আসে জনসংযোগ বিভাগ এবং ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিতে সহায়তা করে। ভবিষ্যৎ তাদেরই যারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারে। উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭) বলেন, 'যা কিছু বেঁচে থাকে তা একা বাঁচে না এবং নিজের জন্যও বাঁচে না (Everything that lives, lives not alone, nor for itself)' সমাজে বাস করতে হবে জনগণকে নিয়ে, জনসমর্থন নিয়ে। জনসমর্থন, জনগণের ভালোবাসা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে না। এজন্য জনস্বার্থে কাজ করতে হবে এবং তা জনগণকে জানাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন গণমাধ্যমের সহায়তা। গণমাধ্যমের সঙ্গে তাই গড়ে তুলতে হবে ভালো সম্পর্ক।

অব্যাহত যোগাযোগ

গণমাধ্যমের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে হলে তাদের সাথে অব্যাহত যোগাযোগ রাখতে হবে। যোগাযোগ করতে হবে টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি মাধ্যমে। তবে সামনা-সামনি যোগাযোগ সবচেয়ে কার্যকর। সাফল্যের মূল হচ্ছে যোগাযোগ। নিয়মিত দ্বিমুখী যোগাযোগ, তথ্যের আদান-প্রদান সাংবাদিকদের সাথে প্রতিষ্ঠানের সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে। কথা বললে তথ্য বিভ্রাটজনিত ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো যায়। দ্বিমুখী যোগাযোগ সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। পরিচিতি বাড়িয়ে দেয়। আর পরিচিতি থেকে আনুকূল্য পাওয়া যায়। যোগাযোগ হচ্ছে জনসংযোগের মূল কাজ।

অধ্যাপক নর্থকোট পারকিনসন যোগাযোগের গুরুত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বর্তমান বিশ্বে নীরব থাকার সুযোগ নেই। একটা সময় ছিল যখন একজন লোক নীরব থেকেও নিজের মতামত প্রচার করতে পারত। বর্তমানে একজন কথা বলা থেকে বিরত থাকলে অন্য কেউ না কেউ কথা বলবে এবং সে নিজের কথাই বলবে– নিজের মতো করে, নীরব থাকা ব্যক্তির কথা বলবে না। একজন ব্যক্তিকে তার নিজের কথা নিজেকেই বলতে হবে এবং এটা প্রতিপক্ষের তুলনায় অধিকতর কার্যকরভাবে বলতে হবে।'

সহযোগাযোগকর্মী (Fellow communicator)

সিএনএনের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক সাইরন ক্যান্ডেল বলেন, 'আমি সেই জনসংযোগকর্মীকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি যিনি জানেন আমার সংবাদমাধ্যম কী করছে, আমার প্রয়োজন কী এবং সেভাবে আমার প্রতি সাড়া দেয়।' সাংবাদিক এবং জনসংযোগবিদের পৃথক উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা সহযোগাযোগ কর্মী। এ অবস্থায় একে অন্যের প্রয়োজনটা বুঝতে পারলে তাদের মধ্যকার সম্পর্কটা হতে পারে অধিকতর ফলদায়ক। সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক তার পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার জন্য সাংবাদিক উদগ্রীব থাকেন। তিনি এমন তথ্যের পেছনে ছুটবেন যা তার পাঠক জানতে চায়, পাঠকের জানার অধিকার পূরণ করে। এর ফলে পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বাড়ে এবং বিজ্ঞাপন মূল্য ও বিজ্ঞাপন প্রাপ্তিও বাড়ে।

কর্মকৃতি এবং স্বীকৃতি অর্জন (Performance and recognition)

কথার মাধ্যমে নয় কাজের মাধ্যমেই জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা যায়, স্বীকৃতি অর্জন করা যায়। দায়িত্বশীল আচরণই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। জনসংযোগ মানে শুধু ভালো কথা বলা নয় বরং ভালো কাজ করা এবং তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

Public Relations- এর P মানে Performance এবং R মানে Recognition. ভালো কাজ করার পর তা প্রচার করলে জনগণের কাছে প্রশংসিত হওয়া যায় অন্যথায় নয়। যথাযথ ও ভালো কর্মকৃতি (Performance) ছাড়া জনসংযোগ সম্ভব নয়। একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইতিবাচক জনমত গড়ে তুলতে হলে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা প্রণয়নকালে সচেতন থাকতে হবে। সুনাম আসে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে– পরে আসে সুপরিকল্পিত যোগাযোগের বিষয়। কাজের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করতে হয় এবং তা ধরে রাখতে হয়। ভালো কাজ না করে খারাপ কাজ করলে জনসংযোগ বিভাগের পক্ষে সুনাম রক্ষা করা সম্ভব নয়।

জনসংযোগ বিভাগ মাউথপিস নয় নীতিচেতনা (A conscience not a mouth piece)

কোনো প্রতিষ্ঠান ভালো কাজ করলেই জনসংযোগের মাধ্যমে সুনাম বৃদ্ধি করা যায় নতুবা নয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের খারাপ নীতিমালা বা গণবিরোধী নীতিমালাকে জনসংযোগ দুরীভূত করতে পারে না। জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহি করতে শেখায়। ব্যবস্থাপনার বিবেকহীন কাজের দায় নিতে পারে না জনসংযোগ বিভাগ। জনসংযোগ রাতারাতি কোনো প্রতিষ্ঠানের ইমেজ গড়ে তুলতে পারে না। এটা করতে হবে সুপরিকল্পিত নীতিমালার মাধ্যমে। এটা একটি ধারাবাহিক ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে শুধু জনসংযোগ বিভাগ নয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক সদস্যের ভূমিকা রয়েছে। জনসংযোগের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানকে জনমতের প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা এবং জনপ্রত্যাশার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা। জনপ্রত্যাশা, জনআকাঙ্ক্ষার বিষয়টি জানা যায় মিডিয়ার মাধ্যমে। জনসংযোগ বিভাগ মিডিয়া মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে জানাতে পারে এবং ব্যবস্থাপনাকে সে অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়নে পরামর্শ দিতে পারে। জনমতকে বিভ্রান্ত করা জনসংযোগের কাজ নয়। জনসংযোগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সত্যকে লুকানো জনসংযোগের কাজ নয়। যে সুনাম প্রাপ্য নয় তা ধরে রাখতে পারে না জনসংযোগ বিভাগ। জনসংযোগ হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতিচেতনা (conscience) বাদ্যযন্ত্র নয় (not a mouth piece or organ)। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মিডিয়ার কাছে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে। আলোকসজ্জা করে ইমেজ বৃদ্ধি করার দিন শেষ। অতি প্রশংসা জনমনে প্রশ্নের সৃষ্টি করে, সন্দেহের সৃষ্টি করে, মিডিয়ার কাছে তো বটেই।

প্রতিষ্ঠানের সুনাম থাকলেই তা প্রচার করা যায় অন্যথায় নয়। ভালো কাজের ফলাফলই হচ্ছে সুনাম বা ইমেজ। এটা প্রতিষ্ঠানের দর্শন বা নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল। 'Public Relation is not damage control of bad ones' বরং বিরূপ পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করতে হয় তাই বলে দেয় জনসংযোগ। ভালো ও জনবান্ধব ব্যবস্থাপনা ভালো কাজের মাধ্যমে বা ভালো কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে। সত্য বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই– এটাই সত্যের ধর্ম।

গণমাধ্যমের আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন

সাংবাদিকদের কাছ থেকে জনসংযোগ বিভাগকে আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে। এটা একদিনে গড়ে ওঠে না। এটা গড়ে ওঠে দীর্ঘদিনে কাজের মাধ্যমে। মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকদের সাথে ছলচাতুরি করলে কিংবা মিথ্যাচার করলে কোনো দিন তাদের আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করা যায় না। তাদের সাথে সত্য কথা বলতে হবে। প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুটা ক্ষতিকর হলেও সত্য লুকানো ঠিক নয়। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন– 'You can fool all the people some of the time, some of the people all the time but you cannot fool all the people all the time'

সাংবাদিকদের সাথে সৎ, সহজ এবং বিনয়ী হতে হবে। খোলামেলা, সত্যবাদিতা ও ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তাদের প্রতি আস্থা রাখতে হবে। তারা আস্থার সম্পর্ক অবশ্যই রক্ষা করবেন।

প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর হলেও সাংবাদিককে বলা যাবে না সংবাদটিন কিল (kill) করুন। বড়জোর বলা যেতে পারে, সংবাদটির মধ্যে প্রতিষ্ঠানের বক্তব্যও অন্তর্ভুক্ত করুন। তবে স্পর্শকাতর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হলে সাংবাদিকদের অনুরোধ করলে তারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন এবং কোনো কোনো সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের মানবিকীকরণ (Humanising the institution)

বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের নেপথ্য শক্তিকে অনুধাবনের চেষ্টা করে, জনগণের প্রত্যাশার মূল্যায়ন করে এবং তাদের কর্মপরিকল্পনা সেভাবেই প্রণয়ন করে। এখানে পেশাগত সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো প্রতিষ্ঠান এটা করতে বাধ্য হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের কারণে। জনসংযোগ বিদ্যার জনক আইভি লেডবেটার লী বলেন, 'জনগণ এখন শাসন করে। তারাই এখন ক্ষমতার মালিক। রাজা-বাদশাহদের স্বর্গীয় ক্ষমতা এখন প্রতিস্থাপিত হয়েছে জনতার ক্ষমতায়ন দ্বারা। এখন জনতাই ক্ষমতায় আসীন।'

বর্তমানে জনগণ নিজস্ব মতামত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কোনো আদেশ-নির্দেশ জনগণ আর স্বর্গীয় আদেশ বা স্বর্গীয় আইন মনে করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেনে নিচ্ছে না বা মান্য করছে না। এখন তারাই নির্ধারণ করছে কে ক্ষমতায় থাকবে আর কে ক্ষমতায় থাকবে না।

পেশাগত সহযোগিতা

একটি ভালো সংবাদের গুরুত্ব সাংবাদিকের কাছে সবসময়ই বেশি। একটি সংবাদ দিয়ে সাংবাদিককে চমৎকারভাবে আপ্যায়ন করা যায়। ফাইভ স্টার হোটেলে ভূরিভোজ নয় সাংবাদিক ছোটেন সংবাদের পেছনে। গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে তাকে তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দ্রুততম সময়ে সরবরাহ করা। কেননা তিনি কাজ করেন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। সাংবাদিককে সংবাদমূল্য আছে এরকম ঘটনার তথা সুলিখিতভাবে ও দ্রুত দিতে হবে। সাংবাদিক ফোন করলে তা ধরতে হবে এবং তার নাম-পদবি, সংস্থার নাম ও তিনি কী জানতে চান তার নোট নিতে হবে। তার চাহিত তথ্য সংগ্রহ করে তাকে ফিরতি ফোন দিতে হবে। কোনো কিছু না ভেবেচিন্তে কথা বলা বা চাপের মধ্যে কিছু বলে ফেলার লোভ সংবরণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে তাকে বরং কিছুক্ষণ পরে ফোন দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্নের উত্তরের পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে ভেবে নিতে হবে। সাংবাদিককে অবশ্যই ফিরতি ফোন দিতে হবে যদি প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরি নাও দেয়া যায়। তাকে এ সীমাবদ্ধতার কথা খোলাখুলি বলাও যেতে পারে। প্রশ্নের পুরোপুরি উত্তর জানা না থাকলে প্রতিষ্ঠানের যথার্থ কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলার জন্য বলা যেতে পারে। 'কোন মন্তব্য নেই' বা 'আমি এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য প্রস্তুত নই' এ ধরনের কথা বলা যাবে না। এতে সাংবাদিকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

আন্তঃনির্ভরতা (Mutual Interdependence)

মিডিয়া এবং কোনো প্রতিষ্ঠানের সমান দায়িত্ব রয়েছে জনগণকে সঠিক ঘটনা জানানো। জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্ব কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কী ঘটছে তা জনগণকে জানানো। এখানে জনসংযোগ বিভাগ সংবাদমাধ্যমের সহায়তা নিতে পারে।

সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রচার করা

এবং জনগণকে জানানো। এখানে পরস্পরের মধ্যে রয়েছে আন্তঃনির্ভরতা। একারপক্ষে এটা সম্ভব নয়। এখানে পারস্পরিক ঈর্ষা ভুলে পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যা পারস্পরিক প্রয়োজনবোধের ওপর ভিত্তিশীল। জনসংযোগ বিভাগ মিডিয়াকে তথ্য দিতে চায় জনগণকে জানানোর জন্য। অন্যদিকে মিডিয়াও বুঝতে পারছে তার পাঠকসমাজের জানার আগ্রহ আছে এরকম তথ্য দিতে পারে জনসংযোগ বিভাগ। বর্তমানে জনসংযোগ পেশা এবং সাংবাদিকতা পেশা একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। মাঝে-মধ্যে তাদের সম্পর্ক সাংঘর্ষিক হতে পারে। তবে প্রায়ই সংবাদের তথ্য সংগ্রহ ও সংবাদ লিখনের কাজটি একই রকম হয়ে থাকে। জনসংযোগ বিভাগ সাংবাদিকদের সহযোগী অংশীদার। ভারসাম্যপূর্ণ সংবাদ লিখনের জন্য সাংবাদিকরা জনসংযোগ বিভাগের ওপর নির্ভরশীল।

অনেকে বলতে পারেন সংবাদমূল্য রয়েছে এরকম সংবাদবিজ্ঞপ্তি জনসংযোগ বিভাগ থেকে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু যখন সংবাদমূল্যসম্পন্ন ঘটনা কোনো প্রতিষ্ঠানে ঘটে তখন বিস্তারিত তথ্যই শুধু প্রয়োজন পড়ে না তা তাৎক্ষণিকভাবেও প্রয়োজন পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জনসংযোগ বিভাগই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য সংবাদসূত্র হিসেবে কাজ করতে পারে। জটিল সমাজ বিন্যাসে একজন তথ্যসমৃদ্ধ মুখপাত্র তথ্য প্রবাহকে সহজ (Facilitate) করার উদ্দেশ্যে মিডিয়ার কাছে সবসময়ই বহুল কাঙ্ক্ষিত।

মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন (Role of the mediator)

জনসংযোগবিদ কোনো প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র এবং একই সাথে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সংবাদকর্মী। তিনি একদিকে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেন এবং অপরদিকে মিডিয়ার জন্যও কাজ করেন। তিনি মিডিয়ার কাছে তার প্রতিষ্ঠানকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেন এবং প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিকে বলেন, কীভাবে মিডিয়ার প্রতি খোলামেলা নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থরক্ষা করা যেতে পারে। তিনি জানেন, সাংবাদিক কী জানতে চায় এবং কীভাবে তাদের সাথে চলতে হবে। একই সাথে তিনি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির সমস্যাও জানেন ও বোঝেন। কখনো-কখনো তার প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম তার ভূমিকা পছন্দ নাও করতে পারেন। তারপরেও জনসংযোগবিদের কাজ হবে ধৈর্যসহকারে দুইপক্ষকে প্রভাবিত করে পারস্পরিক স্বার্থে সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে একজন পেশাদার জনসংযোগবিদ কোনো প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং সহায়ক ব্যক্তি।

কোনো সংস্থার অভ্যন্তরীণ সংবাদ ও তথ্যের জন্য একজন সাংবাদিক সর্বপ্রথম সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মীরই শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। সবসময় হয়তো তিনি সাংবাদিকের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি অন্তত তথ্যসমৃদ্ধ বা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি বা সূত্রের সন্ধান দিতে পারেন। তিনি সাংবাদিকের জন্য যথাযথ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকারের আয়োজনও করে দিতে পারেন। উভয়পক্ষকে সহায়তার জন্য তিনি এসময় উপস্থিত থাকবেন। এসময় তিনি প্রতিবন্ধক নয় বরং উভয়পক্ষের জন্য সহায়ক (Facilitator) হিসেবে কাজ করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর সাংবাদিকের অতিরিক্ত কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে অথবা প্রাসঙ্গিক কোনো ছবির প্রয়োজন হলে জনসংযোগবিদ এক্ষেত্রে সাংবাদিককে সহযোগিতা করতে পারেন। রিপোর্ট লেখার সময় কোনো তথ্য সাংবাদিক পুনঃযাচাই করে নিতে পারেন জনসংযোগবিদের নিকট থেকে। সাংবাদিক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হলে 'অব দ্য রেকর্ড' কোনো কথাও বলা যেতে পারে। তাছাড়া সাংবাদিকতার পরিভাষা জানা থাকায় জনসংযোগবিদ উভয়ের জন্য সহজ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে তা দেখতে চাইতে পারেন। কোনো সাংবাদিক তার রিপোর্ট প্রকাশের আগে কেউ তা সেন্সর করুক তা সাধারণত চাইবেন না। তবে স্পর্শকাতর ও বিশেষায়িত ক্ষেত্রে সাংবাদিককে বোঝানো যেতে পারে যে, সেন্সর নয় বরং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখিয়ে নিলে ভালো ফলই হয়। তবে সাধারণ ক্ষেত্রে সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রতি আস্থা রাখা ভালো।

প্রয়োজন নেই তখন বন্ধুত্ব করতে হবে

জনসংযোগ বিভাগ শুধু প্রয়োজনের সময় সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু বন্ধুত্ব করতে হবে যখন প্রয়োজন নেই তখন। বন্ধুত্ব করতে জানা হলো জনসংযোগ শিল্প (art of making friends)। সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগ করা, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন নেই এমন তথ্য প্রদান সাংবাদিকদের কাছে সবসময়ই প্রশংসাযোগ্য। যোগাযোগ করা যেতে পারে রিপোর্টার, চিফ রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এবং বার্তা সম্পাদক পর্যায়ের সাংবাদিকদের সাথে। কখনো-কখনো সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Conflict of interest)

সাংবাদিক তার পাঠক-শ্রোতার জানার অধিকার পূরণে সচেষ্ট। অন্যদিকে জনসংযোগবিদ তার প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ দেখে থাকেন। তবে আমাদের দেশে বর্তমানে জনসংযোগ বিভাগ পেশাগতভাবে গড়ে উঠেছে এবং সাংবাদিকরাও জনসংযোগ বিভাগকে তাদের সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করছেন।

দেশের তথ্যপ্রবাহ পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে জনসংযোগ বিভাগ। সকল মিডিয়ার সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ, সব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তর থেকে সংবাদ বের করে আনার মতো জনবল ও আর্থিক সঙ্গতি নেই। এ সকল ক্ষেত্রে সংবাদ সরবরাহ করে জনসংযোগ বিভাগ সংবাদমাধ্যমকে সহায়তা করে। জনসংযোগ বিভাগ তথ্যপ্রবাহ পদ্ধতিতে অবদান রাখছে, তথ্যপ্রবাহ ত্বরান্বিত করছে (Subsidises)। যেখানে সংবাদমাধ্যম জনবল নিয়োগ করতে পারছে না, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যেতে পারছে না সেখানে সংবাদ সরবরাহ করে মিডিয়াকে সহায়তা করছে জনসংযোগ বিভাগ। তবে সাংবাদিক সবসময়ই জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ ফলাও করে প্রচার করবেন তেমনটি না-ও হতে পারে। মিডিয়া হ্যান্ডআউট জার্নালিজমের (handout journalism)-এর ফোরাম হতে চাইবে না। অন্তত গণতান্ত্রিক সমাজে।

গণমাধ্যম স্বাধীন তবে গণমাধ্যম থেকে স্বাধীনতা নয়

গণতান্ত্রিক সমাজে গণমাধ্যম স্বাধীন। কিন্তু গণমাধ্যমের কাছ থেকে কোনো স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না। তাদের চাহিদামতো তথ্য দিতে হবে, তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। গণমাধ্যমের কাছে জবাবদিহিতা মানে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা। এজন্য মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে এবং তথ্য উপস্থাপনার শিল্প আয়ত্ত করতে হবে। গণমাধ্যমের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার একমাত্র দায়িত্ব জনসংযোগ বিভাগের নয়। গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সকলের আচরণের ওপর। জনসংযোগ বিভাগ শুধু পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে যেখানে উভয়পক্ষ তাদের পারস্পরিক স্বার্থে কাজ করতে পারে।

মিডিয়া কোনো কিছু জানতে চাইলে তাকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মিডিয়া কী জানতে চায় তা বুঝতে পারলে দুইপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। মিডিয়ার মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে কর্তাব্যক্তিকে মিডিয়া কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে এবং তার সম্ভাব্য উত্তর কী হবে সে বিষয়ে পূর্বানুমান করতে জানতে হবে। মিডিয়ার প্রতি সৎ ও খোলামেলা হতে হবে শীর্ষব্যক্তিদের। সবশেষে কর্তাব্যক্তিকেই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে জনসংযোগবিদকে নয়।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করার সুযোগ

জনসংযোগ কর্মকর্তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের সুযোগ থাকতে হবে। জনসংযোগের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সহজে যোগাযোগ করতে পারার সুযোগের ওপর। জনসংযোগ বিভাগের প্রধান যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি কথা বলতে না পারেন তাহলে সফলতা লাভে তিনি ব্যর্থ হবেন। মধ্যবর্তীস্তরে কেউ থাকলে অহেতুক সময় ক্ষেপণ হবে, জনসংযোগের কার্যকারিতা নষ্ট হবে, জনসংযোগ কাজ সিদ্ধান্তহীনতায় আটকে যাবে। এর মধ্যে হয়তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে, সুনাম নষ্ট হবে যা পুনরুদ্ধারে অনেক সময় লাগবে। জনসংযোগ বিভাগকে অন্যকোনো শাখার অধীনস্থ করলে এর বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থাপকের ভূমিকা খর্ব হয়।

উপহারসামগ্রী প্রদানে সাবধান থাকতে হবে

খুব দামি ও অস্বাভাবিক কোনো উপহারসামগ্রী প্রদান থেকে সাবধান থাকতে হবে। ছোটখাটো উপহার সামগ্রী সৌজন্য হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। দামি উপহার কিংবা পাঁচ তারকা হোটেলে আপ্যায়ন করা হলে উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। প্রকাশনা, ডায়েরি, ক্যালেন্ডার, স্যুভেনির ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। সাংবাদিকদের আপ্যায়নে নিমন্ত্রণ করা যাবে যদি সেখানে পেশাগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে তারা কিছু মনে করবেন না। মনে রাখতে হবে, অর্থ কিংবা উৎকোচ দিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না, বিশ্বাসযোগ্য ও আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। টাকা-পয়সা দেওয়া কিংবা ভূরিভোজ সম্পর্ক নষ্ট করে, সম্পর্ক বিতর্কিত করে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজি রক্ষার্থে সাংবাদিক পুষতে দেখা যায়। এমনকি কর্পোরেট পুঁজি রক্ষার্থে অনেকে মিডিয়া হাউস খুলে বসেন।

সাংবাদিকদের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে

সাংবাদিকদের টেলিফোন ধরার জন্য দিনের ২৪ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকতে হবে। তাদের যেকোনো সময় জনসংযোগ বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি গভীর রাতেও। মোবাইল কখনো বন্ধ রাখা যাবে না।

কোনো অবস্থাতেই সংবাদ ছাপা কিংবা সংবাদ ছাপা থেকে বিরত রাখার জন্য অনুনয়, বিনয় করা যাবে না। খারাপ সংবাদ পত্রিকায় না আসার জন্য সংস্থায় যাতে খারাপ কাজ না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে। ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি নিয়ে দুশ্চিন্তা করা ঠিক নয়। এমনকি কোনো সংবাদ না ছাপালে অনুতপ্ত হবারও কিছু নেই। এবার হয়তো ছাপায়নি অন্যবার ছাপাবে।

মিডিয়া হাউস পরিদর্শন
নিয়মিত মিডিয়া হাউস পরিদর্শনে যেতে হবে। তবে আগে কথা বলে সময় ঠিক করে নিতে হবে। হঠাৎ হাজির হলে তারা সময় নাও দিতে পারেন। তারা সবসময় ব্যস্ত থাকেন। কখনো বাইরে থাকেন। বর্তমানে জনসংযোগ বিভাগেরও ব্যস্ততা বেড়েছে। এজন্য অন্তত মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ রক্ষা করা যেতে পারে। প্রতিনিধির মাধ্যমে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো যেতে পারে। তবে জনসংযোগ বিভাগের প্রধানকেই মিডিয়া প্রত্যাশা করে।

জনসংযোগ অ্যামেচারদের কাজ নয়
জনসংযোগ কোনো নবিশের কাজ নয়। জনসংযোগ কর্মকর্তার থাকতে হবে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, যোগাযোগ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। তা না হলে প্রতিষ্ঠান ও পেশা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য লোক নিয়োগের সময় এ বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। নিয়োগপরবর্তী সময়ে জনসংযোগ কর্মীর জন্য দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জনসংযোগ ক্রমবিকাশমান পেশা। এজন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

RACE Formula

জনসংযোগ হচ্ছে একটি পদ্ধতি। এখানে থাকতে হবে গবেষণা, কার্য, যোগাযোগ ও মূল্যায়ন (Research, Action, Communication and evaluation)। যে কাজ জনগণ পছন্দ করে তা বেশি বেশি করতে হবে এবং জনগণকে তা জানাতে হবে যোগাযোগের মাধ্যমে। যা পছন্দ করে না সে কাজ পরিহার করতে হবে। জনসংযোগ হচ্ছে ৯০ ভাগ ভালো কাজ করা এবং ১০ ভাগ প্রচার করা।

হলুদ সাংবাদিকতা থেকে সাবধান
যারা হলুদ সাংবাদিকতা করে তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। তারা অসত্য, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ ছেপে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে। তারা সাংবাদিকতার কোনো নীতিমালা অনুসরণ করে না। এদের সাথে যোগাযোগ রাখা ঠিক নয়। প্রতিরক্ষা স্থাপনার মতো স্পর্শকাতর স্থাপনায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো ঠিক হবে না। বৈরি সাংবাদিক সবসময় পরিত্যাজ্য।

টেলিফোনে সাক্ষাৎকার না দেওয়া
টেলিফোনে সাক্ষাৎকার দেওয়া ঠিক নয়। লিখিত সাক্ষাৎকার দিতে হবে এবং কপিতে সাংবাদিকের স্বাক্ষর নিতে হবে। সাক্ষাৎকার দেওয়ার পূর্বে বিষয়বস্তু জেনে নিতে হবে এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা পূর্বে থেকে জেনে নিতে পারলে ভালো। তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর যথাযথ নাও হতে পারে। অপ্রস্তুত অবস্থায় মিডিয়ার মুখোমুখি হলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হতে পারে। সাংবাদিকও তার কাঙ্ক্ষিত উত্তর থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

যথাসময়ে সংবাদ সরবরাহ
যথাসময়ে গণমাধ্যমে সংবাদবিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করতে হবে। কেননা গণমাধ্যম চলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। তাদের কাজ করতে হয় নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেমের মধ্যে। সাংবাদিকরা যথাসময়ে প্রেরিত, উপযুক্ত ফরম ও আকারে লিখিত তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ সবসময়ই পছন্দ করেন। সংবাদ লিখতে হবে উল্টোপিরামিড কাঠামোয়। থাকতে হবে উপযুক্ত শিরোনাম ও সংবাদসূচনা। সংবাদ শিরোনাম ও সংবাদসূচনা পড়েই বার্তা বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় উক্ত সংবাদটি ছাপারযোগ্য কিনা। বাংলা পত্রিকার জন্য বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকার জন্য ইংরেজি সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে। ছবির থাকতে হবে উপযুক্ত ক্যাপশন– বাংলা ও ইংরেজিতে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের এত লোক নেই যারা অনুবাদ ও পুনর্লিখন করবেন। সংবাদ ও ছবি প্রেরণের উপযুক্ত মাধ্যম ই-মেইল।

বিনম্র প্রতিবাদলিপি (Polite rejoinder)

পারতপক্ষে প্রতিবাদলিপি না দিয়ে পারলেই ভালো। গণমাধ্যম প্রতিবাদলিপি পছন্দ করে না। তার চেয়ে বরং ক্ষতিপূরণের জন্য অন্য একটি ভালো রিপোর্ট করিয়ে নেয়া যায়। প্রতিষ্ঠানের জন্য হানিকর এরকম ভুল তথ্যসম্বলিত সংবাদ ছাপা হলে বা প্রকাশিত হলে সংবাদের অসত্য অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের সাথে আলোচনা করতে হবে। প্রতিবাদলিপি যদি একান্তই দিতে হয় তবে তার ভাষা হবে মার্জিত ও সুনির্দিষ্ট যাতে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি না হয়। সংবাদমাধ্যম কিংবা সাংবাদিককে আক্রমণ করে কিছু লেখা ঠিক নয়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ মানুষের মতো সাংবাদিক অথবা মিডিয়াও চায় না প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করতে। তারা সংশোধনী ছাপাতে বাধ্য হলেও তা তেমন গুরুত্ব পায় না প্রকাশিত সংবাদের মতো। সংশোধনী ছাপা হয় গুরুত্বহীনভাবে, পত্রিকার এক কোণে ছোট করে যাতে পাঠক সহজে দেখতে না পায়। পত্রিকার সাংবাদিককে দিয়ে প্রতিবাদলিপির পরিবর্তে পৃথক রিপোর্ট করিয়ে নিলে সেখানে সাংবাদিক সরাসরি ভুল স্বীকার না করেও তাতে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেন। এর ফলে পাঠক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাবেন। এটা সাংবাদিকের জন্য কম সম্মানহানিকর ও পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর কম আঘাত করে। তবে সময় বদলেছে। সাংবাদিক-সম্পাদক, প্রকাশক এখন ভুল স্বীকারের মানসিকতা অর্জন করেছেন এবং ভুল স্বীকার করে সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, 'সাংবাদিকতায় যতগুলো সৌন্দর্য আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হচ্ছে ভুল স্বীকার করা। এতে সাংবাদিকতার ওপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।'

সাংবাদিক সম্মেলন
গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ প্রচারের জন্য সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করা যেতে পারে। এর ফলে ভালো মিডিয়া কভারেজ পাওয়া যায় এবং সংবাদে বৈচিত্র্য আসে। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাংবাদিককে বলার প্রয়োজন পড়লেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এর মাধ্যমে সাংবাদিকগণ যার যার দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ লেখার ও প্রকাশের সুযোগ পায়। সাংবাদিকরা নিজ নিজ মিডিয়ার নীতিমালা অনুযায়ী প্রশ্ন করে তথ্য জেনে নিতে পারেন। যা সাধারণত সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে নাও থাকতে পারে। শুধু সংবাদবিজ্ঞপ্তি দিলে স্বকীয়তা থাকে না। সব পত্রিকার সংবাদ একই রকম হয়ে যায়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে এবং এর কপি উপস্থিত সাংবাদিকদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। সংবাদ সম্মেলন আহবানের পূর্বে উপস্থাপনার বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপনশেষে প্রশ্নোত্তরপর্ব থাকতে হবে। প্রশ্নোত্তরপর্ব যাতে ঝুলে না যায় সেজন্য প্রশ্নের সংখ্যা নির্ধারণ বা সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেতে পারে। লিখিত বক্তব্যের কপি সকলকে বিতরণ করতে হবে।

ঘরোয়া সাময়িকী প্রকাশ
ঘরোয়া সাময়িকী জনসংযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মাধ্যমে ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল পাবলিকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। সাংবাদিকদের মাঝে ঘরোয়া সাময়িকীর কপি নিয়মিত বিতরণ করা যেতে পারে। এর ফলে সাংবাদিকরা কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন। তারা ঘরোয়া সাময়িকী থেকে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে রিপোর্ট করার ক্লুও পেতে পারেন।

পরিচালিত সফর
সাংবাদিকদের জন্য পরিচালিত সফর বা Guided Tour-এর আয়োজন করা যেতে পারে। এসময় তাঁদের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে ভালো মিডিয়া কভারেজ পাওয়া যায় এবং সম্পর্ক উন্নত করার সুযোগ পাওয়া যায়। সফরের সময় সাংবাদিকদের হাত খরচ হিসেবে সামান্য টাকা দেওয়া যেতে পারে। পরিচালিত সফর যে বিষয়ে মিডিয়া কভারেজের জন্য করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ লিখিত প্রতিবেদন সাংবাদিকদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের আয়োজন
সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে পরস্পরকে জানা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য হতে হবে
জনসংযোগ কর্মকর্তাকে পেশাজীবী সংগঠন যেমন- জাতীয় প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতি ইত্যাদি সংগঠনের সদস্য হতে হবে। নিয়মিত ক্লাবে যেতে হবে এবং সাংবাদিকদের সাথে মিশতে হবে।
বর্তমানে সাংবাদিকতা পেশা এবং জনসংযোগ পেশা বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। উভয় পেশাই সময়ের বিবর্তনে কার্যক্ষেত্রে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মাঝে-মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হলেও উভয় পেশাই পারস্পরিক স্বার্থেই সম্পর্কোন্নয়নের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র
১. Public Relations Today, Subir Ghosh, Abhinaba Printers, Calcutta-700006, Second Edition (Revised)-January, 2001.
২. Efective Public Relations, Scott M. Cutlip and Allen H. Center, Fourth Edition
৩. জনসংযোগ - সমর বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
৪. প্রথম আলো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ঢাকা।

লেখক: আইএসপিআর-এ কর্মরত

ডিজিটাল মিডিয়া

সৌমিত্র দেব

আমরা যারা অনলাইন মিডিয়া নিয়ে কাজ করি, আমাদের ধারণা গণমাধ্যমে সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার আমরাই করছি। কম্পিউটার, ল্যাপটপ এগুলো তো প্রযুক্তির হাল নমুনা। সনাতন গণমাধ্যমে যেখানে সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন সব আলাদা মাধ্যম, সেখানে অনলাইনে আমরা সবকিছুকে এক জায়গায় পাচ্ছি। একটি পিসিতেই এখন পত্রিকা পড়া যায়, টেলিভিশন দেখা যায়, রেডিও শোনা যায়। কিন্তু আমরা খেয়াল করিনি, কখন যে আমাদের গণমাধ্যম কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ ছাড়িয়ে আরো অনেক এগিয়ে গেছে। গণমাধ্যমের সর্বশেষ প্রযুক্তি এখন আশ্রয় নিয়েছে মোবাইল ফোনে। জাতীয় কবি বলেছিলেন, 'বিশ্বটাকে দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।' এই কথাটিকেই যেন বাস্তব করে দিলো এই মুঠো ফোন। কম্পিউটার-ল্যাপটপের চেয়ে অনেক বেশি গণমুখী এই প্রযুক্তি। ডিজিটাল ডিভাইসের কারণে একে আমরা ডিজিটাল মিডিয়া নামে ডাকতে চাই। এটি আরো সহজ, প্রাণবন্ত একটি গণমাধ্যম। কম্পিউটার স্থির, আর ল্যাপটপ বহনযোগ্য হলেও কিছুটা ভারি ছিল; কিন্তু এই মিডিয়া একেবারেই মুঠোর ভেতরে।

গণমাধ্যমের সর্বশেষ প্রযুক্তি এখন আশ্রয় নিয়েছে মোবাইল ফোনে

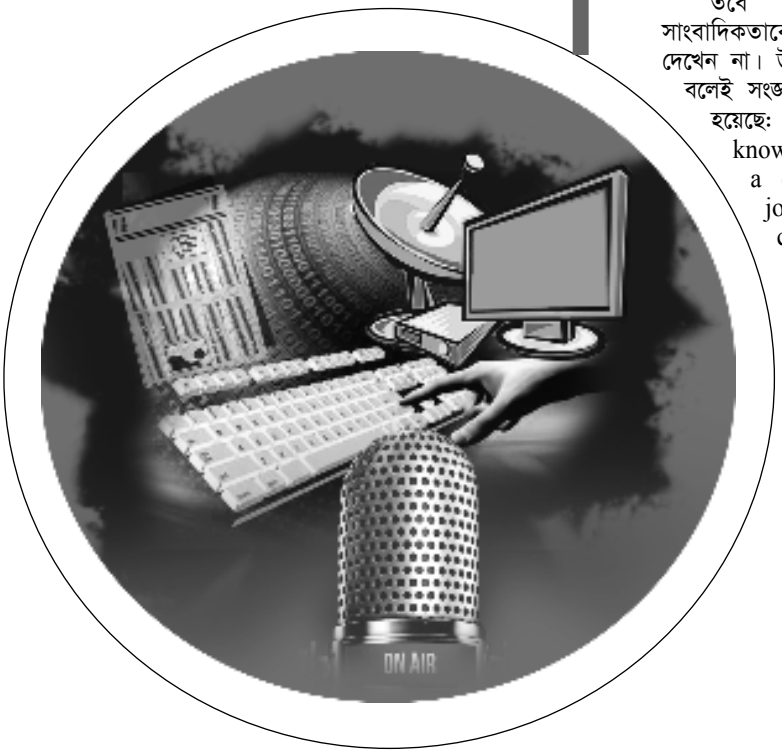

তবে ডিজিটাল মিডিয়া বা সাংবাদিকতাকে অনেকেই আলাদা করে দেখেন না। উইকিপিডিয়া'য় একে একীভূত বলেই সংজ্ঞায়িত করেছে। সেখানে বলা হয়েছে: 'Digital journalism also known as online journalism is a contemporary form of journalism where editorial content is distributed via the Internet as opposed to publishing via print or broadcast. What constitutes 'digital journalism' is debated by scholars. However the primary product of journalism which is news and features on current affairs, is presented solely or in combination as text, audio-video and some interactive forms, and disseminated through digital media platforms.

Fewer barriers to entry, lowered distribution costs, and diverse computer networking technologies have led to the widespread practice of digital journalism. It has democratized the flow of information that was previously controlled by traditional media including newspapers, magazines, radio and television. সেখানে আরো বলা হয়েছে: 'A greater degree of creativity can be exercised with digital journalism

when compared to traditional journalism and traditional media. The digital aspect can be central to the journalistic message or not, and remains within the creative control of the writer, editor, and/or publisher.'

ডিজিটাল সাংবাদিকতা নিয়ে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার একটু অন্যরকম মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, 'আমি নিজে মনে করি, ডিজিটাল সাংবাদিকতা মানে হচ্ছে, মাল্টিমিডিয়া বা পাঠ্য বিষয়, অডিও, স্থির ও চলমান চিত্র সহযোগে ইন্টারঅ্যাকটিভ পদ্ধতিতে তথ্য-উপাত্তকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করা। এটি বস্তুত প্রচলিত গণমাধ্যম বা বিরাজমান সাংবাদিকতার বিকল্প। যদিও ডিজিটাল সাংবাদিকতা মানেই সাংবাদিকতার প্রচলিত ধারণার সকল কিছুরই পরিবর্তন নয়, তবুও এটি নিঃসন্দেহে প্রচলিত সাংবাদিকতার জন্য একটি নতুনমাত্রা। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কেবল একটি মাধ্যম ব্যবহৃত হয় না। মাধ্যম ব্যবহারের কোনো সীমাবদ্ধতাও এতে নেই। মানুষের প্রকাশ করার তিনটি মাধ্যম পাঠ্যবিষয়, অডিও ও চিত্র তিনটির যেকোনো একাধিক বা সব কটি ব্যবহার করা ছাড়াও এতে ইন্টারঅ্যাকটিভিটি যোগ করা যায়।

অনেকেই এমন প্রশ্ন করে থাকেন, ডিজিটাল সাংবাদিকতা কি প্রচলিত সাংবাদিকতার চাইতে ভিন্ন? হতে পারে, সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়গুলো কোনো মাধ্যমেই বদলায় না। বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা, স্পষ্টতা, প্রাঞ্জল্য এসব সাংবাদিকতার মৌলিক বিষয়। জনগণের কাছে তার প্রাপ্য তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করাটা সাংবাদিকতার একটি লক্ষ্য। তবে কাগজের পত্রিকা আর টেলিভিশনে সাংবাদিকতার কৌশল যেমন একই রকম থাকে না, তেমনি প্রচলিত সাংবাদিকতা বা ডিজিটাল সাংবাদিকতার কৌশলও এক হতে পারে না। এমনকি যেহেতু তথ্য-উপাত্ত বা সংবাদ পরিবেশনের বিষয়টি আলাদা এবং যেহেতু এর প্রকাশের মাধ্যমও ভিন্ন তাই সংবাদ তৈরির বিষয়টিও ভিন্ন। যারা এই পার্থক্যটুকু বুঝতে অক্ষম তারা ডিজিটাল সাংবাদিকতায় সফল হতে পারবেন না।

উইকিপিডিয়ার মতে টেলিটেক্সট নামক প্রযুক্তির সহায়তায় ১৯৭০ সালে ডিজিটাল সাংবাদিকতার সূচনা হয় ব্রিটেনে। আমি অবশ্য সেটি মনে করি না। কারণ টেলিটেক্সট সংবাদ উপস্থাপনাকে ভিন্নতর করেছে বটে তবে ডিজিটাল সাংবাদিকতার মৌলিক চরিত্র তাতে উপস্থিত ছিল না। টেলিটেক্সটে তথ্যাদি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপিত হতো। প্রধানত সংবাদ শিরোনাম বা ব্রেকিং নিউজ এই পদ্ধতির উপজীব্য বিষয় ছিল। এরপর আসে ভিডিও টেক্সট। অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন, টিভি স্ক্রিনের খবরগুলোকে পাঠ্য বিষয় আকারে উপস্থাপন করা হতো এবং পাঠক সেখান থেকে খবর বাছাই করতে পারত। ১৯৭৯ সালে প্রচলিত প্রিস্টেল ভিডিও টেক্সট সিস্টেম ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে। এদের মাঝে 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস'ও ছিল। ১৯৮৬ সালে ভিডিও টেক্সট পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কম্পিউটার গেমিং ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল সাংবাদিকতার একটি প্রযুক্তি অধিগ্রহণ করে। তবে ডিজিটাল মিডিয়ার সূচনা হয় প্রায় একই সময়ে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জন্মের পর। আমি ইন্টারনেটের দীর্ঘ ইতিহাসের কথা বলব না। বস্তুত সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইন্টারনেটের তেমন সম্পর্কও গড়ে ওঠেনি, যতদিন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের জন্ম না হয়। একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসভিত্তিক ব্যবস্থার মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠে নতুন পৃথিবীর নতুন ইন্টারনেট ব্যবস্থা। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালে মোজাইক নামক ব্রাউজারের জন্ম হওয়ার পর সাধারণ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারে আকৃষ্ট হতে থাকে। ১৯৯৪ সালে জন্ম নেয় নেটস্কেপ নেভিগেটর ব্রাউজার। ১৯৯৫ সালে জন্ম নেয় ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। এসবেরও আগে আমেরিকার উত্তর ক্যারোলিনায় নান্দো নামক একটি নিউজ সাইটের জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। ব্রাউজারের জন্মের পর নান্দোর প্রসার ব্যাপক হতে থাকে। এমনকি ১৯৯৬ সাল নাগাদ আমেরিকার পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। এই সময়েই আমেরিকান অনলাইন ও ইয়াহু অনলাইন নিউজ সার্ভিস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রডিগি ও কম্পুসার্ভ অনলাইনে সংবাদপত্র পরিবেশনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। পিউ গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিবেদনে জানা যায়, ২০০৮ সালে বেশির ভাগ আমেরিকান অনলাইনে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর সংগ্রহ করে। অন্যদিকে ২০০০ সালেই বেশির ভাগ উন্নত দেশের সাংবাদিকরা ইন্টারনেটকে তাদের যোগাযোগ ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। তবে ১৯৯৯ সালেই অনলাইন সাংবাদিকদের সমিতি 'অনলাইন নিউজ অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,৭০০। আমরা ১৯৬৯ সাল থেকে বিকাশমান ইন্টারনেট ব্যবস্থাকেই ডিজিটাল সাংবাদিকতার মহাসড়ক হিসেবে গণ্য করি বলে এই মাধ্যমটিকে ব্যবহার করে যখনই কোনো গণমাধ্যমের সূচনা হয়েছে, তখনই আমরা ডিজিটাল সাংবাদিকতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস যথেষ্ট পুরোনো। তবে এ কথাটি সত্য, এই অঞ্চলে সংবাদপত্রের বিকাশের প্রথম স্তরটি হচ্ছে '৪৭ উত্তরকালের। ব্রিটিশ ভারতে এই অঞ্চলে সংবাদপত্র নামক কিছু ছিলই না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর প্রসার ঘটে। দ্বিতীয় স্তর বা স্বর্ণযুগের সময়টি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তরকালের। আমরা যদি কেবলমাত্র অনলাইন মিডিয়ার কথা বলতে চাই তবে স্মরণ করতে হবে, এ দেশের পত্রিকাগুলো '৮৭ সালের ১৬ মে আনন্দপত্র কম্পিউটারে কম্পোজ করে প্রকাশের পরে ডিজিটাল যুগে পা রাখে। ১৯৯৩ সালের মাঝেই দেশের প্রায় সব পত্রপত্রিকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ডাটাএন্ট্রির যুগে প্রবেশ করে। এরপর পেজ মেকআপ ও ব্যবস্থাপনাও ডিজিটাল হয়।

একসময় বাসস, এনা, ইউএনবি ইত্যাদি নিউজ সার্ভিসের সেবাকে টেলিপ্রিন্টারে প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে বাইরের সূত্রের খবর পাওয়া শুরু হয়। সেই সময়ে রয়টার্স, এএফপিও একই ধরনের সেবা দেয়। তখনই পত্রিকাগুলোকে সমস্যায় পড়তে হয় মফস্বলের বা দেশের বাইরের খবর ও ছবি পেতে। তখন তারা শুরুতেই ফ্যাক্স ব্যবহার করতে থাকে। হাতের লেখা খবর ফ্যাক্সে করে ঢাকায় পাঠানো হতো এবং কম্পোজ করে সেটি প্রকাশ করা হতো। ফ্যাক্সে পাঠানো ছবির গুণগত মান খারাপ থাকত বলে তাতে লেখা থাকত ফ্যাক্সেপ্রাপ্ত। ১৯৯০ সালে আনন্দপত্র ফ্যাক্সে দৈনিক করতোয়াকে খবর ও ছবি পাঠাতে শুরু করে। খবরগুলো কম্পিউটারে কম্পোজ করে পাঠানো হতো। কিছুদিনের মধ্যেই অ্যাপল কম্পিউটারে মডেমের যুগ প্রচলিত হয়। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে মডেম যুক্ত করে তার মাধ্যমে করতোয়াকে ছবি ও খবর প্রদান করা শুরু হয়। জন্ম হয় আনন্দপত্র বাংলা সংবাদ নামক ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমের। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আনন্দপত্র এর চূড়ান্ত ব্যবহার করে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার প্রচারণা টিমের সঙ্গে আনন্দপত্র একটি ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার, একটি স্ক্যানার ও একটি মডেম যুক্ত করে। সিদ্দিকুর রহমান নামক একজন চালক এর পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। শেখ হাসিনার জনসভার খবর ও ছবি সেখানেই সংগ্রহ করে টেলিফোন ডায়াল করে সেটি ঢাকায় পাঠানো হতো এবং সেখান থেকে ঢাকাসহ সারাদেশে সেই খবরগুলো বিতরণ করা হতো। এই কাজটি করা হতো ১৬/১, সেগুন বাগিচা থেকে। বকুল মোস্তাফা সেটি সমন্বয় করতেন। ধীরে-ধীরে সেটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ডিজিটাল সংবাদ সংস্থায় পরিণত হয়। এখনো এই সংবাদ সংস্থাটি তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তবে এর কোনো অনলাইন সংস্করণ নেই।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটে। আমরা ১৯৯৬ সালের ৬ জুন অনলাইন ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করি। ১৯৯৮ সালের ৪ নভেম্বর দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশিত হয়। ততদিনে বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোর ওয়েবসাইট থাকার রীতি প্রচলিত হয়েছে। প্রথম আলোও সেই রীতিতে প্রথমদিন থেকেই ওয়েবসাইট প্রকাশ করে। শুরুতে পত্রিকাটির অনলাইন সংস্করণ মানে ছিল এর বিষয়বস্তুর পিডিএফ সংস্করণ। পরে সেটি ই-পেপার হিসেবে প্রকাশিত হয়। একই সঙ্গে এখন অনলাইন সংস্করণও প্রকাশিত হয়। রাত ১২টায় পত্রিকাটি আপলোড হয়। এরপর এতে দিনের খবরগুলো যুক্ত হতে থাকে।

বাংলাদেশের প্রথম দিককার অনলাইন নিউজপোর্টাল বিডিনিউজ২৪ ডটকম। আমি এর আত্মপ্রকাশের কাহিনীটা এর সম্পাদকের মুখ থেকেই শুনেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ২০০৬ সালের ঈদের সময় এক নাগাড়ে পত্রিকা বন্ধ থাকার বিষয়টি তাকে পীড়া দেয় এবং তিনি ভাবতে থাকেন, এই লম্বা সময়ে মানুষের কাছে তথ্য না দিতে পারাটা একটি অক্ষমতা। সেই সূত্র ধরেই ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর বিডিনিউজ২৪ ডটকম জন্ম নেয়।

বাংলাদেশে এখন আর ডিজিটাল নিউজ মিডিয়ার আকাল নেই। আমিতো মনে করি, প্রতিদিনই এসব মাধ্যমের জন্ম হচ্ছে। চরিত্রগতভাবে এসব মিডিয়ার মান কী সেসব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। জনপ্রিয়তার দিক থেকেও সেটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তবে সংখ্যার দিক থেকে এটি এক ধরনের হুজুগে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ডিজিটাল সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হিসেবে এর প্রকাশ মাধ্যম ও ইন্টারঅ্যাকটিভিটির ব্যবহার বস্তুত নেই। বেশির ভাগ গণমাধ্যম কেবলমাত্র ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। এতে অডিও-ভিডিও'র ব্যবহারও নেই। কখনো-কখনো একে কাগজের পত্রিকার ইন্টারনেট সংস্করণই মনে হয়। আগামীদিনে এর আমূল পরিবর্তন হবে। বস্তুত কাগজের পত্রিকাই হোক বা টিভি-রেডিও হোক সবই ইন্টারনেটেই প্রকাশিত হবে। আমি মনে করি, 'সামাজিক মিডিয়া ও ডিজিটাল নিউজ মিডিয়ার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে নতুন মিডিয়ার জন্ম হবে। সেটি হবে ডিজিটাল মিডিয়া।' আবার ডিজিটাল সাংবাদিকতার আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: The phenomenon of 'Online Journalism' can be defined as the use of digital technologies to research, produce and delivering news and information to an increasingly computer literate audience (Barnhurst; cited in Deuze, 1999: 378).

অন্যদিকে ৪ মে ২০১৭ তারিখের প্রথম আলো'য় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ডিজিটাল মিডিয়ার বাস্তবতার কথা।

ছাপা পত্রিকাসহ প্রথাগত গণমাধ্যমের ওপর ডিজিটাল মাধ্যমের প্রভাব বাড়ছে। ডিজিটাল মাধ্যম এখন বাস্তবতা। একে হুমকি না মনে করে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমের সুবিধা নিয়ে কীভাবে প্রথাগত মাধ্যমকে আরও গতিশীল করা যায়, সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

'ডিজিটাল মিডিয়া: হুমকি ও সম্ভাবনা' শীর্ষক সম্মেলনে এমন পরামর্শ উঠে এলো। আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে এ সম্মেলনের আয়োজন করে কমনওয়েলথ জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের (সিজেএ) বাংলাদেশ ও ভারত চ্যাপটার।

অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে একটু ভিন্নতা পোষণ করে 'ডিজিটাল মাধ্যম: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক মূল উপস্থাপনা তুলে ধরেন তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তাফা জব্বার। যোগাযোগ মাধ্যমের প্রাচীন, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিত্র উঠে আসে এ উপস্থাপনায়। মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা একটি দেশকে ডিজিটাল দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে এখন ১৩ কোটি মানুষ মুঠোফোন ব্যবহার করে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬ কোটি ৬০ লাখ। তিনি বলেন, ডিজিটাল মিডিয়া এখন বাস্তবতা। একে হুমকি মনে করাটা অমূলক। বরং এই মিডিয়াকে প্রথাগত মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর অপব্যবহার হচ্ছে না তা বলা যাবে না। তবে অপব্যবহারের এসব আশঙ্কা রোধ করার নানা হাতিয়ার কিন্তু প্রযুক্তিই সরবরাহ করেছে। এর একটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংকিং।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, 'সনাতন গণমাধ্যম তাদের অবস্থান হারাচ্ছে। বড় বড় সংবাদপত্র ডিজিটাল মাধ্যমের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে এদিকে ঝুঁকে পড়েছে। এটি শুভ লক্ষণ। এ বাস্তবতা যত দ্রুত আমাদের দেশের গণমাধ্যম বুঝতে পারবে ততই মঙ্গল।' তিনি বলেন, 'ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য বিকৃতির অনেক সুযোগ আছে। একে আমরা তারুণ্যের সমার্থক বলে মনে করতে পারি। তরুণদের অভিজ্ঞতা কম থাকে, তারা ভুল করে ফেলে। এসব কাটিয়ে উঠে একটি দায়িত্বশীল ডিজিটাল মাধ্যম গড়ে তোলা দরকার।'

সিজেএ'র গ্লোবাল প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র বেদ বলেন, 'ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশ এবং প্রভাব আমাদের প্রতিদিনের কর্মে। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ডিজিটাল মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্য নিয়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় অনেক সময়। তবে এর ইতিবাচক ব্যবহার দরকার।'

ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের জ্যেষ্ঠ সম্পাদক জয়ন্ত রায় চৌধুরী বলেন, এবারের উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিজেপি'র জয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার অতীতের আর কোনো নির্বাচনে হয়নি। বিজেপি একেবারে বুথভিত্তিক যেভাবে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার করেছে, সেটা ছিল তাদের জয়ের চালিকাশক্তি। এখন তাদের কাছে থেকে শিক্ষা নিয়ে বিরোধী কংগ্রেস ডিজিটাল সেল স্থাপন করেছে। এমনকি যে সিপিএম এসব বিষয়ে পিছিয়ে ছিল তারাও এখন এই প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার হায়দরাবাদের সাবেক আবাসিক সম্পাদক কিংশুক নাথ বলেন, ডিজিটাল মাধ্যমের চেয়ে সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের আস্থা এখনো বেশি। তবে প্রথাগত গণমাধ্যম এখন অস্তমিত সূর্যের মতো।

প্রথম আলো'র সহযোগী সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম বলেন, কীভাবে ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে ছাপা সংবাদপত্রের একটি মেলবন্ধন ঘটানো যায়, সেটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ছাপা পত্রিকাকে এখন সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাদের উপস্থাপনার রীতি পাল্টাতে হবে।

সিজেএ'র বাংলাদেশ চ্যাপটারের সম্পাদক সালেহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন সিজেএ'র এমিরেটাস প্রেসিডেন্ট হাসান শাহরিয়ার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান, চ্যানেল আই অনলাইনের সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিজেএ বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত।

বাস্তবতা যেমন আছে সংকটও তেমনি কম নয়। ইত্তেফাক পত্রিকায় ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সাঈদ অভি 'ডিজিটাল মিডিয়া ও আত্মপরিচয়ের সংকট' প্রতিবেদনে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'মূলত আশির দশকে যোগাযোগের দুনিয়ায় প্রযুক্তিবিপ্লব ঘটে যাওয়ায় নেহাত ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে একান্ন কোটি বর্গকিলোমিটারের পৃথিবী। বর্তমান বিশ্ব শাসন করছে কে–এমন প্রশ্ন করলে যে কারো ধারণায় প্রথমেই চলে আসবে আমেরিকা কিংবা রাশিয়ানদের কথা। বাস্তবিক অর্থে উত্তর-ঔপনিবেশিককালে অন্য রাষ্ট্র ও ভিন্ন জনগোষ্ঠীকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ উপায় তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও গোটা তথ্যব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা। যেহেতু তথ্যের আদান-প্রদান, বিতরণ, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন প্রভৃতি ঘটে যোগাযোগপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের সাহায্যে; সেহেতু এই তথ্যপ্রবাহের নিয়ন্ত্রকরাই পুরো পৃথিবীর বিরাট জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রক।

পুরাতন গণমাধ্যমের প্রভাবকে সীমিতকরণের মধ্যদিয়ে যে নতুন ধারার গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, তার নাম নিউমিডিয়া বা নতুন গণমাধ্যম–যা প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের কারণে ডিজিটাল গণমাধ্যম হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এ বৈজ্ঞানিক সুফলগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়েব, ওয়েব টু, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অনলাইন গেমিং, সর্বোপরি ইন্টারনেট বা অনলাইনভিত্তিক গোটা যোগাযোগ পরিসরই নতুন ধারার গণমাধ্যমের অন্তর্গত। দ্রুত, দ্বিমুখী, নিশ্চিত, গোপন ও আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ, যোগাযোগের সংরক্ষণশীলতা এবং সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রতিদিন জনপ্রিয়তার সিঁড়িতে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী ডিজিটাল মিডিয়ার চাহিদা। যে কারণে একই মুদ্রার দুই পিঠের মতো সুফলের সঙ্গে বেশকিছু নেতিবাচক দিকও জড়িয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের জীবনে।

গণমাধ্যমের বহুল উল্লিখিত তাত্ত্বিক মার্শাল ম্যাকলুহান বলেছিলেন, 'আমাদের প্রযুক্তিই আমাদেরকে কাল্পনিকভাবে বাঁচতে বাধ্য করছে। মিডিয়াটাইজেশনের প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমকে শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করে ধারণা করা হয় এটি ব্যক্তি, সমাজ এবং রাজনীতিকে পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যক্তিজীবনে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যক্তি যদি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুলা পৃথিবীতে নিজের প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে ফেলে তাহলে তা কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক পর্যায়েও ক্ষতির কারণ। কেননা, ব্যক্তিই সমাজকাঠামোর ক্ষুদ্রতম উপাদান এবং ব্যাপক ব্যক্তি পর্যায়ের বিপর্যয় গোটা সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই রকম এক ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সমূহ আশঙ্কা জেগে ওঠছে বাংলাদেশের উঠতি প্রজন্মের মধ্যে– যারা সামাজিক যোগাযোগ ও অনলাইনকে শুধু যোগাযোগ ঘাটতি পূরণ করার চাইতেও আরো বেশি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর করা ইউসি ওয়েবের গবেষণায় উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র। অধিকাংশ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরাই নানা ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সঙ্গে যুক্ত এবং এদের শতকরা ২৩ ভাগেরও বেশি ব্যবহারকারী প্রতিদিন পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় কাটায় এসব সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে। বাস্তবের স্বাদ দিয়ে তৈরি সিউডোরিয়েলিটির জগৎ অনলাইন গেমিং। হু হু করে বাংলাদেশে বাড়ছে অনলাইন গেমারদের সংখ্যা, যাদের বেশির ভাগই খেলছে দু'ধরনের গেম: রোল প্লেয়িং গেম এবং ম্যাসিভ মাল্টিপ্লেয়ার অনলাইন গেম (এমএমওজি)। গেমারদের শতকরা ৪১ ভাগই ১৮-২০ বছর বয়সি। অনলাইনের গেমের নকল-পৃথিবীতে গেমাররা নানা ধরনের পরিচয় গ্রহণ করছে, সেই দুনিয়ায় তাদের জায়গা-জমি, থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থাই আছে যদিও এর কোনোটিই বাহ্যিক নয়।

ইন্টারনেটপূর্ব যুগে মানুষকে অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য, নিজের যোগ্যতানুসারে যথার্থ মূল্যায়ন পাওয়ার জন্য তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হতো। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো ব্যক্তির নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ করে দেয়– ব্যক্তি কী পছন্দ করে, কী চায় ইত্যাদি। ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, ব্লগ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগের সাইট ব্যবহারকারীরা নিজস্ব প্রোফাইলে নিজেদের গুণাবলি, বিশেষত্ব তুলে ধরে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলো শুধুই আত্মবিজ্ঞাপন ও আত্মপ্রচারণা। 'আমি যা নই তা' বানানোর অসীম ক্ষমতা রয়েছে সাইবার অ্যাপসের, যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর। এ কারণেই ব্যবহারকারীরা এর দিকে আকৃষ্ট হয় বেশি–স্থূলকায়রা চায় তাদের লোকে দেখুক শীর্ণকায় হিসেবে। তাই তারা শরীরকে আড়াল করে বিভিন্নভাবে, যারা দেখতে কালো তারা প্রসাধনী বা এডিটেড ছবি দিয়ে নিজেকে সুন্দর হিসেবে উপস্থাপন করে, বাস্তবের খুনি সাজে ধার্মিক, অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফরমে গেমাররা গড়ে তোলে নিজের মনের মতো বাড়ি-গাড়ি, এমনকি নারী, বিলাসবহুল স্বপ্নের পৃথিবী, যা পার্থিব জগতে খুব সহজে পাওয়া সম্ভব নয়।

আগেকার মানুষ কাছের মানুষদের সময় দিত, মুখোমুখি বসে রাতভর-দিনভর গল্প করত। এখন মানুষ সময় ব্যয় করে তাদের হাতের আধুনিক যোগাযোগের ডিভাইসে, নিজস্ব অনলাইন প্রোফাইলে, সময় দেয় সেখানে অপেক্ষায় থাকা অন্য কোনো প্রোফাইলকে। এভাবে যোগাযোগের বিস্তৃত অদেখা পৃথিবী তৈরি হলেও সীমিত হয়ে আসছে সত্যিকার দুনিয়ার কথোপকথন, ফিকে হয়ে পড়ছে সম্পর্কের রঙ, বন্ধন। আমরা কেউ কাউকে সামনা-সামনি নিজেদের চোখে দেখে চিনছি না, চিনছি মিডিয়া আমাদের যেভাবে চেনাচ্ছে। বাস্তবের মানুষদের কাছে আমরা একরকম, অনলাইনের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে আমরা অন্য মানুষ।

লেখক: এডিটর ইন চিফ, রেড টাইমস বিডি.কম

বেতার-টিভি'তে সংবাদ উপস্থাপনা ও বিভিন্ন দিক

কুদরত-ই-মওলা

একসময় রেডিও অনেক শক্তিশালী মাধ্যম ছিল এবং এখনো আছে, টের পাওয়া যায় টিভি'তে কোনো নির্দিষ্ট খবর সময়মতো না মিললে

বাংলাদেশে সংবাদ সম্প্রচারের কথা বলতে গেলে রেডিও'র কথা না বললেই নয়। অন্যদিকে, রেডিও'র সম্প্রচার নিয়ে আলাপচারিতায় এদেশের রেডিও'র সাথে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং সেন্টার-বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা'র পর্যালোচনা কথা এসে যায়। আসে ভারতীয় আকাশবাণী বেতার কেন্দ্র ও একালের এনডিটিভি'র কথাও। এজন্যই আসে যে, এরা সম্প্রচারে এগিয়ে আছে। বিশেষ করে সংবাদ ও সমকালীন বিষয়ের সংবাদ পরিবেশনে। প্রযুক্তিতে তো বটেই। সংবাদ সম্প্রচারের অতীতের সঙ্গে স্বাধীনতার আগের কথাও এসে যায়। সংবাদ সম্প্রচারের ধরন, প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি বোঝার জন্য এগুলো প্রাসঙ্গিক বৈকি।

রেডিও'র খবর সম্প্রচার

শুরু করা যাক স্বাধীনতার আগের কথা দিয়ে। সেসময় রেডিও বলতে এদেশের সাধারণ মানুষের নাগালে, সারাদেশে সংবাদ সম্প্রচারে নিয়োজিত সরকার পরিচালিত রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র, যা পাকিস্তানেরও জন্মেরও আগে ১৯৩৯ সালে স্থাপিত হয়। তারই কয়েকটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র বিভাগীয় শহরে, পরে বিভিন্ন জেলায় প্রসারিত হয়।

সব মিলিয়ে এসময় সারাদেশের মানুষের সংবাদের চাহিদা মেটানোর মতো ব্যাপ্তি বা নেটওয়ার্ক বেতারের ছিল। বলা যায়, যেকোনো বিশ্বমানের বেতার কেন্দ্রের মতো, বাংলা ছাড়াও, বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে, বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল এবং তা আজও আছে। স্বাধীনতার পর এই কেন্দ্রের নাম হয়েছে বাংলাদেশ বেতার। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও, যতদূর সম্ভব প্রযুক্তিগতভাবে সংস্থাটিকে যুগোপযোগী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে সরকার। ঢাকার শাহবাগ ও আগারগাঁও-এ দু'টি সম্প্রচার কেন্দ্র না দেখলে তা বোঝা যাবে না। পরবর্তীতে, বেসরকারি রেডিও কেন্দ্র হয়েছে বেশ কটি, হয়েছে কমিউনিটি বেতার কেন্দ্র, এফএম বেতার এবং বাংলাদেশ থেকে ঢাকা ও আশেপাশের শ্রোতাদের জন্য বিবিসি'র সম্প্রচার কেন্দ্র।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই রেডিও পাকিস্তান এর সংবাদের উৎসগুলো ছিল প্রতিবেশী ভারতের আকাশবাণী কলকাতা ও আগরতলা বেতার কেন্দ্র, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, জার্মানের ডয়েচে ভেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডিও মস্কো, চীনের রেডিও পিকিং (পরবর্তীতে রেডিও বেইজিং) ও রেডিও জাপান।

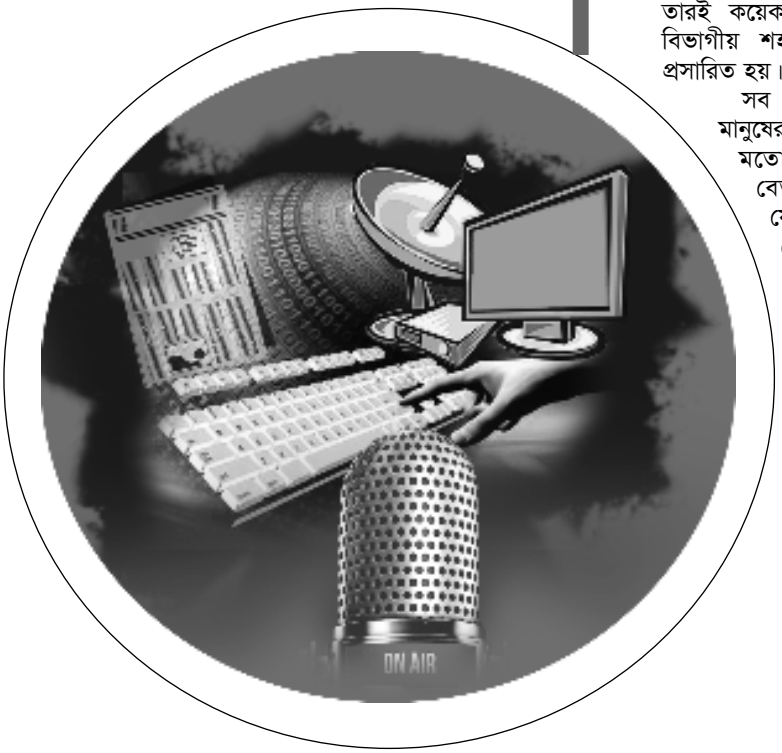

একসময় রেডিও অনেক শক্তিশালী মাধ্যম ছিল এবং এখনো আছে, টের পাওয়া যায় টিভি'তে কোনো নির্দিষ্ট খবর সময়মতো না মিললে। বাংলাদেশের ইতিহাসের কয়েকটি মাইলফলক স্থাপনকারী ঘটনার সময় বেতার কেন্দ্র (পরে কিছুদিন বিটিভিও) রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীনের একটি মানদণ্ড ছিল-১৯৭১, ১৯৭৫, ১৯৮১ ও ১৯৯০ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বেতার ঘোষণা তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

২০০০ সালের গোড়ার দিকে বেসরকারি টেলিভিশন আসার আগে পর্যন্ত, রেডিও সংবাদ সম্প্রচারের কদর ছিল বেশ, বিবিসি-ভিওএ তো ছিল তুঙ্গে। সেসময় সংবাদ সম্প্রচার প্রধানত সংবাদ পাঠক/পাঠিকা কেন্দ্রিক হওয়ায় সংবাদ উপস্থাপনার কাজটি তাদের মধ্যে যাঁরা ভালোভাবে করতেন, শ্রোতারা তাঁদের মনে রাখত। তাইতো যাঁদের পড়ার ঢং এখনো মনে পড়ে: বিবিসি বাংলার নুরউল ইসলাম ও ভয়েস অব আমেরিকার ইকবাল বাহার চৌধুরী, কাফি খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। পড়ার মানের কারণে তাঁরা পরিচিত ছিলেন অনেকের কাছে। তাঁরা একসময় এদেশে খবর পড়তেন, রেডিও পাকিস্তান ঢাকা'র প্রথমদিকের হাতেগোনা দু'-একজনের মধ্যে একজন এবং বিবিসি বাংলাতেও অনুকরণীয় ছিলেন। ইকবাল বাহার চৌধুরী, কাফি খানের সংবাদ পড়াতেও কৃতিত্ব ছিল। যা ছিল আকাশবাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইভানা ও নীলিমা সান্যালের পড়াতে। একালের অনেকের মতো তাঁরা সবাই সংবাদের পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে (রিপোর্টিং/এডিটিং থেকে পঠন পর্যন্ত) জড়িত ছিলেন না । তবুও নিজের নাম উচ্চারণ থেকে শেষ অবধি, ইকবাল বাহার চৌধুরী বুলেটিনের প্রতিটি সংবাদ এমনভাবে পড়তেন, যেন যেই একবার গলা শুনে চিনতে পারত সেই থেমে যেত, বাকি খবর শোনার জন্য। তাঁরা তাঁদের উপস্থাপনার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যে, তিনি যা শোনাচ্ছেন তা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের কাজটির আজ বড়ই অভাব, একথাটি বললে বোধহয় ভুল হবে না বর্তমানের প্রেক্ষাপটে।

অন্যদিকে, বিটিভি'র দর্শক যেমন ভাগ হয়ে যায়, সেই সাথে ভাটা পড়ে বিটিভি'র একক আধিপত্যে। পরিবর্তন ও উন্নয়নের প্রতিফলন দেখা দেয় সংবাদ উপস্থাপনায়, যা আজ অব্যাহত আছে। তবে পুরাতন কয়েকজন সংবাদ পাঠক/পাঠিকাকে দেখা যাচ্ছে টিভি'র পর্দায়।

কিন্তু তা' বলে বেসরকারি টিভি'র সংবাদ সম্প্রচার তথা সংবাদ উপস্থাপনা তুঙ্গেথ এমন মনে করা উচিত হবেন। বরং, চটজলদি যদি কাউকে বলতে বলা হয়, কয়েকজন ভালো টিভি সংবাদ উপস্থাপক/ উপস্থাপিকার নাম বলতে, তবে তার পক্ষে উত্তর দেয়া কঠিন হতে পারে।

এ প্রশ্নের উত্তরও আছে। কেউ হয়তো বলবেন, এখনকার সেলিব্রেটি হচ্ছে রিপোর্টার, টকশো এর সঞ্চালক ইত্যাদি।

দর্শক শ্রোতাগণ সংবাদ উপস্থাপনা তেমন খেয়াল করার প্রয়োজন মনে করেন না। বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ডজন কয়েক। যার ফলে, দর্শক ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একই দর্শক প্রতিদিন কোনো একটা চ্যানেল দেখছেন না।

অনেক সংবাদ উপস্থাপকের মধ্যে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমন নজর কাড়া সংবাদ উপস্থাপনা হচ্ছে না।

উত্তরের পেছনের উত্তরও আছে।

প্রেজেন্টার নিজেই যত্নবান নন। কাজের ধরন, বিশেষ করে নিউজ চ্যানেলে কাজের ধারা পাল্টে যাওয়ায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় সংবাদ পড়তে হয়। তাই, উপস্থাপনা না হয়ে তা হয়ে যাচ্ছে শুধুই পড়ার জন্য পড়া। বিটিভি'র সোনালি যুগের মতো বেসরকারি টিভি চালু হওয়ার পরে বেশ কিছুকাল কঠোর মনিটরিং থাকলেও, আজ আর তা সেভাবে নেই।

বিষয়টা এমনও হতে পারে যে, সম্পাদনায় নিয়োজিত লোকজন স্ক্রিপ্ট দেখায় যথেষ্ট যত্নবান না হওয়ায়, প্রেজেন্টার ভালো করে সংবাদ উপস্থাপনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

66

দর্শক শ্রোতাগণ সংবাদ উপস্থাপনা তেমন খেয়াল করার প্রয়োজন মনে করেন না। বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ডজন কয়েক। যার ফলে, দর্শক ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একই দর্শক প্রতিদিন কোনো একটা চ্যানেল দেখছেন না।

অনেক সংবাদ উপস্থাপকের মধ্যে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এমন নজর কাড়া সংবাদ উপস্থাপনা হচ্ছে না

99

কারণ আরো আছে, থাকতেও পারে। তবে এক কথায় বলা যায়, জবাবদিহিতার জায়গাটি, সব স্টেশনে না হলেও, অনেক জায়গায় আজ অনুপস্থিত।

দেশের সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনগুলোকে শুধুমাত্র সংবাদ উপস্থাপনা দিয়ে যাচাই করলে অন্যায় হবে। দেখতে হবে প্রতিবেদনগুলো কেমন হচ্ছে– প্রতিবেদনের বর্ণনা ও ছবি দুটোই বিবেচ্য। সঙ্গে কানেকটিভিটি টেলিফোনে, স্কাইপ, ভাইবার, ফেসবুকের মাধ্যমে সংযোগের কাজটিতে বৈচিত্র্য আছে কি-না তাও বিচার্য। তবে, দেশের নিউজ ও প্রোগ্রাম চ্যানেলগুলো সাধ্যমতো প্রতিবেদন সম্প্রচার, লাইভের মাধ্যমে ঘটনার গভীরে যাওয়ার পাশাপাশি, টকশো ও চলতি ঘটনাভিত্তিক অনুষ্ঠান করে সমকালীন বিষয় বা ঘটনাকে দর্শকের কাছে তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। সংবাদ উপস্থাপনার সঙ্গে সার্বিকভাবে সংবাদ সম্প্রচার নিয়ে আরো কাজ করার এবং উন্নতি করার অবকাশতো আছেই। একসময় হয়তো, প্রতিবেশী দেশের এগিয়ে থাকা রেডিও-টিভি চ্যানেলগুলোসহ বহির্বিশ্বের নামজাদা রেডিও-টিভি চ্যানেলগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে বাংলাদেশের সংবাদ উপস্থাপনা ও সম্প্রচার। এমনটিই আমরা আশা করতে চাই। কারণ, বিশ্ব পটভূমিতে বেতার ও টিভি সম্প্রচারে বাংলাদেশেরও সাফল্যের জায়গা আছে, যা বর্তমান পরিসরে বিশদ আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

লেখক: সিএনই, ডিবিসি

টিভি'র সংবাদ সম্প্রচার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে থেকে আরম্ভ করে, নব্বইয়ের শেষের দিকে বিবিসি ও সিএনএন টিভি'র পরীক্ষামূলক প্রচার শুরু পর্যন্ত, এদেশে টেলিভিশন বলতে ছিল বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে, ১৯৬৪ সালে তার যাত্রা। সম্প্রচার হতো বর্তমান রাজউক ভবন (আগের নাম ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-ডিআইটি) থেকে।

স্থানীয় রেডিও'র মতো, বিটিভি'র সংবাদ সম্প্রচার প্রতিবেদন নির্ভর (সরকারি কর্মকাণ্ড ছাড়া) না হওয়ায় সংবাদ উপস্থাপক ও উপস্থাপিকাই ছিল মুখ্য।

বাংলা খবর পড়তেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইকবাল বাহার চৌধুরী, সিরাজুল মজিদ মামুন, সরকার কবীর উদ্দিন, রোকেয়া হায়দারসহ আরো অনেকে। ইংরেজি সংবাদ যারা পড়তেন অনেকের মধ্যে শামীম আহমেদ, ইসমাত জেরিন খান, আয়শা জায়গীরদার, তাহমিনা শাহাবুদ্দীন ও মুনমুন আহমেদ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রায় সবাই ঢাকা বেতারের সংবাদ পড়তেন। তারা আলোচনার পাত্র ছিলেন, তাঁদের নিয়ে তর্কবিতর্ক হতো।

অবশ্য, বেসরকারি টেলিভিশনগুলো একে একে আসতে থাকলে প্রেক্ষাপট ধীরে-ধীরে পাল্টাতে থাকে। এক পর্যায়ে বিটিভি'র সংবাদ সম্প্রচারেও প্রতিবেদন নির্ভরতা বাড়তে থাকে।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রঃ কতিপয় কেস স্টাডি

আমির হোসেন

অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের কাছে কম সময়ে, কম খরচে দ্রুত তথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং 'অনলাইন' সুবিধা প্রদান করে সারাবিশ্বের অফুরান জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্য। শেখ হাসিনার সরকার মনে করে, তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই ২০০৯ সালে দেশের সবচেয়ে আলোচিত শব্দ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'।

বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' এর অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে চালু হয়েছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে ১১ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল ইউআইএসসি এবং ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরি ইউআইএসসি'তে নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং ইউএনডিপি'র প্রশাসক হেলেন ক্লার্কের সাথে সরাসরি কথা বলে সারাদেশে ৪,৫০১টি ইউনিয়নে এই ডিজিটাল সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণের ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। গ্রামীণ জনজীবনে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা অপরিসীম। আর তাই জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধানে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার মৌলিক

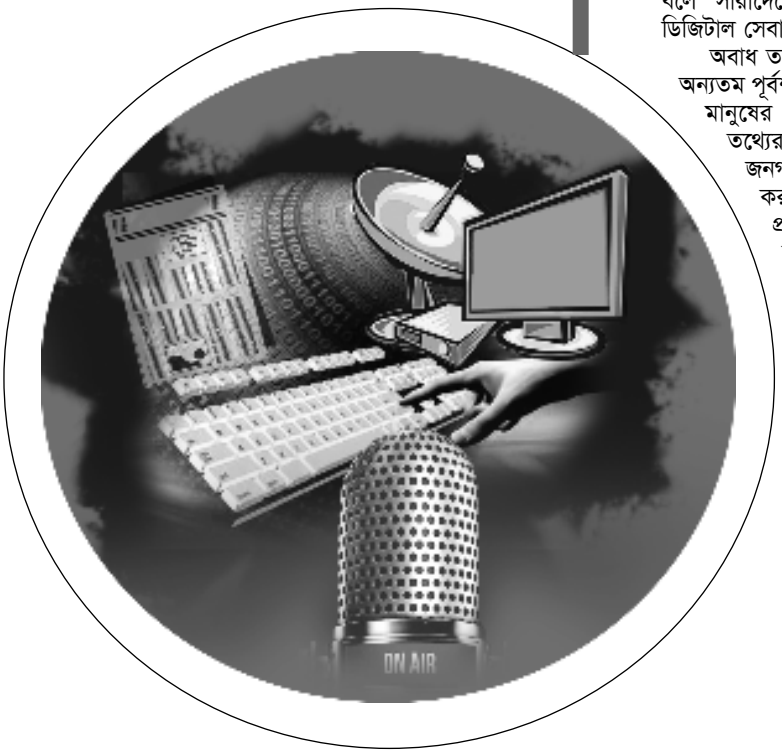

অধিকাররূপে স্বীকৃত। বিশেষ করে অনগ্রসর জনগণের মাঝে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা পৌঁছে দিয়ে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস-টু-ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচির সহযোগিতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪,৫৭৯ টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র' (ইউআইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র হচ্ছে 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে এমন একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সহজে-সুলভে ও দ্রুত তথ্য ও সেবা পৌঁছানো সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং 'অনলাইন' ও 'অফলাইন' সেবাপ্রদান করে সারাবিশ্বের অফুরান জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন একটি অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি করা যেখানে মানুষ সেবার পেছনে পেছনে ঘুরবে না বরং সেবাই পৌঁছে যাবে জনগণের দোরগোড়ায়। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমেই ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্য নিহিত। দেশের অভ্যন্তরে তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরণ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধান পূর্বশর্ত । আর ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হলে সত্যি সত্যিই শুরু হবে জনগণের জীবন বদলে যাবার পালা। শুরু হবে সমৃদ্ধ, উন্নত ও অগ্রসর বাংলাদেশের পথে যাত্রা।

তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই তথ্যপ্রাপ্তির বিষয়টিকে নিশ্চিত করতেই সারাদেশের ৪,৫৭৯টি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র' বা ইউআইএসসি স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, হাতের নাগালে সরকারি তথ্যসেবা পৌঁছানো, অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করার মাধ্যমে নাগরিকদের ইউনিয়ন পরিষদমুখী করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের কাছে কম সময়ে কম খরচে দ্রুত তথ্যসেবা পৌঁছে দেয়া এবং 'অনলাইন' সুবিধা প্রদান করে সারাবিশ্বের অফুরান জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করাই এই তথ্য সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই ইউআইএসসি'র মাধ্যমে সমস্ত তথ্য ও সেবা দেয়া হয় সেগুলো হলো প্রায় ৫০ ধরনের সরকারি ফরম, সরকারি নোটিশ, গেজেট এবং বিশেষ ঘোষণা, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের তালিকা, ইমিগ্রেশন, পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সেবা, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, নাগরিকত্ব সনদ, পাবলিক পরীক্ষাসমূহের ফলাফল, শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির তথ্য, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক প্রশাসনিক বিভাগ ও উপবিভাগের সেবার তালিকা, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য।

এছাড়াও অন্যান্য বাণিজ্যিক সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা, মোবাইল ফোন ব্যবহার, কার্ড বিক্রয় ও রিচার্জ, কম্পিউটার কম্পোজ, স্ক্যানিং, লেমিনেটিং, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া, পাসপোর্ট ও ভিসার ফরম পূরণ, ভিডিও প্রদর্শনী (মীনা, সিসিমপুর কার্টুন, বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ইত্যাদি) ডিভি লটারির তথ্য ও ফরম পূরণ, উচ্চতা ও ওজন মাপা, রক্তচাপ মাপা, খবরের কাগজ পড়া, চাষের জমির মাটি পরীক্ষা, বাজারদর সংক্রান্ত কৃষিতথ্য এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য অনলাইন বাজারে প্রবেশ ইত্যাদি। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে-কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ভিডিওয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ।

এর ফলে গ্রামীণ জনপদে রাতারাতি পরিবর্তন না হলেও টেকসই উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন ও জনগণের ক্ষমতায়ন হবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে সাধারণ মানুষের কাছে ইউআইএসসি'র গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকারিতার কথা বিবেচনা করে এই তথ্যকেন্দ্রগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার, জনগণ এবং উদ্যোক্তার অংশীদারিত্বের (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ-পিপিপি) ভিত্তিতে একটি বিজনেস মডেল দাঁড় করানো হয়েছে। ইউআইএসসি'র 'সরকার-উদ্যোক্তা-জনগণ' মডেল অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ের দু'জন তরুণ উদ্যোক্তা যাদের একজন নারী এবং একজন পুরুষ এবং যারা কমপক্ষে এইচএসসি পাস, কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আছে এবং যাদের ইউআইএসসি'র জন্য ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করার সামর্থ্য আছে তাদেরকেই উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এই মডেলের শর্ত অনুযায়ী আংশিক উপকরণ পরিষদ থেকে সরবরাহ করা হয়। উদ্যোক্তাদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চুক্তি হয় (কমপক্ষে দুই বছরের জন্য)। চুক্তি অনুসারে ইউআইএসসি থেকে আসা সকল আয় উদ্যোক্তাগণ গ্রহণ করবেন। এই উদ্যোক্তাদের বাছাই করা হয় সমন্বিতভাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহায়তায়। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ইউআইএসসি'র জন্য তথ্যভাণ্ডারের সহায়তা করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের 'একসেস-টু-ইনফরমেশন কর্মসূচি' থেকে। প্রতিটি ইউআইএসসি'র জন্য দু'জন করে নয় হাজারের বেশি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি) 'ডিজিটাল বাংলাদেশ ' গড়ার একটি অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। ইউএনডিপি'র সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পরিচালিত হচ্ছে একসেস-টু-ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি। এ কর্মসূচির একটি হচ্ছে 'কুইক উইন' কার্যক্রম। এর আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউআইএসসি এর কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালের মার্চ মাসে। প্রথম পর্যায়ে দেশের ৩০টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে ইউআইএসসি স্থাপন করা হয়। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ইউআইএসসি ১,০০০টির বেশি ইউনিয়ন পরিষদে সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে দেশের সকল ইউনিয়নে ইউআইএসসি স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪,৫৭৯টি ইউনিয়নে ইউআইএসসি'র কার্যক্রম চলছে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প (এলজিএসপি) ইউনিয়ন পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে তথ্যসেবা দেয়ার জন্য এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচির আওতায় তখন দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা প্রদান করার জন্য দু'টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে কমিউনিটি ই-সেন্টার (সিইসি) পরিচালনা করা হয়। একটি সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার মাধাইনগর ইউনিয়নে এবং অপরটি দিনাজপুর জেলার সেতাবগঞ্জ উপজেলার মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদে। এটুআইয়ের এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগের ভাবনার মিল থাকায় বিষয়টি বৃহত্তর পরিসরে আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে একাধিক আলোচনার পর ৮ই জুলাই ২০০৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংকের ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম, জাইকা, এসডিসি, বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্কসহ বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সিদ্ধান্ত হয় দেশের চলমান তথ্যকেন্দ্রের অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্যতা যাচাই করে ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্যসেবা প্রদান করার জন্য একটি কার্যকর মডেল তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে এটুআই এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করে 'সরকার-উদ্যোক্তা-জনগণ' শীর্ষক পিপিপি মডেল চূড়ান্ত করে 'ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার' (ইউআইসি)-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা পরবর্তীতে ইউনিয়ন ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার (ইউআইএসসি) হিসেবে রূপান্তরিত করা হয়।

এটুআই প্রোগ্রামের 'কুইক উইন' কার্যক্রমের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে ৩০টি ইউনিয়নে ইউআইএসসি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উদ্যোক্তাদের প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে একই বছরের মার্চ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ ইউনিয়ন পাটগাতী ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দিনবদলের অভিযাত্রায় কতটুকু এগিয়েছে বাংলাদেশ এটি খুব প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা। কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে এ প্রশ্নের উত্তর এখনো অনুসন্ধান করা হয়নি। এই গবেষণায় উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে।

এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১০টি ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের ওপর ১০টি কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয় যাতে করে এই কেন্দ্রগুলোর অবস্থা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যায়। পাঁচটি নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নোয়াখালী-সেনবাগ-কাদরা ইউনিয়ন পরিষদ
ইতালিতে পৌঁছে গেল বিয়ের অনুষ্ঠান

সাজু এবং মামুনের বিয়ের অনুষ্ঠান পৌঁছে গেল ইতালিতে। বাংলাদেশ থেকে ইতালিতে বিয়ের অনুষ্ঠান পৌঁছে দেওয়ার কাজটি খুব ভালোভাবে করলেন নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তা বিবি কুলসুম।

সাজু এবং মামুনের বিয়ে হবে বাংলাদেশে। নোয়াখালীর সেনবাগের জিরোয়া গ্রামের মেয়ে সাজু এবং শাহাপুর গ্রামের ছেলে মামুন। তাঁদের বিয়ের তারিখ ঠিক হলো ১১ই মে ২০১২। কিন্তু সাজু এবং মামুনের বেশির ভাগ আত্মীয়-স্বজন থাকেন ইতালিতে। কীভাবে তাঁরা বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন? সাজু এবং মামুনের বাড়ির মানুষ ভেবে পেল না বিকল্প কোনো ব্যবস্থা।

তাঁদের মাথায়ও আসেনি যে, বাংলাদেশের বিয়ের অনুষ্ঠান ইতালিতে বসে তাঁদের আত্মীয়-স্বজন দেখতে পাবে। কাদরা ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তা বিবি কুলসুম সাজু এবং মামুনের বাড়ির মানুষকে বললেন, বিষয়টি আমার ওপর ছেড়ে দিন। ডিজিটাল বাংলাদেশে বসে এত বেশি চিন্তা করার দরকার কী?

উদ্যোক্তা বিবি কুলসুম ১০ই মে গায়ে হলুদের এবং ১১ই মে বিয়ের অনুষ্ঠান সাজু এবং মামুনের ইতালিতে থাকা আত্মীয়দের দেখিয়ে দিলেন। কাজটি সম্ভব হলো আধুনিক প্রযুক্তির ল্যাপটপ, ওয়েব ক্যামেরা এবং আধুনিক একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে। প্রোকাস্টার সফটওয়্যার ব্যবহার করে ল্যাপটপের ওয়েব ক্যামেরার সাহায্যে বিয়ে এবং গায়ে হলুদের সব অনুষ্ঠান দেখিয়ে দিলেন ইতালিতে বাস করা আত্মীয়দের। এই কাহিনীতে ইতালিতে থাকা আত্মীয়রা সেখানে বসে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি। এদিকে খুশি হলেন সাজু এবং মামুনের বাড়ির মানুষ। বিষয়টিকে তাঁরা প্রথমে বিশ্বাস না করলেও পরে

অবাক হয়ে গেলেন। বিয়ে বাড়ির মানুষ খুশি হয়ে উদ্যোক্তাকে তিন হাজার টাকা দিলেন।

তিন হাজার টাকা পেয়ে উদ্যোক্তা যতখানি আর্থিকভাবে উপকৃত হলেন তার চেয়ে সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে বেশি পরিচিত হলেন। এভাবেই বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের দৃশ্য। যেখানে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না কিছুদিন আগে, সেখানে কম্পিউটার, ওয়েব ব্যবহার করে গ্রাম এখন ডিজিটাল গ্রামে পরিণত হয়েছে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। কাদরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অনেক বেকার ছেলেমেয়ের চাকুরি হয়েছে। যেখানে গ্রামের ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের কথা চিন্তা করতে পারত না, সেখানে তারা বর্তমানে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করছে।

কেস স্টাডিঃ উদ্যোক্তা

নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলার কাদরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে (ইউআইএসসি) নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন বিবি কুলসুম। তিনি ইউআইএসসি গঠনের প্রথম থেকে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বাংলা বিষয়ে এম এ। তিনি এক সন্তানের মা। তিনি প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদারের কাছ থেকে ইউআইএসসি'র কথা জানেন। কম্পিউটার বিষয়ে তাঁর আগে থেকে জ্ঞান ছিল। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাঁকে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার কথা বলেন । তিনি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে একটি বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকুরি করতেন। তারপর তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রাইমারি স্কুলে চাকুরি করে মাসে দুই হাজার টাকা আয় করতেন। বর্তমানে তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা মাসে আয় করেন। এতে করে তাঁর মাসিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি অর্থনৈতিকভাবে আগের থেকে অনেক বেশি সচ্ছল হয়েছেন। সামাজিকভাবেও তিনি অনেক বেশি মর্যাদা পেয়েছেন উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করতে এসে। রাজনৈতিক কোনো সমস্যা ছাড়াই তিনি কাজ করে যাচ্ছেন।

কাদরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের গঠন পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল অনুযায়ী হয়েছে। কারণ গঠনের সময় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে দুইটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, একটা ফটোপ্রিন্টার এবং ১৫ হাজার করে টাকা বিনিয়োগ করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে যেসব সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছিল তাহলো: ১. একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার; ২. দুইটি ল্যাপটপ কম্পিউটার; ৩. একটা প্রজেক্টর; ৪. একটা ডিজিটাল ক্যামেরা; ৫. দুইটি প্রিন্টার; ৬. একটা গ্রামীণফোনের মডেম; ৭. একটা ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি। এই তথ্য ও সেবাকেন্দ্র ভালোভাবেই চলছে। উদ্যোক্তারা নিজেদের আয় করা টাকা দিয়ে একটা আইপিএস কিনেছেন বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য। এখন সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের আর কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই। যে সমস্ত উপাদান আছে সেগুলোই যথেষ্ট।

কাদরা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে প্রতিদিন ২৫-৩০ জন সেবাগ্রহীতা আসেন। উদ্যোক্তা বলেন, সেবাগ্রহীতাদের চাহিদা অনুযায়ী সব সেবা ও তথ্য তাঁরা দিতে পারেন। যেসব সেবা দেওয়া হয় এই কেন্দ্রে তা হলো: ১. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ; ২. ফটোকপি করা; ৩. কম্পোজ করা; ৪. ছবি তোলা ও প্রিন্ট দেওয়া; ৫.জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট; ৬. কৃষিতথ্য; ৭. শিক্ষাতথ্য; ৮. চাকুরি তথ্য; ৯. ইন্টারনেট সেবা ইত্যাদি। কিন্তু এই কেন্দ্রে স্বাস্থ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখনো চালু হয়নি।

এই তথ্যকেন্দ্রে নারী সেবাগ্রহীতার হার বেশ ভালো। দেখা যায়, ২৫-৩০ জনের মধ্যে ১০-১৫ জন সেবাগ্রহীতা নারী। নারী সেবাগ্রহীতারা বেশি আসে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি তোলা, চাকুরির খবর এবং জন্ম সনদ নিতে।

এই কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি সেবা নিয়ে থাকেন ছাত্র-ছাত্রী এবং কৃষকরা। মোবাইল ব্যাংকিং, টেলিমেডিসিন এবং স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারছেন না উদ্যোক্তা। কারণ এই তিনটি সেবা এখনো চালু হয়নি এই কেন্দ্রে । এই তিনটি সেবা চালু হলে কেন্দ্রটি আরো ভালো চলবে সেকথাই বলছিলেন উদ্যোক্তা।

এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বিদ্যুৎ না থাকলে আইপিএস এবং সোলারপ্যানেল ব্যবহার করে সেবাদান করে থাকেন উদ্যোক্তা। যদিও সবসময় সম্ভব হয় না। সেবা তালিকার বাইরে উদ্যোক্তা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সবচেয়ে বেশি যে সেবা মানুষ নিয়ে থাকেন তাহলো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং জন্ম সনদ।

ইউআইএসসি ব্লগের কথা জানালেন এ উদ্যোক্তা। তিনি নিয়মিত ব্লগে লেখেন। কোনো সমস্যায় পড়লে অনেকের সাথে বিনিময় করা যায় এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়টি এই কেন্দ্রের উদ্যোক্তার বেশি ভালো লাগে।

২. কক্সবাজার-সদর-ঝিলংজা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিয়ে ঝিলংজার ফরিদা ইয়াসমিনের

কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের মেয়ে ফরিদা ইয়াসমিন। ছেলে তৌহিদুর ইসলামের বাড়িও একই ইউনিয়নে । দুই পরিবারের মতামতে তাদের দু'জনের বিয়ে পাকাপাকি হলো। ছেলে এবং মেয়েরও মত আছে। কিন্তু কীভাবে বিয়ে হবে? মেয়ে বাংলাদেশে এবং ছেলে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন। ছেলে যেহেতু যুক্তরাজ্যে থাকে তাই তিনি মেয়ের বাবাকে বললেন ইন্টারনেটে বিয়ের কথা। কিন্তু মেয়ের বাড়িতে কম্পিউটারই নেই। তাই ইন্টারনেটে বিয়ের কথাটা বিশ্বাস করেনি ফরিদার বাবা। তখন ফরিদার বাবা বিয়ে হবে না বলে জানিয়ে দেন। ফরিদা তখন তাঁর বাবাকে বলে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের (ইউআইএসসি) কথা। তারপরও ফরিদার বাবা বিশ্বাস করে না। ফরিদা একদিন ইউআইএসসি'র উদ্যোক্তা সালাউদ্দিন আকবর সাহেবকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যায় বাবাকে বোঝাবার জন্য। সালাউদ্দিন সাহেব ফরিদার বাবাকে অনেক বোঝানোর পর ইউআইএসসি'তে নিয়ে আসেন। তারপর ফরিদার বাবাকে স্কাইপি'র মাধ্যমে ছেলের ছবি দেখিয়ে কথা বলানো হয়। তারপর ফরিদার বাবা বিশ্বাস করে ইন্টারনেটে বিয়ের কথা। তারপর ফরিদার বিয়ে হয় যুক্তরাজ্যে থাকা তৌহিদুর ইসলামের সাথে। ইন্টারনেটে বিয়ে হওয়ার ৬ মাস পর তৌহিদুর বাংলাদেশে আসেন। তখন দুই বাড়িতে আয়োজন করে আবার তাঁদের বিয়ে হয়। ফরিদা এবং তৌহিদুর সুখী জীবনযাপন করছেন।

শুধু ফরিদা এবং তৌহিদুর নয়, তারপর ঝিলংজা ইউনিয়নের উদ্যোক্তা সালাউদ্দিন সাহেব আরো সাতজনের বিয়ে দিয়েছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে ঝিলংজা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র।

কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এখনো বিশ্বাস করেন না

কক্সবাজার (ডিআই-১) এর পুলিশ সুপারের কম্পিউটার নষ্ট হয়েছে। কোথায় মেরামত করতে দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মেরামত করতে নিয়ে যাওয়ার মতো সময়ও নেই তাঁর হাতে। তাঁকে অন্য একজন ব্যক্তি উদ্যোক্তা সালাউদ্দিন সাহেবের কথা বলেন। তখন তিনি উদ্যোক্তার সাথে ফোনে কথা বলে কম্পিউটারে কী সমস্যা হয়েছে তা জানান। উদ্যোক্তা ফোনে সমস্যার কথা শোনেন। তারপর তিনি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পুলিশ সুপারের কম্পিউটার মেরামত করে দেন। এই ঘটনা পুলিশ সুপার এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি এখনো মনে করেন, তাঁর কম্পিউটার স্বপ্নের মতো মেরামত হয়ে গেছে।

এমন আরো অনেক ছোটখাটো ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে কক্সবাজারের ঝিলংজা ইউনিয়নের তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে। মানুষ বিশ্বাস করছে না অথচ কাজ হয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

ঝিলংজা ইউনিয়ন পরিষদে 'জ্ঞানের হাট' নামক একটি সাইনবোর্ড দেখা যায়। জানতে চাইলে উদ্যোক্তা বলেন, 'জ্ঞানের হাট' একটি সংগঠন যেখানে কাজ করে নয় জন মানুষ। এখান থেকে কৃষিসেবা, মৎস্যসেবা এবং প্রাণিসম্পদ সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। কৃষকের মাঠে গিয়ে কৃষি সমস্যা বাস্তবে দেখে সমাধান দেওয়া হয়ে থাকে।

ঝিলংজার উদ্যোক্তার কেস স্টাডি

কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে পুরুষ উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন সালাউদ্দিন আকবর। তিনি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র (ইউআইএসসি) গঠিত হওয়ার সময় থেকে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে কম্পিউটার সেলস সেন্টারে কাজ করতেন। তারপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন আকবরকে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য বলেন। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র গঠিত হওয়ার প্রথম থেকে তিনি উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। তিনি যখন কম্পিউটার সেলস সেন্টারে কাজ করতেন তখন তিনি ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা মাসে আয় করতেন। উদ্যোক্তা হওয়ার পর তিনি মাসে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা মাসে আয় করেন। উদ্যোক্তা হওয়ার পর থেকে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ তাঁকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। আর্থিকভাবেও তিনি আগের থেকে বেশি সচ্ছল হয়েছেন।

ঝিলংজা ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রের গঠন কাঠামোতে দেখা যায়, উদ্যোক্তা কিছুই বিনিয়োগ করেননি। সব সরঞ্জাম সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে: ১. পাঁচটি ডেস্কটপ কম্পিউটার; ২. একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার; ৩. আইপিএস; ৪. প্রিন্টার; ৫. স্ক্যানার; ৬. একটি ডিজিটাল ক্যামেরা; ৭. লেমিনেটিং মেশিন; ৮. একটি প্রজেক্টর ইত্যাদি। এই কেন্দ্রে ফটোকপি মেশিন দেওয়া হয়নি। ফটোকপি মেশিন এবং আরো কম্পিউটার প্রয়োজন। ইন্টারনেট লাইন পেতে মাঝে-মাঝে সমস্যা করে। বিষয়টি দূর করতে পারলে ভালো হতো।

ঝিলংজা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে প্রতিদিন ২০-২৫ জন সেবাগ্রহীতা আসে। সেবাগ্রহীতাদের যেসব সেবা দেওয়া হয় তাহলো ১.কম্পিউটার প্রশিক্ষণ; ২. ইন্টারনেট সেবা; ৩. টেলিমেডিসিন সেবা; ৪. কম্পোজ; ৫. ছবি তোলা ও প্রিন্ট দেওয়া; ৬. মোবাইল ব্যাংকিং; ৭. জন্মনিবন্ধন সনদ; ৮. জমির পর্চা ইত্যাদি। ফটোকপি মেশিন না থাকার কারণে ফটোকপি সেবা দিতে পারছেন না সেবাগ্রহীতাদের।

নারী সেবাগ্রহীতার উপস্থিতি খুবই ভালো। কারণ মোট সেবাগ্রহীতার ১০-১৫ জন নারী। নারী সেবাগ্রহীতারা যেসব সেবা বেশি নেয় তাহলো ছবি তোলা, জন্মনিবন্ধন সনদ, কম্পোজ, পাসপোর্ট ফরম, স্কাইপি'তে কথা বলা ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি সেবা নিতে আসে কৃষকরা। কৃষকরা যে ধরনের সেবা বেশি নেয় তাহলো কৃষি সমস্যার সমাধান, জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ছবি তোলা ইত্যাদি।

ঝিলংজা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বিদ্যুৎ না থাকলে আইপিএস দিয়ে সেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

উদ্যোক্তা সেবা তালিকার বাইরেও কিছু সেবা দিয়ে থাকেন; তাহলো কম্পিউটার সার্ভিসিং, ল্যাপটপ এবং মোবাইল সার্ভিসিং। এই কেন্দ্রে কৃষি সেবার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। এই কেন্দ্রের উদ্যোক্তা নিয়মিত ব্লগে লেখেন। ব্লগের যে দিকটি সবচেয়ে ভালো লাগে তাহলো তথ্য জানতে, মন্তব্য পেতে ও দিতে এবং গল্প করতে।

৩. নারায়ণগঞ্জ বন্দর-বন্দর ইউনিয়ন

বন্দর ইউনিয়নের কাসেম আলী নামের একভদ্র লোক। তিনি একদিন রাস্তার এই মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছেন। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনো বড় ধরনের বিপদে পড়েছেন। উদ্যোক্তা লাবণী আক্তার তাঁকে দেখে ডাক দিয়ে বলেন, কী হয়েছে আপনার? তখন তিনি বলেন, আমার ছেলে বিদেশ থেকে মেইল পাঠিয়েছে কিন্তু তা দেখব কোথায় খুঁজে পাচ্ছি না। তখন উদ্যোক্তা লাবণী আক্তার ভদ্রলোকের ছেলের মেইল দেখে দিলেন। ভদ্রলোক লাবণীকে বলে, মা তুমি আমাকে বড় বাঁচালে। সেই ভদ্রলোক জানত না যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবা রয়েছে। এখানে ইন্টারনেটের সব ধরনের সেবা পাওয়া যায়। তারপর থেকে কাসেম আলী নিয়মিত ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে আসেন। তিনি নিজের নামে একটি মেইল খুলেছেন।

উদ্যোক্তার কেস স্টাডি

নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলার বন্দর ইউনিয়নে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন লাবণী আক্তার। তিনি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। তিনি প্রথমে ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাছ থেকে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের (ইউআইএসসি) কথা জানেন। তিনি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে অন্য কিছু করতেন না। তাঁর পড়ালেখার খরচ বাড়ি থেকে দিতে হতো। পরিবারের ওপর বেশি চাপ পড়ত তাঁর পড়ালেখার খরচ চালাতে। কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার পর তিনি মাসে তিন থেকে চার হাজার টাকা আয় করেন। এতে তাঁর লেখাপড়ার খরচ চলে এবং বাড়িতেও কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। এতে তাঁর অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। সামাজিকভাবে মর্যাদা বেড়েছে এবং তিনি রাজনৈতিকভাবে কোনো বাধা ছাড়াই কাজ করে যাচ্ছেন।

বন্দর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের গঠন কাঠামো পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অনুযায়ী হয়নি। কারণ উদ্যোক্তা কিছুই বিনিয়োগ করেননি। উদ্যোক্তার বিনিয়োগ করার মতো অবস্থা নেই কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার মতো যোগ্যতা আছে। সেকারণেই তাঁকে উদ্যোক্তা বানানো হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যেসব সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে তাহলো: ১.তিনটি ডেস্কটপ কম্পিউটার; ২. একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার; ৩.ফটোকপি মেশিন; ৪. লেমিনেটিং মেশিন; ৫. স্ক্যানার; ৬. সোলারপ্যানেল; ৭. গ্রামীণফোনের মডেম ইত্যাদি। আরো যে সহযোগিতা উদ্যোক্তা চান তাহলো বিদেশি ভিসার ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার। কারণ অনেক মানুষ ভিসা করতে এসে ফেরত যায়।

বন্দর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে প্রতিদিন ৩০-৩৫ জন সেবাগ্রহীতা সেবা নিতে আসে। তাঁদের উদ্যোক্তা যেসব সেবা দিয়ে থাকে তাহলো: ১. ফটোকপি; ২. প্রিন্ট দেওয়া; ৩. কম্পোজ; ৪. মোবাইল ব্যাংকিং; ৫. লেমিনেটিং; ৬. জীবন বীমা; ৭. পাসপোর্ট ফরম পূরণ; ৮. ছবি তোলা; ৯. ইন্টারনেট সেবার মধ্যে রয়েছে ই-মেইল, ইন্টারনেটে চাকুরির খবর, পরীক্ষার রেজাল্ট দেখা, অনলাইনে ফরম পূরণ; ১০. বয়স্কভাতার ফরম পূরণ; ১১. জন্মনিবন্ধন সনদ ইত্যাদি। যে সেবাগুলো দিতে পারে না তাহলো ভিসা তৈরি করা, স্ট্যাম্পের লাইসেন্স দেওয়া, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের অসুবিধা, ইন্টারনেট নেট কানেকশন। এই কেন্দ্রে নারী সেবাগ্রহীতার হার বেশি। কারণ মোট সেবাগ্রহীতার ১৫-২০ জন নারী সেবাগ্রহীতা। নারী সেবাগ্রহীতারা যে ধরনের সেবা বেশি নিয়ে থাকেন তাহলো জন্মনিবন্ধন, বয়স্কভাতা ইত্যাদি। ব্যবসায়ী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি সেবা নিতে আসে এই কেন্দ্রে।

এই কেন্দ্রে কৃষকরা খুবই কম আসে। কারণ এটি কৃষি অধ্যুষিত এলাকা নয়। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ভালো । বিদ্যুৎ না থাকলে সোলারপ্যানেল দিয়ে সেবা দেওয়া হয়। সেবা তালিকার বাইরে ফ্লেক্সিলোড দেয় উদ্যোক্তা। তাতে নিজেদের আয় কিছুটা বাড়ে। যে ধরনের সেবার প্রতি জনগণের আগ্রহ বেশি তাহলো ফটোকপি এবং ইন্টারনেট সেবা। ব্লগে নিয়মিত লেখেন লাবণী আক্তার। মন্তব্য পেতে এবং দিতে খুব ভালো লাগে।

৪. মুন্সীগঞ্জ-শ্রীনগর-বাঘড়া

মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বাঘড়া ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন মনোয়ারা বেগম। তিনি আগে বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। কিন্তু কিছুদিন হলো চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে গৃহের কাজ করতেন। তাই তিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা পুনরায় চালু করেছেন। কারণ প্রথম থেকে যারা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁরা লেখাপড়া করার জন্য চলে গেছেন। তারপর বাঘড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোয়ারা বেগমকে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করার জন্য বলেন। মনোয়ারা বেগম ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের অবস্থা কিছুটা ভালো করেছেন। তিনি ইউআইএসসি থেকে এখন মাসে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা আয় করছেন। তথ্য ও সেবাকেন্দ্রটি চলছে ভাড়া করা একটি দোকানে। কারণ ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে গেছে। সেখানে মেরামত কাজ চলছে।

দ্বিতীয় উদ্যোক্তা হয়েও তিনি ছয় হাজার টাকা এবং নষ্ট যন্ত্রপাতি মেরামত করে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। তাছাড়া বাকি সব সরঞ্জাম ইউনিয়ন পরিষদ থেকেই দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যেসব জিনিস দেওয়া হয়েছে তাহলো একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, স্ক্যানার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েব ক্যামেরা, কালার প্রিন্টার, একটি প্রজেক্টর ইত্যাদি। এই তথ্যকেন্দ্রে আরো একটা ল্যাপটপ এবং জেনারেটর প্রয়োজন।

এখন প্রতিদিন এই কেন্দ্রে ৩০-৩৫ জন মানুষ সেবা নিতে আসে। তারা যেসব সেবা নেয় তাহলো ফটোকপি, কম্পোজ, ইন্টারনেট সেবা, পাসপোর্ট ফরম ইত্যাদি। ইন্টারনেট ধীরগতিতে কাজ করে তাই সেবা দিতে অসুবিধা হয়ে যায়। বেশির ভাগ সেবাগ্রহীতা নারী। নারীরা পুরুষদের মতো একই ধরনের সেবা নেয়। গৃহিণীরা বেশি আসে। কারণ এখানকার বেশির ভাগ মানুষ বিদেশে থাকে। তাই বিদেশে থাকা মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে বেশি আসে গৃহিণীরা।

এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি খারাপ। বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও নেই। বিদ্যুৎ না থাকলে কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। কৃষকরা আসে খুব কম। বেশির ভাগ কৃষক কৃষিতথ্য জানার জন্য আসে।

সেবা তালিকার বাইরে কোনো সেবা দেন না মনোয়ারা বেগম। নিয়মিত ব্লগে লেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। লিখতে পারলে ভালো লাগে। অন্যের মতামত জানতে পারলে এবং মতামত জানাতে পারলে ভালো লাগে মনোয়ারা বেগমের।

৫. ফুলকোচা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, জামালপুর

জামালপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে মেলান্দহ উপজেলার ফুলকোচা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র। নিবেদিতপ্রাণ একজন উদ্যোক্তা মো. সোয়ায়েব আলী। সেবাগ্রহীতাদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কেন্দ্রে অবস্থান করেন। প্রতিদিন প্রায় ৩০ জন সেবাগ্রহীতা তার কাছে সেবা নিতে আসেন। যাঁদের মধ্যে নারীরাও রয়েছেন।

উদ্যোক্তা মো. সোয়ায়েব আলী ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাঁর ইউনিয়নে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য হিসেবে একটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে।

তিনি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল অনুযায়ী একজন উদ্যোক্তার জন্য ধার্যকৃত সবকিছু সঠিকভাবে বিনিয়োগ করেছেন। আজ তিনি সফল উদ্যোক্তাদের একজন। তবে একটি ফটোকপি মেশিনের ব্যবস্থা করা গেলে তিনি তার কাজের প্রসার আরো বাড়াতে পারবেন বলে মনে করেন। কেননা অনেক সেবাগ্রহীতাই ফটোকপি সেবা নিতে এসে না পেয়ে ফিরে যান।

এছাড়া ট্রেনের টিকিট আর টেলিমেডিসিন সেবার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই সেবা দিতে পারেন না। এসব সুবিধা পেলে তিনি তার কাজের পরিধি আরো প্রসারিত করতে পারবেন বলে মনে করেন উদ্যোক্তা মো. সোয়ায়েব আলী।

ব্লগের একজন নিয়মিত অংশগ্রহণকারী তিনি। সেবাগ্রহীতাদের সেবা দিতে গিয়ে অনেক সময় এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধান অনেক সময় তার জানা থাকে না। সেসময় তিনি সমস্যাটির কথা ব্লগে পোস্ট দেন আর ঠিক সাথে সাথেই পেয়ে যান সমাধানের নানা পরামর্শ। ব্লগে অংশগ্রহণের এই দিকটি তার সবচেয়ে ভালোলাগে বলে জানান সোয়ায়েব আলী। তাছাড়া বাকি ৪,৫৭৯ টা ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র কি ঘটছে তা তিনি ব্লগের মাধ্যমে জানতে পারেন।

৬. দুর্গাপুর ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র, কুমিল্লা

শেখ সিরাজুল ইসলাম। আগে থেকেই শিক্ষকতার পাশাপাশি কম্পিউটারসংশ্লিষ্ট কাজ করছিলেন। আর তাই তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তার ইউনিয়ন পরিষদে একটি তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলেন। সিরাজ প্রথম ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের কথা জানতে পারেন তাঁর সহযোগী নারী উদ্যোক্তার মাধ্যমে। তাড়াতাড়ি খোঁজখবর নিয়ে নিজেকে এই মহতী উদ্যোগের একজন উদ্যোক্তা হিসেবে অংশীদার হতে চাইলেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল অনুযায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো কুমিল্লা জেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নস্থ তথ্য ও সেবাকেন্দ্র। দৈনিক প্রায় ৬০ জন সেবাগ্রহীতা আসেন যাদের ৫০ শতাংশই নারী। শেখ সিরাজুল ইসলাম একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর মাসিক আয় প্রায় ৫০ হাজার।

সারাদেশের ৪,৫৭৯ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মধ্যে সিরাজ সফল উদ্যোক্তার প্রথম পুরস্কার অর্জন করে নিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাকি ৪,৫৭৯ উদ্যোক্তার জন্য। এই তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সেবাগ্রহীতাদের একটি বড় অংশ আশেপাশের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বলে জানালেন সিরাজ। গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ স্বল্পতা যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সেবার যে তালিকা তার বাইরেও সেবা দেন তিনি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জমির পর্চা, কর আদায় দাখিল, বিভিন্ন বিল পরিশোধ ইত্যাদি।

ব্লগের একজন নিয়মিত অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা সিরাজুল ইসলাম। সেবাগ্রহীতাদের সেবা দিতে গিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে সাথে সাথে পোস্ট দেন ব্লগে আর খুব দ্রুতই পেয়ে যান সমাধানের বিভিন্ন পরামর্শ। ব্লগে অংশগ্রহণের এই দিকটি তার সবচেয়ে ভালোলাগে বলে জানান তিনি।

এছাড়া অন্যদের আয়ের খবর তাকে নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করে বলে জানালেন সিরাজ। ব্লগের মাধ্যমে বিভিন্ন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা জানতে পেরে তিনি অনেক কিছুই জানতে পারছেন।

সমাপনী প্রতিফলন

অবাধ তথ্যপ্রবাহ জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে গ্রামীণ জনজীবনে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা অপরিসীম। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মৌলিক সেবাগুলোকে জনগণের আরো কাছে পৌঁছে দিতে তথ্য ও সেবাকেন্দ্রগুলো কাজ করছে। 'অনলাইন' আর 'অফলাইন' সেবা দিয়ে জ্ঞানের ভাণ্ডারে মানুষকে যুক্ত করা ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের মূল লক্ষ্য।

এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র-সমাজব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি করা যেখানে সেবার পেছনে ঘুরে মানুষ সময় নষ্ট করবে না। সেবাই পৌঁছে যাবে মানুষের কাছে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করাই ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির মূল লক্ষ্য। একুশ শতকের এ ডিজিটাল বাংলাদেশ হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। সুখীসমৃদ্ধ বাংলাদেশ জ্ঞানভিত্তিক হলে বদলে যাবে মানুষের জীবনযাত্রা।

সুপারিশসমূহ

আমাদের উপমহাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের বয়স একশ' বছরেরও বেশি। দেশের তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সাথে আত্মার সম্পর্ক ইউনিয়ন পরিষদের। এই আত্মার সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে ইউআইএসসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পুরো গবেষণাটির আলোকে কিছু সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো:

* প্রতিটি ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রে বিদ্যুতের সুব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প বিদ্যুতের উৎসের জন্য সৌরশক্তি কিংবা জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউআইএসসি'র জন্য তাই আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। এজন্য সরকারকে একাজে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।
* ইউআইএসসি'র জন্য আরো প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন। মানুষ হয়তো সেবা নিতে আসছে। কিন্তু প্রচার-প্রচারণার কারণে অনেকেই তা জানেন না। এক্ষেত্রে আরো বেশি প্রচারণা থাকলে আরো বেশি মানুষ তথ্যসেবা পেতে আগ্রহী হবে।
* গবেষণায় একটি বিষয় দেখা গেছে, গাজীপুরের পুবাইল ইউনিয়নে উত্তরদাতারা অধিকাংশ সময় নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, সেটা নারী সদস্যদের ইউআইএসসি ব্যবহার কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই হোক। সেখানে উচ্চতর একটি গবেষণা করা প্রয়োজন তাদের নেতিবাচকতার কারণ জানতে।
* ইউনিয়ন তথ্য সেবাকেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের আরো বেশি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাহলে তাদের কাজের মান বাড়বে। সেইসাথে উন্নত হবে ইউআইএসসি'র সেবার মান।
* ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হলে মূল লক্ষ্যে পৌঁছুতে অসুবিধা হবে।
* সকল তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সাথে সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। যাতে সেবাগ্রহীতারা স্বল্পসময়ে ও সহজভাবে সেবাগ্রহণ করতে পারে।
* সরেজমিনে দেখা যায়, বেশির ভাগ তথ্যকেন্দ্রের কম্পিউটার, প্রিন্টার, ক্যামেরাসহ উপকরণ নষ্ট। তাই জরুরিভিত্তিতে এগুলো মেরামত করে জনগণকে সেবাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
* অনেক ইউনিয়নে সরঞ্জাম থাকলেও সেগুলো ইউনিয়ন পরিষদে না রেখে অন্যত্র নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বাণিজ্যিকভাবে যাতে ব্যবহৃত না হয় কর্তৃপক্ষের সেদিকে নজর রাখতে হবে।
* নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে পুরো বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, জনগণের দোরগোড়ায় যাতে সেবা পৌঁছতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে চাহিদাভিত্তিক সেবাপ্রদান করতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা বিশেষত স্থানীয় প্রতিনিধিরা এই চাহিদা তৈরি ও নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।
* ইউআইএসসি'র সেবা নেওয়া ফটোকপি, কম্পিউটার কম্পোজের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রেই সীমিত। অন্য সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে।

[দ্রষ্টব্য: গবেষণা সম্পাদনকালীণ সময়ে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র নাম হলেও বর্তমানে এই নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার রাখা হয়েছে]

সহায়ক তথ্যসূত্র

1. Strategic Priorities of Digital Bangladesh, prepared by access to Information (a2i) Programme, Prime Minister''s Offiice, January 2011;
2. http://theindependentbd.com/national/69718-manpower-shortage-in-info-service-centre-in-sirajganj.html;
3. http://www.thefinancialexpress-bd.com/2009/01/10/55476.html;
4. http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=79698;
৫. ছিদ্দিকী, রহমত আলী, সামাজিক গবেষণার পদ্ধতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, বাংলা একাডেমি প্রকাশনা, ২০০১-২০০২;
৬. আলম ড. খুরশিদ, মো. মাহমুদ হাসান (বিপ্লব), সমাজ গবেষণা;
৭. পিআইবি ফিচার (২০১০), নিরীক্ষা, সংখ্যা ১৮৯, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট;
8. http://writing/colostate/edu/guide/research/casestudy/pop2a.cf;
9. Boyce, Carolyn & P, Palena Neale- Conducting In –Depth Interviews ;
10. www.digitalbangladesh.com;
১১. ইত্তেফাক,১২ নভেম্বর ২০১০;
১২. সমকাল, ১০জুন ২০১২, লেখা- প্রান্তিক জীবনে ডিজিটাল সেবা;
১৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ, নিউজলেটার, একসেস-টু-ইনফরমেশন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, নভেম্বর ২০১০;
14. http://mukto-mona.com/wordpress/?p=103;
15. http://www.digitalbangladesh.gov.bd/documents/QPR/QPR%20July-Sep%202010.pdf
১৬. প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, প্রযুক্তির পালাবদল- দিনবদলের ২০১০;
17. Microsoft Encarta Dictionary
18. Rogers, Evertt M - Diffusion of Innovations
19. http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%93_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0

লেখক: গবেষক, পিআইবি

সাংবাদিকতার নতুন ধরন নির্মাণে মোনাজাতউদ্দিন

ড. জ্যোৎস্নালিপি

মোনাজাতউদ্দিনের পেশা, নেশা দুই-ই ছিল গ্রামের পথঘাট ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা

বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে মোনাজাতউদ্দিন (১৯৪৫-'৯৫) নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ সাংবাদিক, যাঁর কর্মপ্রেরণার শেকড় সঞ্চারিত ছিল গ্রামীণ সমাজ-জীবনের তলদেশ অবধি।

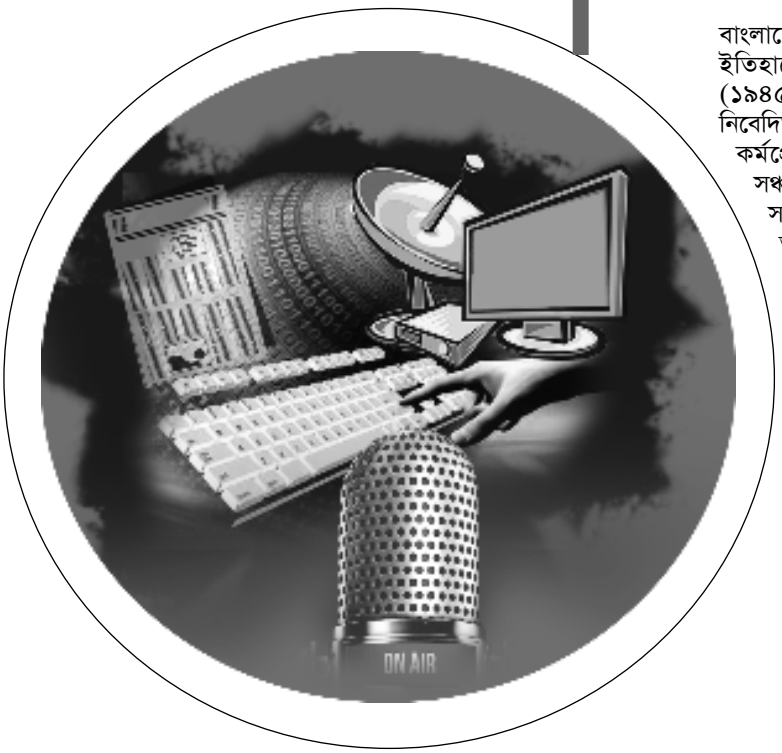

সাংবাদিকতার পথ সবসময়ই অমসৃণ। এই অমসৃণ পথ ধরেই সাংবাদিকতার ইতিহাসে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন (১৯৪৫-১৯৯৫)। গ্রামের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নাম। ধুলোমাটিতে মিশেছিল তাঁর লেখনীর ছোঁয়া। গ্রামের মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে একেবারে নিবিড়ভাবে তিনি অনুভব করেছিলেন। ফলে তাঁর শিল্পিত হাতের ছোঁয়ায় সেইসব মানুষের যাপিতজীবন প্রাণ পেয়েছিল খবরের কাগজে। সংবাদ যে শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামের মানুষেরাও যে কাগজের মানুষে পরিণত হতে পারে, তার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। সংবাদপত্রগুলো মূলত এলিট শ্রেণির কথা এবং রাজনীতি অথবা পুঁজি-স্বার্থে বিজ্ঞাপন প্রচারে সবসময়ই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মোনাজাতউদ্দিন এই ধারার বাইরে এসে সাংবাদিকতার নতুন ধারা নির্মাণে সচেষ্ট হলেন এবং তিনি গড়ে তুললেন সাংবাদিকতার এক নতুন অধ্যায়।

পেশাগত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়; স্বীয়সাধনা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মপদ্ধতি গুণে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। মফস্বল সাংবাদিকতার নামে যে উন্নাসিক মানসিকতা ছিলো নগরবাসী মানুষের, তিনি প্রায় একক প্রচেষ্টায় তা দূর করতে সক্ষম হন। বস্তুত, মফস্বলের সংবাদও যে গুরুত্বের ভিত্তিতে সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ হতে পারে তারই দৃষ্টান্তস্থাপক মোনাজাতউদ্দিন।[১]

মোনাজাতউদ্দিনের পেশা, নেশা দুই-ই ছিল গ্রামের পথঘাট ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা। তিনি মানুষের পাজরের হাড়ের খবর তুলে আনতেন। নির্যাতিত মানুষের জীবনের দুঃখগাঁথা ছিল তার সংবাদের বড় অংশ। তিনি সবসময়ই সুবিধাবঞ্চিত নিরন্ন মানুষের সংবাদকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। খবরের পেছনের খবরকে তিনি তুলে ধরতেন বিচক্ষণতায়। তাঁর সংবাদ

উপকরণ হতো বঞ্চিত মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা।

> তাঁর মতো পেশার প্রতি এত বেশি আন্তরিক সাংবাদিক দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। প্রায় সার্বক্ষণিক সংবাদকর্মী হিসেবে কেবল সংবাদ প্রেরণ বা প্রকাশ করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। সংবাদ উপকরণ, সংবাদের পেছনের মানুষজন ও সংবাদশিল্পের সার্বিক কল্যাণ ছিল তাঁর একান্ত বিবেচনায়। এ–মন্তব্যের প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান তাঁর প্রকাশিত *পথ থেকে পথে*, *সংবাদ নেপথ্যে*, *কানসোনার মুখ*, *পায়রাবন্দের শেকড়*, *সংবাদ*, *নিজস্ব রিপোর্ট*, *ছোট ছোট গল্প*, *অনুসন্ধানী প্রতিবেদন: গ্রামীণ পর্যায় থেকে*, *চিলমারীর একযুগ*, *শাহ আলম ও মজিবরের কাহিনী*, *লক্ষ্মীটারী ও কাগজের মানুষেরা* গ্রন্থে। ব্যক্তিক-অভিজ্ঞতা, জীবনদৃষ্টির গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্য ও নিপুণ উপস্থাপনগুণে এসব সংবাদ বিষয়ক গ্রন্থ যেন সংবাদ সাহিত্য হয়ে উঠেছে।[২]

সাংবাদিকতায় নতুন পথ নির্মাণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। মোনাজাতউদ্দিন হতদরিদ্র মানুষের করুণচিত্র খুব দায়িত্বের সঙ্গে লিখতেন এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। আবার নিজেও কখনো সহায়তার হাত বাড়াতেন। তাঁর নিজের লেখাতেই উঠে এসেছে সেসব কথা–

> শহর থেকে গ্রাম আর গ্রাম থেকে শহরে ঘুরে ফিরি খবরের সন্ধানে। দুর্নীতির খবর, খাদ্যাভাবের খবর, মানুষের দুর্গতির খবর। এইসব তুলে ধরবো 'সংবাদ'-এ। সরকার জানবে, ব্যবস্থা নেবে। পাঠক জানবেন, জনমত সৃষ্টি হবে। আর, ভালো কাজ করতে পারলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ থাকবেন সন্তুষ্ট। আমি শ্রমিক, লিখে খাই। কর্তৃপক্ষ কিছু টাকার বিনিময়ে আমার শ্রম কেনেন। আমি এটা বুঝি। তবুও 'সিনসিয়ার' হবার চেষ্টা করি। ভালো কাজে নাকি ভালো ফল মেলে! কিন্তু না, মিথ্যে এই কথা। মিথ্যে। যিনি ঐ কথা বলেছেন তিনি মিথ্যুক। নইলে, পেশায় যিনি এসেছেন সেদিন, যার খবর ছাপা হয় আমার এক-চতুর্থাংশ, তিনি কি করে পাঁচ-ছয় বছরের সাংবাদিকতায়...
>
> আমি এসব ভাবি। অনুতাপ হয়। তারপর, একসময় ভুলে যাই সেসব কথা। যা পাচ্ছি, যতটা পাচ্ছি, তা-ই আমার প্রাপ্য। অন্তত মাথা উঁচু করে হাঁটতে তো পারি আর দশজনের সামনে! স্নেহ পাই আহমেদুল কবীর সাহেবের কাছ থেকে, ভালোবাসেন বজলু ভাই, সন্তোষদার স্নেহ ধন্য আমি, নির্বাহী পরিচালক আলতামাশ কবির বিশ্বাস করেন। সহকর্মী যাঁরা, সবাই সমান ভালো না বাসুক অন্তত ঘৃণা করেন না কেউ বোধকরি। এই তো ভালো। এই তো যথেষ্ট পাওয়া। মাথা উঁচু করে পথ হাঁটি। কিন্তু মাথা নত হয় বিবেকের কাছে। সাংবাদিকতার নামে এ আমি কি করছি ! এটা কি রীতিমতো একটা ব্যবসা হয়ে যাচ্ছে না?
>
> মানুষের দুর্ভোগ-দুর্গতি নিয়ে ব্যবসা। অনাহারী মানুষ আমার ব্যবসার পুঁজি। দুঃস্থ-দুঃখী মানুষ আমার সুনাম এবং অর্থ। তারাই স্বর্ণপদক, ফিলিপস্ পুরস্কার, আই ডি ই পুরস্কার ইত্যাদি। এই তো কিছুদিন আগের কথা। গেছি শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে। সেখানে খাদ্যাভাবে মারা গেছে ৮ জন। আক্রান্ত দেড়শ'। ছবি তুললাম যে লোকটির সাতদিন অনাহারে থাকবার পর আধসের চাল পেয়েছে আর তাই ৭ সদস্যের পরিবারটি ভাগাভাগী করে খেয়েছে তারা। ছবি তুললাম এক বৃদ্ধার যে নাকি খাদ্যাভাবে ভাত বা রুটির পরিবর্তে অনাহারী পেটে গতকাল খেয়েছে দু'টি কাঁচাকলা সেদ্ধ।
>
> ঐ ছবি তুলে আনলাম। ঝিনাইগাতী থেকে শেরপুর, শেরপুর থেকে জামালপুর হয়ে ঢাকা। সংবাদে এসেই জমা দিলাম সচিত্র প্রতিবেদন। প্রতিবেদন পড়ে কনগ্রাচুলেট করলেন বেশ ক'জন পাঠক। বেশ ভালো হয়েছে লেখা। ছবি, সে তো আরো খুব ভালো। 'থ্যাংক ইউ মোনাজাতউদ্দিন'।
>
> ছবি ছাপা হয়। প্রশংসা যেমন পাই, তেমনি আবার ছবির বিল জমা দিই। বিল পাশ হয়ে যায় অল্প সময়েই, একেকটা ছবির জন্য পঞ্চাশ টাকা। একসাথে মোটা টাকা তুলি আমাদের হিসাব বিভাগ থেকে। দুপুরে খেতে যাই। শুভ্রায়, অথবা সংবাদ অফিসের নিচে মহুয়া রেস্তোরাঁয়।
>
> খাই মুরগীর রান, কিংবা খাসির কলিজা। কোনোদিন থাকে মাছ। থাকে গরুর ভুনা মাংস। গরম ভাত থেকে ধোঁয়ার সাথে সাথে উবে যায় সব স্মৃতি। অতীত উধাও, দু'দিন আগে শেরপুরের কোন অভাবী গ্রামে ছিলাম, ভুলে যাই। ভুলে যাই দীর্ঘদিন বেকার বৃদ্ধমজুর ভাদুর কথা, বিস্মৃত হয় কাঁচাকলা সেদ্ধ খাওয়া সেই বৃদ্ধা। যে গ্রামে ক্ষুধা আজো আছে, যেখানে অনাহারজনিত অপুষ্টিতে মারা গেছে নর-নারী-শিশু, তারা কোথায়? কই? খাবারের টেবিলের ধারে ওদের ছবির টাকা আছে, ওদের নিয়ে লেখা ছবি- প্রতিবেদনের প্রশংসাবাক্য স্মরণ আছে, কিন্তু ধারে কাছে নেই আমার পণ্য। আমি যখন দুপুরে ভরপেট খাচ্ছি, তারা তো এই শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামে আছে উপবাসী। তারা থাকুক কি মরুক, আধসের চালের ভাত ৭ জনে ভাগ করে খাক কিংবা কেউ খাক কাঁচাকলা সেদ্ধ, আমার যেন কিছু আসে যায় না! মানুষের কলিজা খাদক জনৈক খলিলুল্লাহ, অনেকদিন আগে ধরা পড়েছিল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাছে থেকে। সে খেতো মৃত মানুষের কলিজা। খেতো প্রকাশ্যে। আর আমি, অসম সমাজের আমি, সম্পদের সুষম বণ্টনহীন সমাজের আমি, জ্যান্ত মানুষের দুর্গতি-দুর্ভাগ্য পণ্য করে খাই। এবং এই কাজটি করি কৌশলে, সবার চোখের আড়ালে, ফর্সা কাপড়ে দেহ ঢেকে। আমার মেকআপ খুব কড়া। ধরা যায় না।
>
> আর আমাকে ধরবেই বা কে? কারা? কারা করবে চিহ্নিত? আমার আশপাশের মানুষজন? না, তারা পারেন না। কেননা, কে বুকে হাত দিয়ে বলবেন মানুষের দুর্গতি-দুর্ভোগকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পণ্য করেন না তাঁরা? যে মানুষটি উদয়াস্ত শ্রম-ঘাম ঢালে, কে তাকে ন্যায্য মুজুরি দেন? যে কৃষকটি রক্ত ঢেলে খাদ্য ফলায়, কে তাকে সম্মান করেন ? কে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য দেন? সামাজিকভাবে মর্যাদা পায় কি ওইসব মূল্যবঞ্চিত মানুষ? নাকি, আমার মতোই অনেকে ব্যবহার করেন তাদের !
>
> এইসব ভাবি আর পথ চলি। আমার সঙ্গে আছে তিন-তিনটি ব্যাগ। প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র আছে সেগুলোতে। নেই শুধু একটি জিনিস। একটি আয়না। আপনাদের আছে? দেবেন একটুখানি? না, এক্ষুনি নয়। নিজেদের মুখটি দেখে নিন আগে। তারপর। দেখা কি যাচ্ছে নিজেকে?[৩]

মোনাজাতউদ্দিনের ছিল সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, নিজের কাছে নিজের স্বীকারোক্তি। আর সে কারণেই পথে পথে ঘুরে তিনি সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। অভাবী-অনাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট তার সংবাদিকতার বাইরে যে মন আছে সে মনকেই নাড়া দিয়েছে কখনও-কখনও। তাই তিনি নিজের কাছেই নিজে আত্মগ্লানিতে ভুগেছেন। জবাব দিয়েছেন নিজের কাছে নিজে। তিনি লিখেছেন–

> এক রোদজ্বলা দুপুরে পায়রাবন্দ থেকে শহরে ফিরে আসি। আমার নোটবুকে অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী, ক্যামেরায় বন্দী অনেক ছবি। এগুলো আমি বেচে খাবো। এই আমার গ্রাম!

> এই আমার দেশ। এই আমার পেশা।
> পথের ধারে একখণ্ড জমিতে, প্রচণ্ড রৌদ্রের ভেতরে, পোড়া খাটিয়া তখন ধানক্ষেত নিড়ানী দিচ্ছেন। তাঁর হাতের যত্নে এই চারাগাছ বেড়ে উঠবে, থোড় আসবে, শীষ আসবে, ধান পাকবে, যাবে রংপুর শহরের বাজারে।
>
> এবং পোড়া খাটিয়াদের কথা-কাহিনী বিক্রির টাকায় আমি সেই ধান থেকে পাওয়া চাল কিনবো, ধোঁয়া ওঠা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে বলবো, বাহ্, চালটা তো বেশ ভালো।[৪]

মোনাজাত আলাদা জাতের মানুষ। অল্প কথার লোক– কেবল কাজ বোঝেন। চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ–উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। কয়েক মিনিট আলাপেই তা ধরা পড়ে। প্রথম আলাপেই বলা যায়, তার সে প্রখর ব্যক্তিত্ব আমাকে অধিকার করে বসে। মোনাজাতের সঙ্গে পরে যখনই দেখা হয়েছে তাঁর অতি সৌজন্য বোধের আড়ালে তাঁর দৃঢ়চেতা মনের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছি। তিনি কাজ বোঝেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাজ করতে ভালবাসেন। কোন রকম ভড়ং বা আলগা স্মার্টনেস তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। থাকতেন অত্যন্ত সাধারণভাবে। সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে যেন কোন অসুবিধা না হয়।[৫]

সাংবাদিকতার প্রচলিত ধারার বাইরে এসে মোনাজাতউদ্দিন গ্রাম এবং গ্রামের মানুষও যে সংবাদের প্রথম পাতায় আসতে পারে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। গ্রামের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি লিখেছেন– সংবাদের শুধু প্রচলিত কাঠামোতেই নয়, সাদামাটা কাঠামোর বাইরে এসে। তিনি অ্যাডভোকেসি সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি সাংবাদিকতা জগতে এক ধরনের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন মানুষের জীবনে। শুধু সাধারণ মানুষের খবর সংবাদপত্রে তুলে ধরে তিনি বিষয়টাকে ছেড়ে দেননি, সে সংবাদের নিয়মিত ফলোআপ করেছেন এবং যে খবরটি ছাপা হয়েছিল তার আদৌ কোনো ফিডব্যাক হয়েছে কী না তার খোঁজ-খবর রেখেছেন নিয়মিত।

জনসাংবাদিকতার ধারণা গ্রামীণ সাংবাদিকতা থেকে বিস্তৃত। গ্রামীণ মানুষ বা প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে গ্রামীণ সাংবাদিকতার ধারণা মোটামুটিভাবে প্রচলিত হলেও জনসাংবাদিকতার অর্থ বিস্তৃত। ধর্ম, গোত্র, শ্রেণি, বর্ণ নির্বিশেষে যেকোনো এলাকার সমস্যাসঙ্কুল মানুষের জীবনে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান কীভাবে সম্ভব জনসাংবাদিকতা তেমনই নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে মোনাজাতউদ্দিনের সাংবাদিকতার ধরনে শুধুমাত্র গ্রামীণ সাংবাদিকতাই নয়, তার কর্মপরিধি ছিল আরো বিস্তৃত। তিনি জনকল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি শুধুমাত্র গ্রামীণ মানুষের সমস্যাই তুলে ধরেননি, তার কর্মপরিধি গ্রামীণ সাংবাদিকতার সীমা ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃতরূপে ধরা দিয়েছিল।

একটা সংবাদ, একটা ঘটনা সংবাদকে পত্রিকার পাতায় তুলে ধরার জন্যই একেবারে খবরের ভেতরে ঢুকে যেতে পারতেন এবং একজন জনসাংবাদিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যেসব কৌশল অবলম্বন করেন প্রতিটি কৌশলই তার মধ্যে ছিল।

মোনাজাতউদ্দিন করেছেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। খবরের পেছনের খবরকে তিনি খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছেন তারা জেন্ডার কৌশলে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন–

> অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নিয়ে এলে কথাটা খুব বিতর্কিত মনে হয়। একজন সাংবাদিক যখন প্রতিবেদন লেখেন তিনিতো ঘটনার খোঁজ-খবর নেন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন, সূত্রগুলো থেকে পাওয়া কোন তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে কিংবা নিজের সন্তুষ্টির জন্যে তা 'চেক' বা 'ক্রসচেক' করেন। তাকে সংশ্লিষ্ট দফতরে (বা ঘটনাস্থলে) যেতে হয়, এর-ওর সাথে কথা বলতে হয়। নানা জায়গায় টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হয়। এরকম অনুসন্ধান চালানোর পর লেখা একটি প্রতিবেদন কি 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' নয়? ধরুন, ঢাকার কোন মহল্লায় খুন হলো এক গৃহবধূ, কিংবা ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে বাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো ১০ জন, কিংবা আরো দূরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় নলকূপ থেকে গ্যাস বেরুচ্ছে,– খবর পাওয়া মাত্রই প্রতিবেদককে তৎপর হতে হয়। ঢাকায় খুনের ঘটনা জানার জন্যে সন্তোষ মণ্ডলকে প্রথমে যোগাযোগ করতে হয় থানায়, জানতে হয় কবে কখন কি করে ঘটনা ঘটল, হত্যার মোটিভ, মামলা হয়েছে কিনা, আসামি ধরা পড়েছে কিনা। বিস্তারিত জানবার জন্যে যেতে হয় তাকে ঘটনাস্থলে। নিজে কিংবা পুলিশ সূত্রে ঐ গৃহবধূর একখানা ছবি যোগাড় করতে হয়। গৃহবধূ সমাজের কেউকেটা শ্রেণির হলে অনুসন্ধানের পরিধি বিস্তৃত হয় আরো। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। জন প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে হয়। এইসব খায়খাটুনির পর, পরদিন কাগজে বেরোয় 'গুলশানে গৃহবধূ খুন'। ঢাকা-আরিচা সড়কে দুর্ঘটনা ঘটলে কল্যাণ সাহার ঘরে বসে থাকার জো নেই। খবর পাওয়া মাত্রই ক্যামেরা কাঁধে ছুটে যেতে হয় তাকে দুর্ঘটনাস্থলে। হতাহত যাত্রীদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ, দুর্ঘটনা কি করে ঘটল জানা, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, হাসপাতালে ভর্তি বাসযাত্রীদের অবস্থা জানা, পাঠকের মন স্পর্শ করে এমন 'সাইড স্টোরি' নেয়া, এমনকি ছবি তোলা, এরকম শতেক কাজে দিনভর ব্যস্ত থাকার পর তাকে আবার রাতে ছুটে যেতে হয় অফিসে। খবর লিখতে হয়। লেখার ফাঁকে-ফাঁকে শিবালয় থানা কিংবা উথলী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতে হয় মৃতের সংখ্যা বাড়ল কিনা। পরদিন পত্রিকায় আসে 'আরিচা মহাসড়কে বাস দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু' সংবাদ। একইভাবে পঞ্চগড়ে নলকূপ থেকে গ্যাস বেরুচ্ছে এরকম খবর পাওয়ার পর দিনাজপুরের সংবাদ প্রতিনিধি বসে থাকতে পারেন না। ঘটনা অনুসন্ধানের জন্য তক্ষুনি ছুটে যেতে হয় তাকে ঘটনাস্থলে। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে, নলকূপ দেখে, লোকজনের সাথে কথা বলে, ছবি তুলে ফিরে আসতে হয় তাকে শহরে, খবর-ছবি পাঠাতে হয় ঢাকায়। এরকম এলাকা পরিদর্শন আর অনুসন্ধান পরিচালনার পর চিত্ত ঘোষের খবরটি ছাপা হয় 'পঞ্চগড়ে নলকূপ থেকে গ্যাস উঠছে' এই শিরোনামে। তা, ঢাকার গুলশান, আরিচা মহাসড়ক কিংবা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিবেদক তো ঘটনার অনুসন্ধান করেই খবরটি লিখলেন! এগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর্যায়ে পড়বে না কেন? তাহলে 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' কি ধরনের প্রতিবেদন?

ঢাকার খবর হোক কিংবা পঞ্চগড়ের খবর, প্রতিবেদককে ঘটনার অনুসন্ধান করেই তা লিখতে হয়। বড় খবরের জন্য অনুসন্ধান করতে হয়, ছোট খবরের জন্যও অনুসন্ধান করতে হয়। প্রথম পাতার খবরের জন্য অনুসন্ধান করতে হয়, অনুসন্ধান করতে হয় ৫-এর পাতার একটি খবরের জন্যও। ঢাকায় প্রফুল্ল কুমার ভক্ত যখন প্রতি সপ্তাহে বাজারদরের ওপর প্রতিবেদন লেখেন, সেটি বাসায় বসে থেকে সম্ভব হয় না, টেলিফোনেও সংগ্রহ করা যায় না। যেতে হয় তাঁকে রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে। আড়তে আড়তে, দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করতে হয় কোন জিনিসের খুচরা বা পাইকারি মূল্য কত, দাম আগের সপ্তাহের তুলনায় কি কমল, সরবরাহ কেমন, চাহিদা কেমন, চালের দাম বেড়ে যাবার নেপথ্যে কারণটি কি, আলু-পটলের দাম কমে যাবার কারণ কি। একইভাবে, রাজশাহীতে পদ্মার ভাঙ্গন কিংবা বন্যা শুরু হলে মলয় ভৌমিককে একাধিক জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে হয়। যেতে হয় ঘটনাস্থলে, ক্ষতিগ্রস্ত জনপদ ঘুরে বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে জানতে হয় কি কারণে পদ্মায় ভাঙ্গন শুরু হলো, বাঁধটি ভেঙে গেল কেন, ভাঙ্গন প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা। যোগাযোগ করতে হয় প্রশাসনে, ত্রাণ বিভাগে, বরাদ্দ হয়েছে কিনা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনো

> ত্রাণসামগ্রী। এই যে এলাকা থেকে এলাকায় যাওয়া, ঘোরাঘুরি, খোঁজ-খবর, যাচাই, একাধিক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ, কথা বলা, এসব কি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বহির্ভূত? না হলে 'ঢাকার বাজারদর চড়া' কিংবা 'রাজশাহীতে পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন' এ খবর 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' নয় কেন?
>
> অনুসন্ধান বলতে সাধারণভাবে যা বোঝা যায়, তা অবশ্য সব ধরনের সংবাদের জন্য সমানভাবে প্রয়োজন হয় না। শেখ হাসিনা জনসভায় বক্তৃতা করছেন মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে, কিংবা সেই অনেক দূরের লালমনিরহাটে, সেখানে অনুসন্ধানের ব্যাপারটি সীমিত। শেখ হাসিনা বক্তৃতা করেন, সাংবাদিককে নোট নিতে হয় কিংবা রেকর্ড করতে হয়। তারপর লেখা। জনসভায় আর কে কে বক্তৃতা করলেন, লোক হয়েছিল কত, এসব শোনা বা দেখার ব্যাপার। এরকমই, চোখের সামনে কোনো একটা মিছিল হলে, অনেকদিনের খরার পরে বৃষ্টি হলে, স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলায় চোখের সামনে গোল হয়ে গেলে অনুসন্ধানের ব্যাপারটি হয়তো প্রয়োজন হয় না। (মিছিলটি কি কারণে হলো, কত মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে এবং তা কতটুকু উপকারে আসবে, স্ট্রাইকার এ পর্যন্ত কতটি গোল করলেন, এসব ক্ষেত্রবিশেষ জানতে বা তথ্য উদ্ধৃত করতে হয়)। এছাড়া আর সব বিষয়ের ওপর প্রতিবেদন রচনা করতে হলে কমবেশি খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়া সাংবাদিকের উপায় নেই। অনুসন্ধান তাকে করতেই হয়।
>
> তবু সেগুলো 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' নয়। কোনো ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে যাওয়া, নেপথ্য সংবাদ সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, কারণ নির্ণয়, ঘটনার প্রতিক্রিয়া, ঘটনা নিয়ে জনপ্রতিক্রিয়া, তাবৎ খুঁটিনাটি দিকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, যাচাই করা, –তারপর লেখা হতে পারে একটি 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন'।[৬]

অর্থাৎ মোনাজাতউদ্দিন সাংবাদিকতার নতুন ধারা নির্মাণে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে ভিন্ন আঙ্গিকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। আর এ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কাজ করেছে গ্রামীণ সাংবাদিকতার মানসিকতা। মোনাজাতউদ্দিন বলেছেন–

> বিষয় নির্বাচনের সময় দ্বিতীয় দিকটি সামনে রেখেছি। স্বীকার করি এটা উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। গ্রামীণ সাংবাদিকতা এখনো উপেক্ষিত, অনেকের কাছে নাক সিটকানোর, কেমন যেন মফস্বল মফস্বল গন্ধ। অনেকেই এ রকম ধারণা পোষণ করেন যে, ঢাকায় বসে স্টোরি লিখলে সেটি হবে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকতা আর পাবনার কোনো গ্রাম থেকে রিপোর্ট পাঠালে সেটি হবে 'মফস্বল সংবাদ'। এটি আমি ৩২ বছরের শ্রম আর রক্ত নিংড়ে দিয়ে ভাঙ্গতে চেয়েছি। সংবাদ সংবাদই, তার কোনো সদর-মফস্বল নেই, এটা প্রমাণ করবার জন্য তার একটামাত্র তৈরি করতে চেয়েছি যাতে পাঠক রংপুর বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী কি দিনাজপুরের কোনো ঘটনা বা বিষয়কে 'বিশেষ কোনো অঞ্চলের সংবাদ' মনে না করেন।[৭]

অর্থাৎ মোনাজাতউদ্দিন সবসময়ই জনমানুষের কথা বলতে চেয়েছেন। প্রথাগত সাংবাদিকতার ভিত ভেঙে নতুন এক ধরনের সংবাদিকতা করতে চেয়েছেন, যে সাংবাদিকতায় থাকবে গণ-মানুষের কথা, গণ-মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, যে সাংবাদিকতা মানুষের উপকারে আসবে।

> সংবাদপত্র এখন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, এই মিডিয়ায় সংযুক্ত হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সাংবাদিকতার পেশায় এসেছেন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সংবাদকর্মী; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেলফ সেন্সরশিপের কারণে বহু জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর লেখা প্রতিবেদন পাঠকের সামনে আসছে না। এর নানা কারণের একটি হলো বিষয়ের সাথে প্রকাশপক্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক। এটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।[৮]

অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে গ্রামীণ সাংবাদিকতার বড় বাধা হচ্ছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা। এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় মূলত এলিট শ্রেণির বিত্ত-স্বার্থকে। তারা ব্যবসায়িক স্বার্থেই সংবাদ বিক্রিতে গ্রামীণ সংবাদ আবার কখনো অনুসন্ধানী সংবাদ এড়িয়ে যায়। কোনো দুর্নীতির বিষয়ে যদি সাংবাদিক তথ্য অনুসন্ধান করেন তার সাথে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জড়িত, দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনোভাবে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার মালিকপক্ষের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা আছে। সুতরাং টেলিফোন বা অনুরোধ আসতেই পারে ফলে এ ধরনের সংবাদ কিল হয়ে যায়। তেমনই সংবাদপত্রগুলো মূলত রাজনৈতিক সংবাদে পক্ষপাতদুষ্ট। তারা রাজনৈতিক নেতাদের খবর বা কোনো উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ বেশি করে ছাপায়। কারণ তাদের ভাষা অনুযায়ী 'পাঠক খাবে বেশি'। সুতরাং এই নীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় গ্রামীণ মানুষের সংবাদ ভেতরের পাতায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল কলামে ছাপা হয়। আবার কখনো হয়ই না। অর্থাৎ কৃষক সার পাচ্ছে না কেন, তাদের ফসল ভালো হচ্ছে না বা একই এলাকায় বছরের পর বছর কেন খরা হচ্ছে এসব খবর সংবাদপত্রের পাতায় তেমন গুরুত্ব পায় না, যতটা না গুরুত্ব পায় রাজনৈতিক নেতার জনসভার খবর কিংবা জনপ্রিয় অভিনেতার প্রেমের খবর।

মোনাজাতউদ্দিন এর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। পথে পথে তিনি খবরের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং যখন-তখন ছুটে গিয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পায়ে হেঁটে আবার কখনো যানবাহনে চলে গিয়েছেন বিস্তীর্ণ চরাঞ্চলে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তিনি আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন এবং তাঁর লেখা এমনভাবে হৃদয় স্পর্শ করেছে যে, সংবাদটি মোটেই সাদামাটা সংবাদ নয়, এর বাইরের জায়গায় ছিল তার অবস্থান।

> ছবিরন নামের মেয়েটি, বয়স ৮ বছর, বাবা একজন দিনমজুর, দৈনিক মজুরি পায় ৮ থেকে ১০ টাকা, পরিবারে খাবারের মুখ ৬টি, উপার্জনের টাকায় দৈনিক একবেলাও ভাত বা রুটি জোটে না পেটভরা, সে কী করে পরনের প্যান্ট-ফ্রক পাবে? কী করে স্লেট-পেন্সিল, খাতা-কলম কিনবে? প্রাথমিক শিক্ষার বইটি নাহয় সরকার থেকে বিনামূল্যে পাওয়া গেল; কিন্তু একদিস্তা কাগজের দাম কত? একটা বলপেন কিংবা নেহায়েত শুরুর ক্লাস হলে কাঠপেন্সিলের দাম যোগ দিতে হয়। ৮-১০ টাকা মজুরিপাওয়া সম্পূর্ণ ভূমিহীন পিতার পক্ষে এসবও নাহয় কল্পনায় ধরা যাক সম্ভব, কিন্তু পেছন-ফাটা বোতাম খোলা একটিমাত্র বিবর্ণ মলিন প্যান্ট পরে ছবিরনের এ স্কুলে পড়তে যাওয়া অসম্ভব। অন্তত একখানা ফ্রক গায়ে না থাকলে শুকনো কালো যে বুক এবং ফোলা নাড়িভাসা পেট, তা নিয়ে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভের বেঞ্চে বসবার সুযোগ বেগম রোকেয়ার পায়রাবন্দে কেন, বাংলাদেশের কোনো বিদ্যালয়েই নেই। ছবিরন সে কারণে বাড়িতেই থাকে, সকালবেলা শুধু পানি দিয়ে উপবাস ভঙ্গ (ব্রেকফাস্ট) করা মেয়েটি, ৮বছর বয়সের ছবি, সাধ্যবান পরিবারে জন্মালে এখন যার থ্রি বা ফোরে পড়বার কথা, সে ধারে কাছের কোনো ভূস্বামীর বাড়িতে চলে যায়। গোয়াল পরিষ্কার, ঘর-উঠোন ঝাড়ু, পানিকল টেপা, কাঁথা-কাপড় ধোয়া, ধান সেদ্ধর জন্যে জ্বালানির

> যোগান, লেপা-মোছা, এইসব শতেক কাজের ফাঁকে স্কুলের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়, শোনা যায় হৈ-হুল্লোড়, চিৎকার, সেইসাথে 'এ্যাই হারামজাদি ছুড়িটা কোনোয় কাম্ পারে না' বলে খালাম্মা চাচিআম্মার (বাড়ির মালিক-গিন্নি) তর্জন গর্জন। তারপর, বেলা গড়িয়ে গেলে জোটে এক সান্‌কি পোড়া ঠাণ্ডা ভাত, একটুখানি শাক-সোলকা কিংবা 'আলু-বাইগোনের লাবড়া'। ছবিরন অর্ধেক খায়, বাকিটুকু কলাপাতায় ঢেকে নিয়ে যায় বাড়িতে। অসুস্থ-বুভুক্ষু মা, কোলের ভাই কিংবা বোন সেখানে অপেক্ষা করছে, পায়রাবন্দের সকল মানুষের ক্ষুধার জ্বালা-যন্ত্রণা জঠরে নিয়ে। সবার জন্য খাদ্য, সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, এইসব গালভরা বুলি যখন উচ্চারিত হয় শাসকদের সভায়, রাজনীতিকদের সমাবেশে, উন্নয়নের নামে লক্ষকোটি টাকা ব্যয় করা সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে, যখন রেডিও-টেলিভিশন আর পত্রপত্রিকায় উন্নয়নের বান ডাকে, তখন পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ এমনই যে, অগুণতি ছবিরন, আধপেটা-খাওয়া, প্রায়-উলঙ্গ এবং কর্মক্লান্ত কিশোরীটি, অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বিছানো খড়ের ওপর ঘুমে বিভোর থাকে।[৯]

মোনাজাতউদ্দিন তুলে ধরেছেন গ্রামীণ অর্থনীতির কথা। শুধু সাদামাটা সংবাদ নয়, তিনি তুলে ধরেছেন একজন কৃষকের কৃষক থেকে ভূমিহীন মানুষে পরিণত হবার ভেতরের খবর–

> সমাজ ও পরিবার ভাঙ্গনের কারণে সেদিনের বড় কৃষক বর্গাচাষী এরা হয়েছে ভূমিহীন। এদের কারো কারো শুধু ঘর-ভিটেটুকু আছে; কিন্তু আবাদি জমি নেই । কারো আবার ভিটেটুকুও নিঃশেষ, বেচে খেয়েছে, এখন থাকে অন্যের জমির ওপর। দ্বিতীয় ভাগের লোকেরা দিনমজুর, কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, তবে মজুরি পায় খুব কম, ৮-১০ টাকা । আশ্বিন-কার্তিক মাসে মজুরির হার আরো নেমে আসে– ৫ থেকে ৬ টাকায়। এরা ঐ ছবিরনদের পিতা। খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত; কিন্তু নিজেরাই থাকে উপোস।
>
> গ্রামে গ্রামে আছে অসংখ্য বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা যুবতী কিংবা প্রৌঢ়া। এদের জীবনযাপনের ব্যাপারটি মানুষের মতো নয়। আশ্বিন-কার্তিকের মঙ্গার সময়ে এদের অনেকে প্রধান খাদ্য হিসেবে একটানা তিন-চারদিন কচুর মুড়ো সেদ্ধ খায়, শাকপাতা সেদ্ধ, কলার থোড় বা মোচা, মিষ্টিআলু, চালকুমড়ো, মিষ্টিকুমড়ো সেদ্ধ খায়, তারপর হয়তো কপালগুণে জোটে একটুখানি ভাত বা রুটি।[১০]

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে গ্রামীণ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক, শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্রামীণ কুসংস্কার, বহুবিবাহ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। গ্রাম সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন রংপুরের বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দ গ্রামটিকে।

গ্রাম সমাজে নারী, এই বিষয়ের ওপর একটা সিরিজ প্রতিবেদন লিখতে চাই। কিন্তু প্রয়োজন তথ্য-উপাত্ত। কোন গ্রামে কাজ করা যায়? বেছে নিলাম পায়রাবন্দ গ্রামটিকে। নারী জাগরণের বেগম রোকেয়া যে গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন শতবর্ষ পূর্বে, আজ সেখানে মেয়েদের অবস্থাটা কী? খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

> সাতবছর আগে, এক প্রত্যুষে রংপুর শহর থেকে পায়রাবন্দ গ্রামে। মাত্র ন'মাইল দূরের এলাকা, কেউ বলতে পারেন যে, রংপুর শহর থেকেই তো যাওয়া-আসা করা যেত। কিন্তু আমার ভাবনা ছিল অন্যরকম। সকাল আট-ন'টা থেকে রাত এগারো-বারোটা পর্যন্ত কাজ করব একটানা। ১৫/১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করবার পর শহরে ফেরা মুশকিল।
>
> সাতদিন ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও গ্রামের নর-নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের একটা পরিকল্পনা হাতে নিই। রাতে থাকবার জায়গা হয় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের পাকা ভবনের একটি কামরায়। ওদের অফিসের পাশে কর্মচারীদের বাস-ভবন, সেখানে একটা বাসা ফাঁকা ছিল, তল্পিতল্পা নিয়ে উঠে পড়ি। দুপুরে ও রাতের আহার পাশের বাসায়, কিছু টাকার বিনিময়ে।
>
> গ্রামীণ কোনো বিষয়ের ওপর যেভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি, তেমনটি পায়রাবন্দেও। প্রথমে গ্রামের যুবকদের সাথে ঘনিষ্ঠ হই, আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানাই। আমি একটা সার্ভে করতে চাই, আপনারা সাহায্য করতে পারবেন?
>
> পায়রাবন্দের যুবক রাজু আহমেদ। সেসময় বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদের অন্যতম সংগঠক। তার নেতৃত্বে ১০জন যুবক জরিপ কাজে নেমে পড়ে। তবে কাজ শুরুর আগে ওদের দিই একদিনের প্রশিক্ষণ, সরবরাহ করি কাগজ-কলম, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। 'গ্রাম সমাজে নারী' এই বিষয়ে একটা সিরিজ প্রতিবেদন রচনার জন্য কী কী তথ্য আমার দরকার, কীভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে, কথা বলার কৌশল হবে কীরকম, কীভাবে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে হবে সবকিছুই জানাই। নতুন কিছু করার সুযোগ পেয়ে যুবকেরা খুব খুশি। প্রশিক্ষণের পরদিনই নেমে পড়ে কাজে। এবং সাতদিনের মাথায় পায়রাবন্দের গ্রামগুলোর পুরো চিত্র, এমনকি অতি খুঁটিনাটি ব্যাপার বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে। গ্রামে কতজনের বাল্যবিবাহ হয়েছে, কত বিধবা, কতজন স্বামী পরিত্যক্তা, যৌতুকের শিকার হয়েছে কারা কীভাবে, সাধারণ জীবনযাপন, এমনকি গ্রামের মেয়েদের কতটি শাড়ি ব্লাউজ সায়া আছে, কতজন মাথায় দেবার তেল-সাবান পায়, সোনাদানা কতটুকু, সঞ্চয় কীরকম, কোন্ মহিলা তার স্বামীর হাতে কতবার প্রহৃত হয়েছে, এইসব তথ্যও পেয়ে যাই। সেসময় এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম ছিল না, নিজেরা করি, তখনো আসেনি। পায়রাবন্দে তাদের গ্রুপ গঠন, সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঞ্চয় প্রকল্প শুরু হয় 'সংবাদ'-এ ধারাবাহিক প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরে।[১১]

সুতরাং ঘরে বসে টেলিফোনে তথ্য নিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা নয়, মানুষের ভেতরের খবরের জন্য তিনি একেবারে ভেতরে ঢুকে যেতে পেরেছিলেন।

বহুবিবাহের বিষয়টি তাঁর লেখনীতে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছিল। 'পায়রা বন্দের শেকড় সংবাদ' গ্রন্থে। বহুবিবাহের রিপোর্ট করা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন–

> পায়রাবন্দের অনেক চরিত্র। এদের একজন হলেন মাকড়া বুড়ো। বয়স তার ৯৪ বছর। যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ সাত বছর আগে, ১৮টি স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি ১৯তম বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর বয়স মাত্র ১৪ বছর।
>
> মাকড়া বুড়ো গ্রামের যুবকদের কাছে 'বিয়েপাগলা নানা' হিসেবে পরিচিত। বয়সের ভারে কুঁজো, দাঁত নেই, কানে শোনেন কম, তবু শেষবয়সে এসে এক তরুণীকে বিয়ে করেছেন। মাকড়া বুড়ো বলেন, 'কি করব, বিয়ে করে বউ না আনলে এই বয়সে আমায় দেখবে কে?' আসলেই বউ নয়, শেষটিকে ঘরে তুলেছেন ধর্মসিদ্ধভাবে। ছেলে আছে মাকড়া বুড়োর, আছে মেয়ে-জামাই, তাদের আলাদা আলাদা সংসার। ওরা কেউ বুড়ো বাবাটাকে দেখে না।
>
> মেয়েটি, মাকড়া বুড়োর ঐ তরুণী স্ত্রী, সেও বেশ! কত স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে বুড়োর সাথে বিয়ের ব্যাপারটা! সে আমাকে পরিষ্কার বলল, 'আমি তো নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেছি!'

: তা-ই নাকি?
: হ্যাঁ, তা-ই। ...আমি এখন এই স্বামীর পদসেবা করব। এতে আমার সওয়াব হবে। তারপর কদিন বাদে বুড়ো মারা গেলে তার সম্পত্তির মালিক হব। তখন একটা যুবক ছেলেকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করব।

১৪ বছরের মেয়েটির এই স্পষ্ট ভাষণ শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকি। মাকড়া বুড়ো খ্যা খ্যা করে হাসেন। মেয়েটি বলে, 'বুড়োকে ভাত রেঁধে খাওয়াই, বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে পেচ্ছাব-পায়খানা করাই, মাথায় তেল ঘষে দেই, গোসল করাই, ঘুম পাড়াই, এসব কাজ করলে সওয়াব হবে না? আপনিই বলুন!' তারপর একটু থেমে সে বুড়োর দিকে ইশারা করে বলে, 'ঐ দেখেন বুড়োর অবস্থা! মরতে আর কদিন! তারপর আমি ভালো একটা ভাতারের হাত ধরে কোথাও চলে যাব। টাকাপয়সা আর চাষের জমি থাকলে অনেকেই বিয়ে করতে চাইবে আমাকে। না কী বলেন?'
আমি আর কী বলি?
আরেকজন সুরমা। তার সাথে প্রথম দেখা যখন, তখন সে ন'বছর বয়সের। বেগম রোকেয়া প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের এক পর্যায়ে সুরমার সাথে পরিচয়। শুনে অবাক হলাম, রোকেয়ার জন্মভিটা থেকে মাত্র একশ'গজ দূরে বাস করে যে মেয়েটি, নাবালিকা সুরমা, সে বিবাহিতা! সুরমা যখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ে, অর্থাৎ বয়স মাত্র পাঁচবছর, তখন এক কলেজ ছাত্রের সাথে ওর বিয়ে হয়। বিয়ের আগে ঐ ছেলেটি সুরমাদের বাসায় লজিং থাকত। একদিন সুরমার বাবা মা'র কী 'শখ' মাথায় চাপে, একাদশ শ্রেণিতে পড়ে এমন একটি ছেলের সাথে বিয়ে পড়িয়ে দেয় নিজের মেয়ের। গ্রামের কাজী সাহেব বিয়ে রেজিস্ট্রির কাগজপত্রে সুরমার বয়স লেখেন ১৬ বছর। আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, গণ্যমান্য, এমনকি এলাকার মোড়ল মাতবর জনপ্রতিনিধি এঁরা ঐ বিয়েতে এসেছিলেন, খাওয়া-দাওয়া করেছেন; কিন্তু বাধা দেননি, কেউ প্রশ্ন তোলেননি সুরমার বয়স নিয়ে, তার বাল্যবিবাহ নিয়ে।
সুরমার সাথে কথা হয়। বিয়ে মানে সে বোঝে না। ঐ বয়সে বোঝার কথাও নয়। ওদের ঘরের দেয়ালে ঝোলানো ছিল বর-কনের একটা ছবি। বিয়ের পর রংপুর শহরে গিয়ে একটা স্টুডিও থেকে তোলা। ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিতে কলেজ ছাত্রটি একটি চেয়ারে বসে আছে, তার কোলের ওপর পাঁচবছর বয়সের সুরমা, ফ্রকপরা, চোখে মোটা দাগের কাজল, কপালে বড় টিপ, দাঁত বের করে হাসছে।
আমি সুরমাকে জিজ্ঞেস করলাম– তুমি কি জানো ঐ ছেলেটা, ঐ যে যার কোলে বসে আছ, সে তোমার স্বামী? জানো না ওর সাথে তোমার বিয়ে হয়েছে?
সুরমা তার ছোট্ট হাতের মুঠোয় একটা কিল পাকাল। আমার দিকে দূর থেকেই তা ছুড়ে দিয়ে বলল– দূর! কী যে আপনি অসভ্য কথা বলেন![১২]

তাঁর লেখনীতে দেখা যায়, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ দুইই ঘটেছে অভাবের কারণে। একদিকে ১৪ বছর বয়সি কিশোরী ৯৪ বছর বয়সি বৃদ্ধকে বিয়ে করেছে অভাব থেকে অপরদিকে পাঁচবছর বয়সি সুরমা বিয়ে হয়েছে শুধুমাত্র সুখের বশে নয়, এর পেছনের খবর হলো প্রবল অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। মেয়ের বয়স বেশি হলে যৌতুকের টাকা বেশি লাগবে। সংবাদ লিখেই থামেননি মোনাজাতউদ্দিন। তিনি বেশ কিছুদিন পর তার খবরের ফলোআপও করেছেন। তিনি সংবাদের একটা স্থায়ী রূপ দিতে চেয়েছেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে।

'৯২ সালের মার্চে আবার পায়রাবন্দে যাই। শুনি, মাকড়া বুড়ো মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রীকে দিয়ে গিয়েছিলেন বিঘাখানেক জমি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তার দখল পায়নি। বুড়োর মৃত্যুর পরদিনই তার ক'জন ছেলে এসে মেয়েটিকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বলে, এতদিন বুড়োর খেয়েছিস পরেছিস, আবার জমি চাস? যা, ভাগ! নইলে জানে মেরে দেব।
মাকড়া বুড়োর বিধবা স্ত্রীটি নাকি খুব কেঁদেছিল। লাভ হয়নি। গ্রামে এর-ওর কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু কেউ তা শোনেনি। পরে, একদিন সে গ্রামছাড়া হয়ে যায়। এখন সে কোথায় আছে, কেউ জানে না।
তবে সুরমা গ্রামেই আছে। ঐ ছেলেটি, যার সাথে বিয়ে হয়েছিল, পাঁচবছর আগে একদিন গ্রাম ছাড়ে, চলে যায় নীলফামারীর ডোমারে, আর আসেনি। পরে সুরমার বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেয় যে, ছেলের কাছে তালাকের কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবে। তা-ই করেছে।

সুরমা পড়াশোনায় ভালো, স্বভাবে শান্তশিষ্ট। তবে হঠাৎ কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এখন বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই কান্নাজুড়ে দেয়। সে বলে, 'আমার বাবা-মা ভুল করেছে, সেজন্য আমি ভুগতে রাজি নই। আমি এখন আমার ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছি। আমি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চাই, আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

সুরমা লেখাপড়া শেষ করে কোনো একটা চাকুরি করতে চায়, থাকতে চায় কোনো শহরে।[১৩]

সুরমার মতো মেয়েদের শিশু বয়সে বিয়ে হবার কারণ অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। আর এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে ৯৪ বছর বয়সি মাকড়া বুড়োকে বিয়ে করতে হয়েছিল ১৪ বছরের কিশোরীকে। এসব অসংখ্য বাল্যবিবাহের ঘটনা নিয়ে তিনি রিপোর্ট করেছেন। তিনি বলেছেন–

বেগম রোকেয়ার জন্মস্থানে এমনি অসংখ্য বাল্যবিবাহের ঘটনা রয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে, বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র ৭ মাস বয়সের মেয়ের সাথে হাঁটিহাঁটি পা পা করা ছেলের। যেমন ইসলামপুর গ্রামের ক্ষেতমজুর বাদশা মিয়ার মেয়ে ইসমত আরা, বর্তমান বয়স প্রায় ৪ বছর, তার বিয়ে হয় সাড়ে ৭ মাস বয়সে, একই গ্রামের আব্দুল কাদের-সাহিদা খাতুন দম্পতির পুত্রসন্তান মুকুল মিয়ার সাথে।

নানা কারণে হচ্ছে এ বাল্যবিবাহগুলো। কোনো পিতা-মাতা ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে নিতান্তই শখের বশে, কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ে হয়েছে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের পিতার বন্ধুত্ব পাকা করবার জন্য, কেউবা বিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর আগে বউমা কিংবা জামাই বাবাজির মুখদর্শন করে যাবার জন্য। অল্প বয়সে বিয়ে হলে অল্প যৌতুকে মেয়ে বিদায় করা যাবে, এ ধরনের মানসিকতাও কারো কারো ক্ষেত্রে কাজ করেছে। তবে, মূল কথা হলো, প্রতিটি বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে রয়েছে পিতা-মাতার অসচেতনতা। এই পায়রাবন্দে এখনও অনেক বাবা-মা মনে করেন যে, অল্প বয়সে ছেলে বা মেয়ের বিয়ে দিলে আল্লায় আলাদা কিছু সওয়াব দেয়!

যেসব পরিবারে বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেগুলোর পরিবার-প্রধান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরক্ষর, অসচেতন। রংপুর শহর থেকে মাত্র ন'মাইল দূর হলেও পায়রাবন্দ এলাকার বহু পিতা-মাতা আজও জানে না– দেশে বাল্যবিবাহ আইনসম্মত নয়, যৌতুকের আদান-প্রদান বেআইনি। এমনকি, বালক-বালিকার বিয়ে যাঁরা পড়িয়েছেন কিংবা

যে কাজী সাহেব বিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন, তারাও বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞাত, কেউ আবার অর্থলোভী। মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকার বিনিময়ে বিয়ে পড়িয়েছেন তাঁরা, ৬ বছর বয়সকে কাগজপত্রে দেখিয়েছেন ১৬ বছর, ছেলের বয়স দেখিয়েছেন ২৫ থেকে ২৮ বছর। বিরাট জালিয়াতির ঘটনা, অথচ এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েননি। পায়রাবন্দের বিয়ে পড়ানোর মৌলবি সাহেবগণ এবং সরকারস্বীকৃত কাজী সাহেব আইনের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত ও শাস্তি পাওয়ার বদলে গ্রামের ছোট-বড় সকলের শান্তি কামনা নিয়ে ভালোই আছেন।

বাল্যবিবাহের ব্যাপার নিয়ে মৌলবি আব্দুল আলিম এবং কাজী গোলজার হোসেনের সাথে পরে আমার কথা হয়। দু'জনের কেউ-ই বাল্যবিবাহ পড়িয়েছেন বা রেজিস্ট্রি করিয়েছেন একথা কোনোমতেই স্বীকার করলেন না। আমি যখন বর-কনের নামধাম উল্লেখ করলাম তখন হাসিমুখে তা উড়িয়ে দিলেন তাঁরা, বললেন, 'এ বিয়ে তো আমি পড়াইনি, অমুক মৌলবি পড়িয়েছে।' কাজী সাহেবেরও একই রকম কথা। কাজী মোহাম্মদ গোলজার হোসেন, বাড়ি ইসলামপুর গ্রামে, ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়াশোনা, প্রায় ন'বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত, এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচশ' বিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। বিয়ে পড়িয়েছেন আনুমানিক দু'শ'। তিনি স্রেফ অস্বীকার করে বসলেন যে, পাঁচশ'র মধ্যে একটিও বাল্যবিবাহ রেজিস্ট্রি তিনি করেননি। আরেক মৌলবি সাহেব পায়রাবন্দে নয়, পার্শ্ববর্তী ভাংনি ইউনিয়নে বাড়ি, বয়স প্রায় ৪৫ বছর, পায়রাবন্দ সালেকিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক, স্থানীয় মসজিদে ইমামতিও করেন–ইনি ৫০-১০০ টাকার বিনিময়ে কমপক্ষে দু'ডজন বিয়ে পড়িয়েছেন পায়রাবন্দের বিভিন্ন গ্রামে। কিন্তু কোনোক্রমেই তা স্বীকার করলেন না। 'খোদার কসম, নাবালকের একটি বিয়েও আমি পড়াইনি' বললেন তিনি। নাম উল্লেখ করলেন অপর একজন মৌলবির। সব বাল্যবিবাহ নাকি সেই মৌলবিই পড়ায়।

মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, নাদুস-নুদুস চেহারার লোকটি কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছে। শরীর কাঁপছে ভয়ে। কিন্তু তার মুখ থেকে মিথ্যা কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি আশেপাশের গ্রামের কয়েকটি ছেলেমেয়ের নাম উল্লেখ করি যাদের বিয়ে এই মৌলবি সাহেব পড়িয়েছেন। তারপর বলি, 'আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন, এক্ষুনি প্রমাণ হয়ে যাবে। চলেন ওদের বাড়ি যাই। আপনিই যে বিয়ে পড়িয়েছেন তা ওরা নিজেই আমার কাছে বলেছে। আর এখন আপনি তা অস্বীকার করছেন?'
কথা শেষ হতে না হতেই লাফিয়ে সাইকেলে চেপে বসেন মৌলবি সাহেব। জোর পায়ে প্যাডেলে চাপ দেন। তাঁকে বলতে শুনি, 'আমার এখন একটু তাড়া আছে, পরে আপনার সাথে দেখা করব।'
আমার ইচ্ছা হলো ছুটে গিয়ে তাঁর সাইকেল আটকাই। লোকটাকে নিয়ে যাই সর্বনাশের ঘটনাস্থলে। বুঝতে পেরে বাধা দিল আমার পায়রাবন্দের সঙ্গী ক'জন যুবক। মৌলবি সাহেবকে এই মুহূর্তে এভাবে খেপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। তিনি বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য, তাছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেলে হৈচৈ হবে, গোলমাল বাধতে পারে। এতে করে আমাদের পক্ষে গ্রাম অনুসন্ধান করা হয়ে ওঠবে মুশকিল।
আমি রাগ দমন করি। ঠিকই বলেছে আমার সাহায্যকারীরা। আমাকে বেশ কদিন গ্রামে থাকতে হবে, সে কারণে কাউকে খেপিয়ে তোলা কোনোমতেই ঠিক হবে না।
পায়রাবন্দের বাল্যবিবাহের এই যে সংখ্যাধিক্য, তা নিয়ে গত ১৬/১৭ বছরে বহু সচিত্র প্রতিবেদন লিখেছি 'সংবাদ'-এ। সেখানে বর-কনের নামধাম দিয়েছি, ছবি দিয়েছি, মূলত কী কারণে বা কাদের কারণে এসব বাল্যবিবাহ হচ্ছে তা-ও বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। কিছু প্রতিবেদন পাঠকদের মনে সাড়া জাগিয়েছে, পরবর্তীতে বিদেশি পত্রপত্রিকায় অনূদিত হয়ে ছাপা হয়েছে বাল্যবিবাহের কিছু প্রতিবেদন আর ছবি। বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক সম্পাদকীয় কিংবা উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে। ঢাকায় সভা-সমাবেশ সেমিনারে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে বাল্যবিবাহের বিষয়টি। পরবর্তীতে সরকার থেকে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বেঁধে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বেগম রোকেয়ার জন্মস্থান পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহের যে ঢল, তা রোধ হয়নি।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তি, যুবকগণ, কেউ বাধা দেননি বরং দেখা যায় অনেকে তাঁরা ঐসব বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন, খানাপিনা করেছেন। মাত্র ক'মাইল দূরে মিঠাপুকুর প্রশাসন এ ব্যাপারে বোবা-কালার ভূমিকায় থেকেছেন। গ্রামীণ ব্যাংক দীর্ঘদিন থেকে পায়রাবন্দের গ্রামে ঋণদান কার্যক্রম চালাচ্ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারেও কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। নিজেরা করি'র মতো একটি এনজিও ৬/৭ বছর ধরে এখানে তৎপর। তারা ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক এবং দুস্থ মাতাদের নিয়ে বহ গ্রুপ গঠন করেছে, সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে, গ্রুপের মাধ্যমে সচেতন করে তোলার ব্যাপারেও বেশ খানিকটা এগিয়ে। কিন্তু এদের চারপাশে এই যে, এত বাল্যবিবাহের ঘটনা, তা তারা দেখছে না কেন? প্রতিরোধ করছে না কেন? বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপটি যদি দূর করা না যায়, তাহলে আর গণসচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সফলতা আসবে কী করে?
বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি নিয়ে নিজেরা করি'র কয়েকজন মাঠকর্মীর সাথে আলাপ করলাম। কথাবার্তায় মনে হলো এ সম্পর্কে এদের অধিকাংশই তেমন কিছু জানেন না। এনজিও'র স্থানীয় অফিস থেকে দু'-তিনশ' গজ দূরের বাড়িতে লাকি নামের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে মাত্র ৬ বছর বয়সে, বরের বয়স ১৩ বছর। লাকির বাবার নাম হাফিজুর রহমান, পেশায় একজন ঘর-নির্মাণ মিস্ত্রি। মূলত শখের কারণে এ বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছে। মেয়ে এবং ছেলের বাবা দু'জনে বন্ধু, সেই বন্ধুত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের শখের উদ্রেক হয়। ১০ হাজার ১ টাকা দেনমোহরানায় বিয়ে পড়ান মৌলবি আব্দুল আলিম, একশ' টাকা নিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন কাজী সাহেব।
শুনে অবাক হলাম যে, এ বাল্যবিবাহের ব্যাপারটি এনজিও কর্মীরা নাকি জানেন না!
পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উপায়টি কিন্তু খুব কঠিন কিছু নয়। গ্রামে যেসব মৌলবি সাহেব বিয়ে পড়ান কিংবা রেজিস্ট্রি করেন যে কাজী সাহেব, তাঁদের ডেকে একত্র করে যদি মানা করে দেয়া যায়, একান্তই অনুরোধ রক্ষা না করলে যদি একজনকে অন্তত তুলে দেয়া যায় আইনের হাতে, তাহলে ভালো ফল লাভ হতে পারে। কোনো বাবা-মা পায়রাবন্দের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে তো তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেবেন না! এ প্রস্তাবটি ব্যক্তিগতভাবে আমি রংপুর এবং মিঠাপুকুর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দিয়েছি। কিন্তু প্রথম প্রথম উৎসাহ দেখালেও পরে তারা ঝিমিয়ে পড়েছেন। 'ফাইলওয়ার্ক' নিয়ে তারা এতই ব্যস্ত যে পায়রাবন্দের কোথায় কার বাল্যবিবাহ হচ্ছে তা নিয়ে সময় নষ্ট করার সময় তাঁদের নেই। আমাদের প্রশাসনের অবস্থাটাই এরকম। শেকড়ে ঘুণ, নানা অব্যবস্থা-অনিয়ম, বিভিন্নভাবে সামাজিক অবক্ষয় ঘটছে, আর কর্তাদের অধিকাংশই রাজধানী, জেলা-শহর কিংবা থানা-সদরের পাকা-সুসজ্জিত কামরায় বসে ফাইলওয়ার্ক করে যাচ্ছেন। দিনের পর দিন তাঁদের মাথা ঘামছে দেশের বড় বড়

সমস্যা নিয়ে। পায়রাবন্দের সুরমা, কোহিনুর, ইসমত আরা কিংবা লাকির ভাগ্যে কী ঘটল আর না-ঘটল, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। অথচ, বক্তৃতায় হামেশাই বুলি কপচানো হয়; প্রশাসন নাকি গ্রামের জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে![১৪]

মোনাজাতউদ্দিনের রিপোর্টে বাল্যবিবাহের ফলে সৃষ্ট যে সংকট তার রূপ পুরোটাই ফুটে উঠেছে। আর এ বাল্যবিবাহ, সরকার একটু সচেতন হলেই বন্ধ করা সম্ভব। তাঁর লেখা থেকেই স্পষ্টতই তা বোঝা যায়। সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সচেতনতার কথা এবং মৌলবিদের মাধ্যমে দেশে বাল্যবিবাহের মতো ভয়ানক ব্যাধিকে দূর করা সম্ভব; তিনি এভাবেই চিন্তা করেছেন–

পায়রাবন্দের ২১টি গ্রামে অসংখ্য বাল্যবিবাহের ঘটনা উদঘাটনের পর নিজের কাছেই খারাপ লাগে। আমার যুবক-বন্ধুদের সাথে কথা বলি, আমরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু একটা করতে পারি কি না! কী করে বাল্যবিবাহের ঢল রোধ করা যায়।

সন্ধ্যার পর প্রাইমারি স্কুলের মাঠে যুবকদের এক সভা ডাকি। উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ রোধে গ্রামের যুবশক্তিকে ব্যবহার করা যায় কিনা।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রোকেয়া ব্রিগেড গঠিত হয়। এর কোনো কমিটি থাকবে না, গঠনতন্ত্র প্রয়োজন নেই, দরকার নেই অফিস ঘরের। শুধু কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য যুবকরা স্কুলের মাঠে কিংবা হাটের চায়ের দোকানে মাঝে-মাঝে মিলিত হবে।

প্রতিটি যুবকের জন্য কর্মএলাকা ভাগ করে দেয়া হয়। নিজ নিজ এলাকায় যাতে একটিও বাল্যবিবাহের ঘটনা না ঘটে, সে ব্যাপারে তারা কড়া নজর রাখবে। কারো বাড়ি থেকে বিয়ের খবর পেলে প্রথমে বাবা-মাকে বোঝাবে তারা, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জ্ঞাত করবে, প্রচলিত আইন-কানুন জানাবে। এতে কাজ না হলে বল প্রয়োগ করে বিয়েতে বাধা দেবে তারা। প্রয়োজন হলে মিঠাপুকুরে গিয়ে ছেলেমেয়ের বাবা-মা এবং বিয়ের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে। সিদ্ধান্ত হয়: প্রতিটি বিগ্রেড সদস্যদের অধীনে থাকবে একাধিক শিশু-কিশোর ইনফরমার। গ্রামের কোন বাড়িতে কার বিয়ে হচ্ছে, সে খবরটি এদের কাছে থেকে জানা সম্ভব দ্রুত।

টুকিটাকি খরচপত্র চালানোর জন্য তাৎক্ষণিক একটি তহবিল গঠিত হয়। কেউ দেয় নগদ টাকা, কেউ দেয় আধমণ থেকে একমণ ধান। ব্রিগেড পরিচালনার দায়িত্ব পায় রাজু আহমেদ আর জাহাঙ্গীর। অন্যান্য সদস্যরা হলো: নুরুল ইসলাম, ফয়জার রহমান, সাইফুল, তাজুল, মুকুল, দুলাল, মকবুল, সাত্তার, রফিকুল, গোলাম আজম, শাহীন, আলম, মজনু, হারুন, আনিসুর। পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকে অ্যাডভোকেট নিকুঞ্জচন্দ্র বর্মণ।

'রোকেয়া ব্রিগেড' গঠিত হবার পর অন্ধকার স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই হাতের ওপর হাত রাখে, উচ্চারণ করে শপথবাক্য: আমরা আমাদের নিজ নিজ কর্মএলাকায় আর একটিও বাল্যবিবাহ হতে দেব না।

আসলে, এই কার্যক্রমের ব্যাপারটি ছিল পরীক্ষামূলক। দেখা যাক না, কী ধরনের ফল পাওয়া যায়।

ব্রিগেড গঠিত হয় '৯২ এর মার্চে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যখন এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি তখন খবর পেলাম: পায়রাবন্দে বাল্যবিবাহের হার আগের চেয়ে বেশ কমে গেছে। ব্রিগেড সদস্যরা সবাই না হলেও অধিকাংশই এখনো তৎপর। কোনো বাড়িতে বাল্যবিবাহ হচ্ছে এমন খবর পেলেই সেখানে বাধা দিতে ছুটে যায় তারা।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, ক্ষমা করবেন। পায়রাবন্দের বাল্যবিবাহের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত তৎপরতার প্রসঙ্গ এসে গেল। কিন্তু 'রোকেয়া ব্রিগেড' তথা যুবকদের তৎপরতার কথা না জানিয়ে পারলাম না। '৯২ সালের প্রথমভাগে পায়রাবন্দ ইউনিয়নের ২১টি মৌজায় বাল্যবিবাহের যে তথ্যচিত্র বছরের শেষভাগে এসে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখা যাবে, বাল্যবিবাহের হার কয়েক মাসের ব্যবধানে অনেকটা কমে এসেছে।

কিন্তু এর নেপথ্য কারণ কী? ব্যাপারটি জানা থাকা দরকার। অন্তত নিজেদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐ গ্রামের যুবকদের অবদান থাকুক লিপিবদ্ধ।[১৫]

যৌতুক প্রতিরোধে কাজ করেছেন মোনাজাতউদ্দিন। নিজ উদ্যোগে জরিপ চালিয়ে যৌতুক বিষয়ে নিউজ করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গিয়ে মানুষের সঙ্গে বা জড়িত অথবা ঘটনা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে নিউজ করেন। কিন্তু মোনাজাতউদ্দিনের কৌশল ছিল আলাদা। তিনি একটা নিউজ এভাবে করেননি যে, নিউজ শুধুমাত্র পাঠকের কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবে তারপর শেষ হয়ে যাবে, তার স্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলবে না, এত অল্প গুরুত্ব তার কাছে বহন করবে না। তিনি জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সাংবাদিকতা করেছেন।

যৌতুক দেয়া-নেয়া ছাড়া বিয়ে হয়েছে বা হচ্ছে, এমনটি পায়রাবন্দ এলাকায় দেখা যায় খুবই কম। সাত বছর আগে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে যে জরিপটি চালিয়েছিলাম তাতে দেখা গিয়েছিল: প্রতি ১শ' বিয়ের মধ্যে ১শ'ই সম্পন্ন হয়েছে যৌতুক দেয়া-নেয়ার মধ্যদিয়ে। আর, '৯২-এর জরিপ-তথ্য হলো: শতকরা ৯৮ ভাগ বিয়েতে যৌতুক আদান-প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, সাত বছরের ব্যবধানে যৌতুক পরিস্থিতির তেমন হেরফের হয়নি। অনেকেই বলেন, শহরের মতো বাংলাদেশের গ্রামগুলোতেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সঠিক বটে। কিন্তু না, যৌতুকের অভিশাপ এখনো প্রতিটি পরিবারের কাঁধে সিন্দাবাদের সেই বুড়োর মতো চেপে বসে আছে। পায়রাবন্দে এই চিত্র আরো প্রকট। যৌতুকবিরোধী আইন বা এ সম্পর্কিত কোনোরকম মেসেজ এখানকার পরিবারপ্রধানরা এখনো পাননি।

যৌতুক দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে কারণ আছে। যারা অবস্থাপন্ন, তারা এ ধরনের মনে করেন যে, যৌতুকের আদান-প্রদান সামাজিক মান-মর্যাদার ব্যাপার। মেয়ের বিয়েতে তাই তাঁরা যেমন যৌতুকের টাকা গুণে দেন, তেমনি আবার ছেলের বিয়েতে আদায়ও করে থাকেন। এটা একটা ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। আর গরিবঘরে যৌতুকের ব্যাপারটি যেন বাধ্যতামূলক কোনোকিছু। একটু সচ্ছল পরিবারের বিয়েতে নগদ টাকা ছাড়াও দেয়া-নেয়া হয় আবাদি জমি, হালের বলদ, টিন, সাইকেল, ঘড়ি, রেডিও। গরিবঘরে নগদ টাকার সাথে দিতে হয় কাপড়চোপড়, ছাতা, টুপি এসব। কেউ আবার শ্বশুরের কাছে রিকশা কিংবা সাইকেলের বায়না ধরে। দিতে না পারলে স্ত্রীকে ফেলে রেখে যায় বাপের বাড়িতে। বিবাহিতা মেয়েটি গরিব পিতার কাঁধে দিনের পর দিন বোঝা হয়ে থাকে, তারই অন্ন খায়, আর জামাই বাবাজি মাঝে-মধ্যে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে জৈবিক প্রয়োজন মিটিয়ে যায়। যৌতুকের দাবি মেটাতে না পেরে বছরের পর বছর বাপের বাড়িতে থেকেছে এবং স্বামীর ঔরসে একাধিক সন্তান জন্ম দিয়েছে এমন হতভাগ্য মহিলার ঘটনাও পায়রাবন্দের গ্রামে রয়েছে। পায়রাবন্দে রয়েছে যৌতুকের দাবির টাকা না পাওয়ায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে শালীকে নিয়ে যাবার মতো ঘটনাও।

ইসলামপুর গ্রামের এক ক্ষুদ্র কৃষক ধজীর মিয়া, তার মেয়ের নাম রীনা বেগম। নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং একখানা সাইকেল যৌতুক দিতে হবে এই শর্তে ব্যবসায়ী খাতের আলীর সাথে রীনা বেগমের বিয়ে হয়। বিয়ে পড়ানোর সময়

নগদ দেয়া হয় পাঁচশ' টাকা। বলা হয়, বাকি টাকা এবং সাইকেল পরে দেয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল মার খাওয়া, মহাজনের ঋণ ও সুদের বোঝা– এসব কারণে ধজীর মিয়া অবশিষ্ট টাকা কিংবা সাইকেল কিছুই দিতে পারে না। অথচ যৌতুকের দাবি ছাড়তে খাতের আলী নারাজ। টাকা ও সাইকেলের জন্য অনবরত চাপ দিতে থাকে সে। চলে ঝগড়া, ফ্যাসাদ, মারামারি। শেষে, একদিন, খাতের আলী তার স্ত্রী রীনা বেগমকে ফেলে রেখে তার ছোট বোন অর্থাৎ শালী রানী বেগমকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে চলে যায়। তাকে বিয়ে করে অন্য গ্রামে নিয়ে গিয়ে। খাতের আলী রীনা বেগমকে তালাক দেয়নি। এখনো সে পিতৃগৃহে পড়ে রয়েছে, অবশ্য ক্ষেতমজুরি করে নিজের পেট চালায়। যৌতুক না পাওয়ায় স্ত্রীকে ফেলে রেখে তার ছোট বোনকে নিয়ে যাবার ঘটনাটি নালিশ আকারে পাড়াপ্রতিবেশীকে জানিয়েছিল রীনা বেগম। অভিযোগ করেছিল গ্রামের মোড়ল-মাতবর ও মওলানা সাহেবের কাছে। কিন্তু তাতে কোনো ফললাভ হয়নি। মওলানা সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন যে, সে (খাতের আলী) যখন শালীকে বিয়ে করেছে তখন আপনাআপনি তালাক হয়ে গেছে রীনা বেগমের। সেক্ষেত্রে অভিযোগ উত্থাপনের অধিকার তার নেই।

এ এক আশ্চর্য ফতোয়া। তবু তা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছে রীনা বেগম। অবশ্য এই মেনে নেয়া ছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। মিঠাপুকুর আদালতে গিয়ে মামলা করার সুযোগ ছিল; কিন্তু টাকা পাবে কোথায়? দ্বিতীয়ত, ছোট বোনের সংসার সে ভাঙ্গতে চায়নি।

রীনা বেগমের এই কাহিনী শোনার পর ইচ্ছে হয় তার সাথে দেখা করি। নিশ্চিত হতে যাই যে, আসলে রীনা বেগমের বোন রানী বেগমকে খাতের আলী জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিতে নিয়ে গেছে? নাকি রানীর সাথে তার ছিল পূর্ব কোনো প্রণয় সম্পর্ক? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের বহু ঘটনা রয়েছে যে, স্ত্রীকে ফেলে রেখে সুন্দরী যুবতী শ্যালিকাকে বিয়ে করেছে কেউ। শুধু গ্রামে নয়, শহর-সমাজেও এমনটি ঘটে থাকে।

রীনা বেগমের সাথে দেখা করবার জন্য ইসলামপুর গ্রামে যাই আমি আর আমার সাহায্যকারী তাজুল ইসলাম। তাজুল ওদের বাড়িটি চেনে।

রীনাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সে কাজ করতে গেছে মাঠে। অতঃপর আমরা বহুদূর পথ হেঁটে সেখানেই হাজির। একদল মেয়ের সাথে রীনাও এক জোতদারের জমিতে আলু তোলার কাজ করছিল। প্রথমে সে দারুণ ঘাবড়ে যায়, পরে আলাপের কৌশলে হয়ে ওঠে সহজ। ক্ষেতের আইলের ধারে বসে আলাপ হয় দীর্ঘক্ষণ।

লম্বাটে চেহারা, কালোবরন, ভাঙ্গা শরীর, রঙ জ্বলে যাওয়া একটি ছেঁড়া সবুজ শাড়ি পরনে রীনার। বয়স ২০-২২ বছর। প্রাথমিক সংকোচ থাকলেও পরে তা টুটে গেল, গড়গড় করে বলে গেল তার বিয়ের কাহিনী, 'স্বামীর' নির্যাতন, যৌতুকের টাকা আর সাইকেল কী কারণে ওর বাবা দিতে পারেনি, সেকথা। সে জানাল : ছোটবোন রানী বেগমের সাথে খাতের আলীর কোনো প্রণয় সম্পর্ক ছিল না। গায়ের জোরেই সে রানীকে নিয়ে গেছে। পরে জানা গেছে, 'জানে মেরে ফেলবে' এই ভয় দেখিয়ে বিয়েতে কবুল করিয়েছে।

রীনা বেগমের সাথে যখন আমাদের আলাপ হয় তখন ছিল চড়া রোদ, ধূলোর ঝাপটা। লক্ষ্য করি, রীনার গভীর বেদনামাখা চোখ দু'টি বারবার ভিজে ওঠছে। শাড়ির ছেঁড়া আঁচল দিয়ে ঘনঘন চোখ মুছছে সে। এ সময় খুব অসহায় বোধ করতে থাকি। রীনা বেগমের নীরব কান্না সংক্রমিত হয় আমার গলার নিচে, একটা বিচিত্র শিরশির অনুভূতির ভেতর। গ্রামের শেকড়-সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে এই যে, কান্নার সংবাদ খুঁজে পাই, তা আমি কাকে জানাব?

যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় একে একে তিনবার তিন স্বামীর কাছ থেকে তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে, এমন ঘটনাও পায়রাবন্দের গ্রামে রয়েছে। যেমন জোহরার কথা এখানে বলা যায়।

খোর্দ মুরাদপুর গ্রামে তার বাড়ি। পিতা দিনমজুর, দৈনিক আয় ৬-৮ টাকা। পরিবারের সদস্য ৫, উপোস-কাপোস নিত্যসঙ্গী। জোহরার বয়স এখন ২২ বছর। ৮ বছর বয়সে প্রথম তার বিয়ে হয়। যৌতুকের দাবি ছিল ৩শ' টাকা। দিতে পারেনি বলে তালাক হয়েছে। ১৫ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে হলো, যৌতুক দেয়ার কথা ছিল ৫শ' টাকা, মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থে জোহরার বাবা জায়েদ আলী দিতে পেরেছিল মাত্র ৫০ টাকা; কিন্তু বাকি সাড়ে ৪শ' টাকা পরিশোধের ব্যর্থতায় আবার সে পিতৃগৃহে ফিরে এলো, হলো তালাকপ্রাপ্তা। ২১ বছর বয়সে তৃতীয়বারের মতো বিয়ে হয় তার, দিনমজুর আক্তার আলীর সাথে। যেহেতু জোহরা একাধিকবার তালাকপ্রাপ্তা সে কারণে আক্তারের যৌতুকের দাবি বেশি ছিল। নগদ ৫শ' টাকা ছাড়াও দিতে হবে একটি ছাগল, আর মেয়ে-জামাই বসবাসের জন্য একটা ঘর তুলে দিতে হবে।

বাড়িতে একটি ছাগল ছিল, জোহরাকে নিয়ে যাবার সাথে সাথে আক্তার সেটিও নিয়ে যায়। কিন্তু টাকা এবং ঘর পায়নি। '৯২-এর মার্চে যখন পায়রাবন্দে যাই, শুনতে পেলাম দিনদশেক আগে সে আবার তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এখন সে পিতৃগৃহে।

জোতষষ্টি গ্রামের জাহেদার কাহিনী একটু অন্যরকম। দীর্ঘ চারবছর 'ভালোবাসা' করার পর, ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় মেয়েটির। পাড়াপ্রতিবেশী বলেন, বিয়ের আগে ওদের দু'জনার সম্পর্ক ছিল নাকি খুবই 'গভীর'। বিয়ে না হলে মেয়েটি আত্মহত্যা করবে এমন কথাও নাকি বলত।

কিন্তু বিয়ের পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল।

বিয়ের মজলিশে ছেলেপক্ষ যে নগদ টাকা এবং সাইকেল দাবি করেছিল কয়েকদিন ঘর-সংসার করতে না করতেই তা দাবি করে বসল ছেলের মা। সাতদিনের মধ্যে টাকা আর সাইকেল চাই, নইলে জাহেদাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সময়সীমা শুনে মেয়ের অভিভাবকরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। বিয়ের সময় কথা দেয়া হয়েছিল বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাকা-সাইকেল দেয়া ছিল তাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু জাহেদা ব্যাপারটি প্রথমদিকে তেমন পাত্তা দেয়নি। যৌতুক দাবি করছে শাশুড়ি, স্বামী তো নয়। আর দীর্ঘদিন প্রেম করে বিয়ে হয়েছে তাদের। কিন্তু ভুল ধারণা করেছিল জাহেদা স্বামী সম্পর্কে। কেননা, একদিন স্বামীটিই যৌতুকের টাকা-সাইকেল চেয়ে বসল। তার বক্তব্য এ ধরনের: 'আমি তো কোনোকিছু চাই না, চাচ্ছে আমার মা।' যেন আকাশ থেকে পড়ল জাহেদা।

আকাশ থেকে পড়াও বুঝি ভালো ছিল। কিন্তু না, তা নয়। প্রথমে চলল বকাঝকা, বাপ-মা তুলে গালাগালি। জাহেদা বলল, 'আমাকে যা বলবার বলো; কিন্তু বাবা-মাকে টানো কেন?' এই প্রতিবাদের জবাবে পেল সে প্রেমিক-স্বামীর চড়-থাপ্পড়-লাথি। এভাবে, ১৫/১৬ দফায় মার খাওয়া আর শাশুড়ির নিত্যদিনের গঞ্জনার অবসান ঘটল স্বামীর তিন তালাক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। বাবা তো নেই মায়ের কাছে চলে গেল জাহেদা। এখনো সেখানেই রয়েছে।

যৌতুক পরিশোধ করলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সবক্ষেত্রে তা নয়। আছিয়ার বাবা রসুল মিয়া তো তার একমাত্র আদরের মেয়ের বিয়েতে অনেক কিছুই দিয়েছিল। জামাই পেয়েছিল নগদ সাতহাজার টাকা, চার ভরি সোনা, টিন, ঘড়ি, আংটি, একহাজার টাকার কাপড়চোপড়। তবু সংসার টিকল না। তালাক না দিলেও স্বামী হামিদার রহমান বহুদিন থেকে নিরুদ্দেশ। কিছুদিন আগে লোকমুখে খবর মিলেছে যে, হামিদার ঢাকায় আছে সেখানে আরেকটি বিয়ে করেছে।

৮ বছর বয়সে আছিয়ার প্রথম বিয়ে হয়। রসুল মিয়া নাকি ভেবেছিলেন স্বামীর বাড়িতে থাকলে তার মেয়েটি তাড়াতাড়ি গৃহকর্মে সুনিপুণা হয়ে ওঠবে। কিন্তু বাল্যবিবাহ টেকেনি। মেয়ে কোনোমতেই শ্বশুর বাড়িতে থাকতে নারাজ। স্বামীকে নাকি ভয় লাগত।

'মেয়েটা বেয়াড়া, এর দ্বারা স্বামীর ঘর করা হবে না'– এই অভিযোগে তালাকপ্রাপ্তা হলো অবুঝ-অবোধ কিশোরী আছিয়া। থাকল নিজের বাড়িতেই। বয়স যখন ১৮ বছর, অর্থাৎ যৌবনবতী, তখন দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে হলো হামিদারের সাথে। ছেলেটি নাকি চাকুরি করে, আয়-উপার্জন ভালো। চার একর জমির মালিক রসুল মিয়া বেচে দিল কিছু জমি, বিয়ে পড়ানোর পরপরই মিটিয়ে দিল জামাইয়ের যৌতুকের যাবতীয় দাবি। কিন্তু কিছুদিন বাদে জানা গেল: ছেলে সম্পর্কে ওরা যা জেনেছিল তা সত্য নয়। কোনো চাকুরি নেই, সম্পূর্ণ বেকার সে। এবং তার স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। নেশা-ভাং করে।

নগদ যে সাতহাজার টাকা দেয়া হয়েছিল তা উড়িয়ে দিল হামিদার। বিক্রি করল সোনা, টিন, ঘড়ি। আছিয়া প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু খেয়েছে স্বামীর হাতের কিল-ঘুসি। গর্ভবতী আছিয়া নির্যাতন সইতে না পেরে পিতৃগৃহে চলে এলো, আর ওদিকে গ্রামছাড়া হলো হামিদার। তারপর থেকে আর দেখা নেই।

একদা চারএকর আবাদি জমির মালিক রসুল মিয়া মেয়ের বিয়ে দিতে জমি হারিয়েছে, এখন সে অতি ক্ষুদ্র এক কৃষক, মজুরিও খাটে। আর আছিয়া, পিতৃগৃহে থাকলেও নিজের আয়-উপার্জনে নিজের পেট চালাতে চায়। গ্রামে এর-ওর বাড়িতে ঠিকে ভিত্তিতে চাকরানির কাজ করে। পলাতক স্বামীর ঔরসে যে ছেলেটি জন্ম নিয়েছে, সে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।[১৬]

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষদের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন মোনাজাতউদ্দিন। সমস্যা চিহ্নিত করেই থেমে থাকেননি জনসাংবাদিকতায় সফল এই মানুষটি। খুঁজে বের করেছেন সমস্যার শেকড় এবং ধরন। এবং প্রান্তিক মানুষদের সমস্যা নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় ইঙ্গিত দিয়েছেন সমাধানের। তাঁর ছিল সমস্যাক্রান্ত জনমানুষদের যথাযথ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস। নারী নির্যাতন নিয়ে অনেক রিপোর্ট করেছেন মোনাজাতউদ্দিন। নারী নির্যাতন সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

> নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে। নোটবুকের পাতা ভরে ওঠে একের পর এক। দুঃখের কাহিনীর শেষ নেই। ...বেগম রোকেয়া তো এই গ্রামেই জন্মেছিলেন, শতবর্ষ পেরুনোর পরেও কি অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, পর্দাপ্রথার যুগ শেষ হবে না? কতদিন নির্যাতিতা হবে এখানকার নারী? আর কত অপেক্ষা? কার জন্যে অপেক্ষা?[১৭]

নারীর উন্নয়ন ছাড়া কোনো জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। বাংলাদেশের নারীরা তো সেক্ষেত্রে রয়েছে যোজন যোজন পিছিয়ে। নারী নির্যাতন হচ্ছে এখানকার নিয়ত চিত্র। যথাযথ উন্নয়নের যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার জায়গায় তার বিচরণ ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। নারী নির্যাতনের চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন নিপুণ লেখনীতে। এদেশে নারী বিষয়ক রিপোর্টের মধ্যে একশ্রেণির পাঠক বিকৃত আনন্দ সন্ধান করে। এবং প্রকৃত অর্থে সংবাদপত্রগুলোতে নারী বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের প্রচল যে ধারা তা বিকৃত আনন্দের যোগান– সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে। নারীকে সংবাদমাধ্যমে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মোনাজাতউদ্দিন ত্রুটিপূর্ণ প্রচল ধারাকে অতিক্রম করেছেন দক্ষতার সাথে। তাঁর সংবাদ উপস্থাপনের কৌশলের কারণে প্রান্তবর্তী নারীদের সমস্যা ফুটে উঠেছে যথাযথ চিত্র নিয়ে। এর মধ্যদিয়ে তার মধ্যে প্রকৃত জনসাংবাদিকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে মোনাজাতউদ্দিনের চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পায় তাঁর ভাষ্য থেকে–

> আকলিমার বয়স যখন ১০ বছর, পিতার আর্থিক দৈন্যদশার কারণে রংপুর শহরে এক টেক্সটাইল মিলে শ্রমিকের কাজ জুটিয়ে নেয় সে। তার বাবা-মা, ভাইবোন মিলিয়ে পরিবারে মোট সদস্যসংখ্যা ১২, কিন্তু জমিজমা নেই। পিতা দিনমজুরি করে, বলাবাহুল্য সামান্য উপার্জন। শহরে এসে চাকুরি নেবার মূল কারণ: বাবাকে সাহায্য করা।
>
> মিলের ম্যানেজারের সাথে আকলিমার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লোকটি তাকে প্রথম দিকে 'বেটি বেটি মা মা' ডাকত। পরে, আকলিমা সাবালিকা হবার পর, সম্পর্ক দাঁড়ায় অন্যরকম।
>
> আকলিমার ভাষ্য অনুসারে: লোকটি একদিন জোরপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। বিয়ের জন্যে চাপ দেয় আকলিমা। প্রথম প্রথম আপত্তি তুললেও পরবর্তীতে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। যৌতুক ধার্য হয় ১৩ হাজার টাকা। আকলিমা তার আয় থেকে প্রতিমাসে একশ' টাকা করে সঞ্চয় করত, তা থেকে কিছু টাকা স্বামীকে (যৌতুক) হিসাবে দেয়, কিছু থাকে বাকি। মাসে মাসে পরিশোধ করা হবে এরকম কথা হয়।
>
> বিয়ের পর সন্তান হয় একটি, মেয়ে। কিন্তু সংসারে সুখশান্তি ছিল না। কথায় কথায় স্বামী মারধর করত, আর ছিল সতীনের অত্যাচার। আকলিমা বলে, 'বিয়ের আগে শুনেছিলাম আমার স্বামীর আরেকটা বিয়ে হয়েছিল, তাকে অনেক আগে নাকি তালাক দেয়া হয়েছে। কিন্তু না, আমাদের বিয়ে হয়ে যাবার পর দেখলাম, তালাক হয়নি, সে দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে ছিল।'
>
> সতীন ছিল বদমেজাজি অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করত, মেয়েটিকে বলত জারজ। স্বামীটিও চালাত দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। অবশেষে একদিন তিন তালাক উচ্চারণ করল লোকটি। শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে এলো আকলিমা। এখানেই কিছু একটা কাজ করবে সে।
>
> ন'বছর থেকে পায়রাবন্দেই আছে আকলিমা। আর বিয়ে করেনি। প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু সে নারাজ। ভাইবোনগুলো পড়ছে, তাদের মানুষ করে তুলতে হবে, এই তার বর্তমানের চিন্তা-ভাবনা।
>
> দু'বছর আগেও 'নিজেরা করি' (এনজিও)-র গ্রুপ সদস্য ছিল সে। সঞ্চয়ের টাকা তোলা ও গ্রামের মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করত। এখন সে কাজের উৎসাহে ভাটা পড়েছে। আকলিমা রংপুরের তাজহাট থেকে বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ এনে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে, মাসিক আয় ৮শ' থেকে এক হাজার টাকা। অবসর সময়ে সেলাইয়ের কাজ করে, তাতেও কিছু আয় হয়। বাড়িতে হাঁস-মুরগি পুষছে কিছু।
>
> সামাজিক বিভিন্ন বিষয় ব্যাপার সম্পর্কে সে জানে। মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছে, শুনেছে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর, আর তারও পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কীভাবে গুলিতে নিহত হন। নিজগ্রামে বিদ্যুৎ নেই, ঘরে কুপ জ্বলে, কিন্তু মাঝে-মধ্যে পায়রাবন্দের বাসাবাড়িতে টেলিভিশন দেখে। আকলিমা জানায়, 'টিভি'র ধারাবাহিক নাটক নাকি তার খুব প্রিয়। কথায় কথায় বলল, সে নাকি বিএনপি পার্টির (বিএনপি) সমর্থক, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দৈনিক ৩০/৪০ টাকার বিনিময়ে বিএনপি প্রার্থীরপক্ষে 'এলেক্শনের কাজ' করেছে। খালেদা জিয়াকে তার খুব পছন্দ। বলে, 'বাপরে, কী সুন্দোর ধওল টকটকা বেটিছাওয়া। খালি দেখি থাইকপার মনায়।' অর্থাৎ 'বাপরে, কী সুন্দর ফর্সা টকটকে মহিলা. তাকে শুধু দেখতেই ইচ্ছে করে।'
>
> না এখনো সামনা-সামনি দেখেনি, বেগম খালেদা জিয়াকে দেখেছে সে টেলিভিশনের পর্দায়।
>
> আকলিমা চলনে-বলনে চটপটে। 'নিজেরা করি'র কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে হাজির থাকে, খুব হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতাও করে। কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদ। 'নিজেরা করি' আয়োজিত ২৬শে মার্চের ('৯২) একটি অনুষ্ঠানে শুনলাম, আকলিমা সমবেত মহিলাদের উদ্দেশে বলছে: 'আর আমরা পুরুষের হাতে মার খাব না, আর আমরা নির্যাতন সহ্য করব না। আসেন বোনেরা, এবার জাগেন, ... বাংলাদেশে এখন নারী-স্বাধীনতা

কায়েম হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা... শেখ হাসিনা ও মহিলা...ইত্যাদি।

> 'নিজেরা করি'-র সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে নিরক্ষর আকলিমা এখন বেশকিছুটা সচেতন। সে সদর্পে পায়রাবন্দের পথে চলে, গ্রামে গ্রামে ঘোরে; কিন্তু এরকম চলাফেরা সত্ত্বেও তাকে ঘাঁটায় না কেউ। বিশেষ করে বছর দুয়েক আগে আকলিমা দু'টি ঘটনা ঘটায়, তারপর থেকে ধর্মান্ধ কোনো মওলানাও তার চলন-বলন নিয়ে কটু মন্তব্য করতে সাহস পায় না। বরং লক্ষ্য করি, গ্রামের দুষ্ট যুবকেরা ভয় করে চলে তাকে।
>
> শুনলাম, দু'বছর আগের ঘটনা। এক যুবক আকলিমাকে দেখে শিস ছুড়েছিল। ছুটে গিয়ে তার নিতম্বে লাথি কষে মেয়েটি। 'হারামজাদা, তোর বোনের কাছে গিয়ে শিস দে'। তারপর থেকে যুবকটি আকলিমাকে দেখলেই উল্টোপথে হাঁটা দেয়।
>
> আরেকজন যুবক, একদিন সন্ধ্যার পর, আকলিমা যখন বাড়ি ফিরছিল, পথের ধারে পাটক্ষেতে টেনে নিয়ে যেতে উদ্যত হয়। আকলিমা প্রথমে পায়ের স্যান্ডেল এবং স্যান্ডেল ছিঁড়ে যাবার পর গাছের ডাল ভেঙে ছেলেটিকে বেদম পেটায়। শেষে টুটি চেপে ধরে। প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণ গ্রামে রটে যাবার পর, আকলিমা হয়ে ওঠে 'ডাকাত মেয়ে'।
>
> নিজের শক্তিতে নিজের নিরাপত্তা গড়েছে আকলিমা। পায়রাবন্দের ঘরে ঘরে যেখানে নারী নির্যাতন, যৌতুক-পীড়ন, ধর্ষণ, সম্পত্তির অধিকারবঞ্চনা তথা নিরাপত্তাহীনতা, সেখানে আকলিমা মুক্ত স্বাধীন।
>
> আমি ভাবি, পায়রাবন্দে শত শত রীনা বেগম, আনজেরা, পাখীরন, শুক্‌নীবালা– এরা যদি আকলিমার মত প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারত! ...কিন্তু এজন্যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, দরকার নারীশিক্ষা সচেতনতা। শুধু তাই নয়, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা, যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় যারা স্বামীর বাড়িতে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কিংবা বছরের পর বছর ধরে পড়ে আছে পিতৃগৃহে, তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করতে হবে। নিজের আয়ে নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত শুধু পায়রাবন্দ কেন বাংলাদেশের কোনো শহর বা গ্রামে নারীদের মুক্তি নেই।[১৮]

মোনাজাতউদ্দিন নারীর অবস্থান নিয়ে ভেবেছেন এবং নির্যাতন বন্ধ করার লক্ষ্যে যে নারীদের সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন, নারী শিক্ষায় সচেতনতা প্রয়োজন তা ভেবেছেন। তাদের কর্মসংস্থান হওয়ার কথাও চিন্তা করেছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন সাংবাদিক শুধু সংবাদ লিখে তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়নি। দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছুটে গিয়েছেন। শুধুমাত্র সমস্যার সংবাদ উপস্থাপনই তার লক্ষ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল তা চিরস্থায়ী সমাধানের।

'গ্রাম সমাজে নারী' বিষয়ক প্রতিবেদন করার জন্য তিনি জরিপ চালিয়েছিলেন বাড়ি বাড়ি ঘুরে। অর্থাৎ শুধু অল্প সময়ে দেখা থেকে লেখা নয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি বিভিন্ন নারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন।

সচেতনে বা অচেতনে, যেভাবেই হোক না কেন মোনাজাতউদ্দিন জনসাংবাদিকতার মূল সুরটি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর সাংবাদিকতার ধরনে জনসাংবাদিকতার শর্তগুলোর সঠিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নারীর অবস্থান সম্পর্কে 'দৈনিক সংবাদ'-এ প্রকাশিত 'হাওয়া বিবি' শিরোনামে একটি নারী নির্যাতন বিষয়ক প্রতিবেদনে তিনি বলেছেন–

> মাত্র ৬ বছর, অর্থাৎ পুতুল খেলার বয়েসে হাওয়ার প্রথম বিয়ে হয়। স্বামীর নাম ছিল মোসলেম। কিন্তু 'ভয়ে' সে স্বামীর বাড়িতে যায়নি। 'বউ ঘরে আসে না', 'বেয়াদপ বেত্তমিজ মেয়ে' এসব কারণে ২২ বছরের যুবক মোসলেম তালাক দেয় তাকে।
>
> এরপর বিয়ে হয়ে রশিদ মিয়ার সাথে। যৌতুকের দাবি ৫শ' টাকা। পরিশোধ করতে না পারায় আবার তালাকপ্রাপ্তা হয় সে। এভাবে, একে একে চারটি বিয়ে হল, কিন্তু কোথাও সে ঘর করতে পারল না। ঐ একই কারণে। যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে পারে না গরিব পিতা।
>
> শেষে, ৭০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধের সাথে ওর বিয়ে হল। এখানে কোনো যৌতুক লাগেনি। অসুস্থ এবং মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সেবা করবার জন্যে একজন দাসীর প্রয়োজন ছিল, আলতাফ মিয়া তা-ই পায়। তবে, হাওয়ার আশা ছিল স্বামী মারা গেলে পরে কিছু সম্পত্তি অন্তত পাবে। পায়নি, বরং কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা। বুড়োর ছেলেরা তাকে গলাধাক্কা দিয়ে পথে বের করে দেয়।[১৯]

মানুষের আচরণের নিয়ামক তাদের মনস্তত্ত্ব। মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা জনসাংবাদিকতার জন্য অপরিহার্য হলেও কঠিন। কোনো এক জনগোষ্ঠীতে বিদ্যমান সমস্যার শেকড় পোঁতা থাকে মূলত সেই জনগোষ্ঠীর মানস গঠনে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীভাবেই সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করতে সমস্যাক্রান্তদের মন-এর অনুসন্ধানও প্রয়োজন। খুব কম সাংবাদিকই আছেন যারা সমস্যাক্রান্তের মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধানকে তাঁদের কর্মপ্রক্রিয়ার অংশ করেন। মোনাজাতউদ্দিন সেইসব কম সাংবাদিকদের একজন ছিলেন। তিনি যাদেরকে সংবাদ করেছেন, তাদের মনস্তত্ত্বও বোঝার চেষ্টা করেছেন। এতে জনসমস্যার প্রকৃত রূপ উন্মোচিত হয়েছে।

৭ বছর আগে, পায়রাবন্দ সফরকালে একটি বাঁশঝাড়ের ভেতর একটুখানি ফাঁকা জায়গায় হাওয়া বিবিকে প্রথমে দেখি। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া চেহারা, একবেলা খায় তো দু'বেলা উপোস। কোলে ১ বছর বয়সের একটি মেয়ে, একফোঁটা দুধ পায় না। এই সাক্ষাতের মাত্র কিছুদিন আগে সে মৃত স্বামী আলতাফ মিয়ার বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এই সময়টাতে, একেই পেটে ক্ষুধার জ্বালা, তার ওপর ছিল পাড়াপ্রতিবেশীর ছড়ানো নানা গঞ্জনা। মেয়েটি কার, সেই প্রশ্ন করে সবাই। আলতাফ ছিল মরার মতো, রোগশয্যাশায়ী, তখন এই মেয়ে হাওয়া বিবির পেটে এল কী করে? হাওয়া তখন স্বামীর সম্পত্তিবঞ্চিত– তা নিয়ে কারো উচ্চবাচ্য নেই, হাওয়া তখন অনাহারী অথচ তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই, কোলের শিশু দুধ পাচ্ছে না তাতে কারো কিছু আসে যায় না। অথচ সন্তানধারণের ব্যাপারটি যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সবার কাছে! তাকে (সেসময়) একরকম একঘরে করে রাখা হয়।[২০]

বেশ কয়েক বছর পর মোনাজাতউদ্দিন মনে করেছিলেন হাওয়া বিবিকে। ১৯৯২ সালের মার্চে তিনি সেই হাওয়া বিবির সন্ধানে আবার সেই গ্রামে যান। তিনি হাওয়া বিবির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে–

> না, মরেনি। হাওয়া বিবি বেঁচে আছে। তার সেই মেয়েটিও। এখন বয়স ৮ বছর। মক্তবে পড়ে। কিন্তু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করায়নি এখনো।
>
> : কেন মেয়েকে স্কুলে দেননি কেন?
>
> হাওয়া বিবি কথা বলে না, দাঁড়িয়ে থাকে নতমুখে। দ্বিতীয়বারের মতো প্রশ্নটি করলে মুখ তোলে সে। চোখের কোণে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে পড়ে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে যাই। সরিয়ে নিই চোখ। উপস্থিত একজন প্রশ্নের জবাব দেয়: 'ওর মেয়ে স্কুলে যাবে কী করে? কার জন্ম তা-ই নিয়ে প্রশ্ন তোলে, খ্যাপায়।' আমি অনুতপ্ত হই ব্যাপারটি আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল। তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদল করি।
>
> মেয়েটাকে নিয়ে মানসিকভাবে কষ্টে আছে হাওয়া বিবি। মেয়ে বেড়ে উঠছে, কিন্তু পিতৃপরিচয়গত কারণে স্কুলে দেয়া যাচ্ছে না। এরপর যখন বিয়ে দিতে হবে, তখনই-বা কী হবে? এখন থেকেই উদ্বিগ্ন।
>
> তবে, হাওয়া বিবির সাথে দেখা হবার পর একটা ব্যাপার

ভালো লাগল যে, বেঁচে থাকার প্রশ্নে সে পরাজিত হয়নি। নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছে। 'নিজেরা করি'-র গ্রুপ-সদস্যা। গ্রামে ২২ জন মহিলা মিলে 'দল' গঠন করেছে, নিয়মিত সঞ্চয় করছে কিছু। হাওয়া বিবি গ্রামের এক অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়িতে এখন ধান ভানা, কাপড় কাচাসহ বিভিন্ন কাজ করে, দৈনিক পায় আধসের চাল আর একবেলা খাবার। ঐ আধাসের চাল থেকে একটু একটু করে জমায়, তা-ই বিক্রি করে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের টাকা জমা দেয়।

৭ বছর আগে মরো-মরো অবস্থায় দেখেছিলাম হাওয়া বিবিকে। তখন ছিল তার পোড়া কালো চোয়াল-ভাঙা চক্ষু কোটরাগত এবং অনাহারী শরীর, পরনে ছিল ছিন্ন ময়লা শাড়ি। এখন স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে, রঙ বেশ উজ্বল, নতুন শাড়ি পরেছে, মেয়ের প্রসঙ্গ ভুলে যাবার পর এখন তার মুখে হাসি। বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় হাওয়া বিবির সাথে। ৮/৯ মাইল দূরে রংপুর শহর, অথচ ৪৫ বছরের জীবনে সে কখনো ঐ শহর দেখেনি, এই পায়রাবন্দের কয়েকটি গ্রামের গণ্ডিতে তার জীবন, এটুকুই তার দেশ, এটুকুই তার পৃথিবী। ...প্রাইমারি স্কুলের চৌহদ্দিতে যেতে পারেনি যে-হাওয়া, মাত্র ছ' বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে যার, কৈশোরে যে পেয়েছে যুবক-স্বামী, আর যৌবনে পেয়েছে ৭০ বছরের বৃদ্ধ, সেই মেয়েটি নীরবে জ্বলল, পুড়ল, হজম করল গরল। সেখানে কোনো আনন্দ নেই, সেখানে কোনো স্বপ্ন নেই, চাওয়া-পাওয়া নেই। কলুর বলদের মতো জীবনের ঘানিটি টেনেই চলছে। ...এবং বেঁচে আছে সেই হাওয়া বিবি।[২১]

হাওয়া বিবির কাহিনী মনে করিয়ে দেয় গ্রামের চিরাচরিত নারী নির্যাতনের কাহিনী। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় নারী নির্যাতনের চিত্র। নারীর শারীরিক নির্যাতনের চিত্রই শুধু নয়, নারীর মানসিক যন্ত্রণার চিত্রও মোনাজাতউদ্দিন নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রাম সম্পর্কে মোনাজাতউদ্দিন লিখেছেন–

শহর থেকে ৯ মাইল দূরের এলাকা হলেও পায়রাবন্দ একটি বিচিত্র জনপদ। এখানে রয়েছে বাল্যবিবাহ, ঘরে ঘরে যৌতুকের আদান-প্রদান, বহুবিবাহ, নারী নির্যাতন আর ন্যায্য অধিকার-বঞ্চনার হাজারো ঘটনা। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কুসংস্কার, কুপ্রথা এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যে, দেখে-শুনে মনে হয় এখনো যেন সেই বেগম রোকেয়ার যুগে পড়ে আছে এখনকার নারীসমাজ। এই পরিস্থিতিতে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের নামে কেবলমাত্র গ্রুপ গঠন, সঞ্চয় গড়ে তোলা আর সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখের বক্তৃতায় কাজ হবে না। এজন্য চাই ব্যাপকভিত্তিক কর্মতৎপরতা। অন্তত গণশিক্ষা কার্যক্রম চাই, কর্মসুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে প্রতিটি ঘরে গিয়ে বোঝাতে হবে, প্রয়োজনে আইন-সহায়তা দিতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য যেতে হবে ডাইরেক্ট অ্যাকশনে। একই গ্রামের আকলিমা যদি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য সচেতন হয়, হাওয়া বিবি গড়ে তোলে সঞ্চয়, কিন্তু এদের পাশে ৬ বছর বয়সের লাকির যদি বিয়ে হয়ে যায়, যৌতুকের কারণে হাসনা বানু বৃদ্ধের ঘর করে, পাখীরন ধর্ষিতা হয়, আর শুক্‌নীবালা হয় অধিকারবঞ্চিত, তাহলে সামগ্রিকভাবে কি 'আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন' সম্ভব?[২২]

মোনাজাতউদ্দিন চাইতেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। শুধু উন্নয়নই নয় টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, বহুবিবাহ বন্ধ হবে। আর এগুলো বন্ধ করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, নিরাপত্তা– এ লক্ষ্যেই কাজ করেছেন মোনাজাতউদ্দিন। বলা চলে জনমানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর সাংবাদিকতার একমাত্র দিক।

কুসংস্কার নিয়ে মোনাজাতউদ্দিন রিপোর্ট করেছেন–

'৯২ এর মার্চে পায়রাবন্দে নেমেই শুনলাম জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে ক'দিন আগে ৫ বছর বয়সের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। না, কোনো পুরুষের সাথে নয়, বিয়ে হয়েছে তার একটি গাছের সাথে। গাছের সাথে বিয়ে? কীরকম?

জয়রামপুর-আনোয়ার গ্রামে গেলাম। মেয়েটির পিতা নবিরউদ্দিন একজন ক্ষেতমজুর। সে বাড়িতে ছিল না। দেখা মিলল তার স্ত্রী ফাতেমার সাথে।

ভাঙ্গা-প্রায় একখানা কুঁড়েঘর, আসবাবপত্র বলতে কিছু নেই। ছেঁড়া মাদুর পেতে দিলেন ফাতেমা তাঁর ছোট্ট উঠোনে, পাশের কোনো বাড়ি থেকে চেয়ে আনলেন গুয়াপান। তারপর বললেন, তাঁর মেয়ে নুরেজা খাতুনের বিয়ের কাহিনী।

নুরেজা খাতুন ধারে কাছেই কোথাও খেলছিল, ছুটে এলো, মায়ের কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অতি বিস্ময়ের চোখে। পরে ছবি তোলার সময় তার কী কান্না! অনেক ভুলানোর পর উপহার দিল সে এক টুকরো চমৎকার হাসি।

ফাতেমা জানাল, না, একবার নয়, এ পর্যন্ত দু'বার নুরেজার বিয়ে দেয়া হয়েছে গাছের সাথে। প্রথমবার একটি জিগা গাছের সাথে বিয়ে হয়, তাতে নাকি উদ্দেশ্য সফল হয়নি, পরে একটি পাকুড় গাছের সাথে ওর বিয়ে হয়। ফাতেমার বিবরণ এরকম: নুরেজার বয়স যখন দু'বছর তখন সে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই শরীর শুকিয়ে যেতে থাকে। ফাতেমার ভাষায় 'পোড়া বাইগনের নাকান' অর্থাৎ পোড়া বেগুনের মতো হয়ে যায় তার চেহারা। সন্তান বলতে একটি মাত্র মেয়ে, তার এই দশায় পিতা-মাতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কোনো ডাক্তারের কাছে মেয়েকে নিয়ে যাননি। যায় গ্রামের এক কবিরাজের কাছে। সেই কবিরাজ পরামর্শ দেয়, কোনো ঔষধপত্রে কাজ হবে না, কেননা মেয়েকে ভূতে ধরেছে এবং ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো: মেয়েকে কোনো একটি গাছের সাথে বিয়ে দিতে হবে।

বিয়ে-আয়োজন চলে। বর হিসেবে নির্বাচন করা হয় একটি জিগা গাছ। জিগা একটি ফলহীন বৃক্ষ যার ডাল দিয়ে গ্রামে ফসলের ক্ষেতে বেড়া দেয়া হয়। এর কাণ্ড কাটলে একধরনের রস বেরোয় যা ঘন হলে আঠা হয়। জিগা গাছের ছাল থেকে নাকি কবিরাজরা জন্ডিসের ওষুধও বানায়।

যাই হোক, গ্রামের এক মৌলবিকে দিয়ে ঐ জিগা গাছের সাথে বিয়ে পড়ানো হয় নুরেজা খাতুনের। বিয়ের আগে মেয়েকে শাড়ি পরানো হয়, চোখে আঁকা হয় কাজল। কবিরাজ প্রদত্ত একটি মালা হলুদ-লেপা জিগা গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে দেয়া হয় মেয়েটির হাতে। বিয়ে উপলক্ষে মুরগি জবাই করে পাড়াপ্রতিবেশীকে ভাত খাওয়ানো হয়। বিয়ের গীতের আয়োজন ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য খাদ্য ছাড়াও সরবরাহ করা হয় বিড়ি এবং গুয়াপান। সবাই মেয়েটির জন্য দোয়া করে।

তবু নুরেজা রোগমুক্ত হয় না। আবার সেই কবিরাজের দ্বারস্থ হয় পিতা-মাতা। কবিরাজ বলে, জিগা গাছ নয়, বট কিংবা পাকুড় গাছের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। ওরা তা-ই করে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ওদের বাড়ি থেকে দূরে নয়, তবু এতদিন সেখানে যায়নি নবিরউদ্দিন কিংবা ফাতেমা। মেয়ে যখন মরো-মরো তখন প্রতিবেশী এক যুবকের পরামর্শমতো ফাতেমা সেখানে নিয়ে যায় নুরেজাকে। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ সেবনের পর নুরেজা কিছুদিনের মধ্যেই যেন নবজন্ম লাভ করে, স্বাস্থ্য ফিরতে থাকে তার।

ফাতেমা এখন খুশি। কিন্তু আলাপ করে বুঝতে পারি, ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেয়া ওষুধ খাবার ফলেই নুরেজা সুস্থ হয়ে উঠতে থাকে এটা সে এখনো বিশ্বাস করে না। তার ধারণা এরকম যে, দ্বিতীয়বার ঐ পাকুড় গাছের সাথে বিয়ে পড়ানোর ফলেই কাজ হয়েছে। কবিরাজ নাকি তা-ই বলেছে। কবিরাজ

বলেছে : 'আমি স্বপ্নে দেখেছি গাছের সাথে বিয়ে হলে তোমার মেয়ে ভালো হবে। আমার স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না।[২৩]

গ্রামীণ মানুষের কুসংস্কারে আচ্ছন্নতার একটা বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাকে। নুরেজাকে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে জিগা গাছের সাথে, কারণ জিগা গাছের সাথে বিয়ে দিলে তার রোগমুক্তি হবে। এর পেছনে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সাথে সাথে কাজ করেছে কুসংস্কার। ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ হবার পরও বিশ্বাস করা হয়– নুরেজার রোগমুক্তি ঘটেছে কবিরাজী বিধানের ফলে। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে কবিরাজের ভণ্ডামিকেও একই সঙ্গে দেখাতে চেয়েছেন মোনাজাতউদ্দিন। তাঁর সংবাদ-কৌশল ছিল একেবারেই অভিনব।

মোনাজাতউদ্দিন নামের সাথে মিশে আছে এক ভিন্ন ধরনের গ্রামীণ সাংবাদিকতা। এবং সেই সাংবাদিকতার কৌশল ছিল ভিন্ন। একজন সাংবাদিককে চতুর্মুখী গুণের অধিকারী হতে হয় এবং সাংবাদিকের গুণাবলির মধ্যে পোশাক নির্বাচনের বিষয়টিও পড়ে। মোনাজাতউদ্দিন গ্রামের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেখানকার মানুষের সাথে মিশে যেতে পেরেছিলেন।

> ৭বছর আগের কথা পায়রাবন্দে জরিপ কাজ করার সময় আমাকে ভেতর-গ্রাম যেতে হয়েছিল লুঙ্গি পরে। কেননা, গ্রামের অনেক মানুষের ধারণা ছিল প্যান্টশার্ট-পরা লোক দেখলে নাকি তাদের 'সাঁইত' নষ্ট (যাত্রা নাস্তি) হয়ে যাবে। সেসময় শুনেছি, বিয়ের রাতে স্বামীর পায়ের বুড়ো আঙুল-ধোয়া পানি পান করে থাকে নববধূ। '৯২-এর মার্চে শুনলাম এ দু'টি প্রথা বা বিশ্বাস এখন প্রায় উঠে গেছে। তবে মাটির সাথে শেকড়ের মতো গেঁথে বসে আছে সেই পুরোনো আমলের অনেকগুলো। পুরুষশাসিত পায়রাবন্দের গ্রামের মেয়েরা একেই তো বাড়ির আর সব পুরুষের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরে পোড়া-তলানি খেতে বসে, তার উপর আবার ভাতের গ্রাস তোলার সময় মুখের হাঁ বড় করতে পারে না। হা হা করে ওঠে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি।এভাবে ভাত খেলে নাকি অমঙ্গল হবে সংসারের।
>
> পায়রাবন্দের গ্রামগুলোতে এখনো এমন প্রথা চালু আছে শুনলে অবাক হতে হয়। যেমন, শুনলাম, গাভী যদি দুধ কম দেয় তাহলে গাভীর মালিক মিঠাপুকুরের পশু হাসপাতালে যায় না, সে 'মনুয়া' জাতের একটি কলা সংগ্রহ করে তা দা কিংবা ছুরি দিয়ে এক কোপ মেরে কেটে ফেলে। এতে নাকি গাভী দুধ বেশি দেবে। গাভীর পায়ে বা খুরে ঘা হলে তাতে ওষুধ দেয়ার ব্যাপারে কৃষক উৎসাহী নয়, সে এক টুকরো কাগজে লেখে গ্রামের চারজন সুদখোরের নাম, তারপর সেই কাগজটি বাঁশের টুকরোর সাথে বেঁধে তাবিজের মতো করে ঝুলিয়ে দেয় গাভীর গলায়। ধারণা এতে ঘা সেরে যাবে। গাভীর বাছুর হলে পরে তার ফুল-নাড়ি কলাপাতায় জড়িয়ে ফেলে দিয়ে আসা হয় নদীতে। ধারণা এতে গাভীটি নদীর পানির মতো অঢেল দুধ দেবে। নতুন গরু কিনে আনবার পর কৃষক লাঙল জুড়ে দেয় কিন্তু তার আগে গড়গড়ি পিঠা বানিয়ে খাওয়ানো হয় হাইলাকে, কয়েকটি পিঠা আবার টিনের ঘরের চালে ছুড়ে দেয়া হয়। এরকম কাজ করার পেছনে কৃষকের ধারণাটি হলো: লাঙ্গল টানার সময় বলদ হাঁটবে তাড়াতাড়ি। শিশুর হাম হলে টিকা দেয়ার ব্যাপারটি অধিকাংশ পরিবারে অজ্ঞাত। অধিকাংশই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় না ওষুধ নিতে। বরং হাম আক্রান্ত শিশুকে সাতটি পিঁড়ি একত্র করে তাতে বসিয়ে গোসল করায়। এতেই নাকি রোগমুক্তি ঘটে। কোলের শিশুর পেটের পীড়া হলে কালোবরন ছাগলের দুধ এবং সরেয়া গাছের আঠা একত্র করে খাওয়ানো হয়। ছেলেমেয়েদের প্রস্রাবের গোলমাল হলে পরে কোনো একটি কুয়ো থেকে কাদা তুলে তা একটি হাঁড়িতে ভরানো হয়, তারপর সেই হাঁড়িটি বসিয়ে দেয়া হয় সন্তানের নাভিতে। পেটের গোলমাল দেখা দিলে একটি চটের থলিতে কাদা ভরানো হয়, তাতে পোঁতা হয় একটি বাঁশের কাঠি। সেই কাঠিতে ন্যাকড়া পেঁচিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। পোড়া ন্যাকড়ার ছাই মালিশ করা হয় পেটে। ...পেটের অসুখ এমনকি ডায়রিয়া হলেও মনে করা হয়, শিশুর ওপর কারো 'কুদৃষ্টি' পড়েছে এবং তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কয়েক মুঠো ছাই বাড়ির চারিপাশে ছিটিয়ে দেয়া হয়।
> এসব কেন করে, অধিকাংশ তা জানে না। বলে, 'আমাদের বাপ-দাদারা করেছে, আমরাও করি।'
> পায়রাবন্দে শুনলাম, ফসলের ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হলে কীটনাশক ঔষধ ছিটানের চেয়ে এখনো সেই বাপ-দাদার আমলের পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনেক কৃষক। গর্ভধারণের পর ৭ থেকে ৯ মাসের মধ্যে প্রসব হয়েছে এমন একটি কিশোর বেছে নেয়া হয়। সেই ছেলেটিকে প্রথমে খাওয়ানো হয় চালভাজা, তারপর তার পরনের লুঙ্গি খুলে মাথায় বেঁধে দেয়া হয়। ছেলেটি পোকা-আক্রান্ত জমির চারধারে ঘুরতে থাকে। এতে নাকি ধ্বংস হবে পোকা। লাউয়ে যদি পোকা লাগে, একের পর এক পচে যেতে থাকে, তাহলে একটি পচা লাউতে তিনটি কাঠি গেঁথে দেওয়া হয় এবং তা রেখে আসা হয় গ্রামের কোণে তেমাথায়। কলা পাকতে দেরি হলে প্রথমবারের মতো দুধ দিচ্ছে এমন গাভীর দুধ ছিটিয়ে দেয়া হয় কলার ছড়ার ওপর। কলা কেটে ঘরে নিয়ে আসার আগে নিচের দিকের একটি কলা দু'টুকরো করে কেটে তা জঙ্গলে ছুড়ে দেয়া হয়। সুপারি পেড়ে আনার পর, দেখা যায়, সুপারির ছড়াটি কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। এতে করে নাকি পরবর্তী বছর আরো বেশি করে সুপারি ধরবে।
> বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই এরকম প্রথা প্রচলন রয়েছে, রয়েছে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু পায়রাবন্দের শেকড়-সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মনে হয়েছে এখানে এগুলো ঘটছে বেশি। জন্ম থেকে মৃত্যু, চাষাবাদ, ঘর-গৃহস্থালির কাজ, প্রতিটি ক্ষেত্রে বহাল রয়েছে অহেতুক হাজারো প্রথা পদ্ধতি। নবজাতক কন্যাসন্তানের চুল কামিয়ে কলাপাতায় মুড়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয় একারণেই যে, মেয়েটির চুল তাড়াতাড়ি লম্বা হবে। নিতান্তই অন্ধবিশ্বাসের ব্যাপার, তবু এর মূলে রয়েছে কন্যার মঙ্গল কামনা। কিন্তু সেই মেয়েটি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তো তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় না বরং বিয়ে দেওয়া হয় গাছের সাথে! কিংবা পাঠশালার বদলে পাঠানো হয় শ্বশুরবাড়ি! মনে করা হয়, অল্প বয়সে বিয়ে দিলে মেয়েটি তাড়াতাড়ি গৃহকর্মে সুনিপুণা হয়ে ওঠবে।
> কী কারণে মানুষের মাথায় ভর করে আছে এইসব অজস্র প্রথা পদ্ধতি তা যাচাই করে দেখবার জন্য সমাজ গবেষকদের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই তত্ত্বকথার।[২৪]

গ্রামীণ কুসংস্কারের চিত্র এত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা শুধু মোনাজাতউদ্দিনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। মোনাজাতউদ্দিনের সংবাদ উপস্থাপন কৌশলও ছিল অভিনব। তিনি একেবারে খবরের ভিতরে পৌঁছে যেতে পারতেন এবং ছেঁকে তুলে আনতেন নির্ভেজাল নির্যাসটুকু। আর তা করতে পেরেছিলেন বলেই সাংবাদিকতায় তিনি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন নতুন ধরন। গ্রামের মানুষের চিকিৎসার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি সরেজমিন ঘুরেছেন–

> ১০ দশমিক ৬৬ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট ইউনিয়ন পায়রাবন্দ, লোকসংখ্যা এখন ২২ হাজারের কিছু বেশি। কিন্তু এদের অসুখে-বিসুখে চিকিৎসা করবার জন্য একজন এমবিবিএস ডাক্তারও ২১ টি মৌজার কোথাও কর্মরত নেই। পায়রাবন্দ এলাকার তিন জন এমবিবিএস-এর মধ্যে একজন থাকেন ঢাকায়, একজন রংপুরে, একজন কাজ করেন মিঠাপুকুরের পাশের থানা পীরগঞ্জে।
> ২১টি মৌজার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় ১৪জন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ২০ জন হাতুড়ে ডাক্তার, আর ১০ জন কবিরাজ-ফকির কাজ করে যাচ্ছেন। এঁদের আয়-উপার্জন খুব একটা মন্দ নয়।

পায়রাবন্দের মতো বিরাট এবং বিখ্যাত ইউনিয়নে একজন এমবিবিএস ডাক্তারও কর্মরত নেই শুনে বিস্মিত হই। নাটক-নভেলে দেখি, আদর্শবান যুবক ডাক্তার দুস্থ-গরিব মানুষের সেবার জন্য গ্রামে চলে যাচ্ছেন, আমাদের দেশের অনেক তরুণ-তরুণী গ্রামের মানুষের সেবা করবার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নাকি মেডিকেলে পড়েছেন কিংবা পড়ছেন এমন কথা শুনতে পাই। তা, আমি কি তাদের মধ্যে একজনকে অনুরোধ করতে পারি যে, তিনি পায়রাবন্দ এলাকায় এসে একটা ডিসপেন্সারি খুলবেন? নাকি ব্যাপারটি একেবারেই অসম্ভব?

বহু নর-নারী, শিশু অসুস্থ এই জনপদে। শিশুরা ডায়রিয়া আমাশয় চর্মরোগাক্রান্ত, এছাড়াও আছে রাতকানা। কৃমি আক্রান্ত শিশু ঘরে ঘরে। মেয়েদের মধ্যে রক্তশূন্যতা বেশি। অনেক পুরুষ সাধারণ রোগ-বালাই ছাড়াও মারাত্মক অপুষ্টিতে ভুগছেন। রয়েছে হাঁপানি ও যক্ষা রোগী। এবং এদের অধিকাংশই যেহেতু অতি অভাবী, তাতে আবার অসচেতন, সে কারণে নির্ভর করে আসছে হাতুড়ে ডাক্তার কিংবা কবিরাজের ওপর। পানিপড়া, তাবিজ তুম্বা, ঝাড়ফুঁক, এই হচ্ছে চিকিৎসা। কোনো কোনো গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের পসারও ভালো।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি দৈনিক ২০ থেকে ২৫ জন রোগী আসে বিভিন্ন রোগ নিয়ে। মেডিকেল স্কুল পাস করা একজন 'চিকিৎসা সহকারী' এদের রোগ-বিবরণ শোনেন ওষুধ দেন। কিন্তু সব অসুখের ওষুধ মেলে কই? আমাদের সর্বশেষ সফরকালে (২৪শে মার্চ '৯২) দেখলাম : এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে আমাশয়ের ওষুধ রয়েছে। কিন্তু পাতলা পায়খানা নিরাময়ের মতো কোনোকিছুই নেই। এমনকি মজুত নেই খাবার স্যালাইন পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, সর্বক্ষেত্রে সঠিক ওষুধ দেয়া হচ্ছে না। রোগ নির্ণয়ের মতো আধুনিক কোনো সরঞ্জাম নেই, মুখের বর্ণনা শুনে ব্যবস্থাপত্র লিখতে হয় চিকিৎসা সহকারীকে। তার উন্নত প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। প্রতিমাসে ৬০০ থেকে ৭৫০ জন রোগী আসে এখানে; কিন্তু সরকার থেকে বরাদ্দ বছরে মাত্র ৮ হাজার টাকার ওষুধ। সে হিসেবে (প্রত্যেককে ওষুধ দিলে) একেকজনের ভাগে পড়ে বছরে একটাকার কিছু কম কিংবা সামান্য বেশি।

কী ধরনের রোগ নিয়ে আসে মানুষজন? স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আগত ৬৫ জন রোগীর তথ্য নিয়ে দেখা গেল: এদের মধ্যে শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৩৫। বাকি ৩০ জনের মধ্যে ২৯ জনই মহিলা, ১জন পুরুষ।

৩৫ জন শিশু-কিশোরের মধ্যে কৃমি আক্রান্ত রোগী বেশি, ১১ জন। রাতকানা ৪ জন। কানে ঘা ২ জনের। পাতলা পায়খানা ও আমাশয়-আক্রান্ত ১৪ জন। বাদবাকি ৪ জন এসেছে জ্বর ও সর্দি-কাশি নিয়ে। ২৯ জন মহিলার মধ্যে রক্তশূন্যতায় ভুগছেন ১৪ জন। দাদ ফোঁড়া চোখের অসুখ, পেটের পীড়া, বাত ও মহিলাগত অসুখ ১৫ জনের। ১ জন পুরুষ, তার হয়েছে হাঁপানি। দীর্ঘ বছর ধরে কবিরাজী চিকিৎসার পর এই প্রথমবারের মতো সে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছে ওষুধ নিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে রোগটি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যখন আর গ্রামে চিকিৎসা সম্ভব নয়, যেতে হবে রংপুর কিংবা মিঠাপুকুরের হাসপাতাল। কিন্তু সপ্তাহে ২/৩ দিন কাজ পাওয়া প্রৌঢ় ক্ষেতমজুরটির পক্ষে তা সম্ভব নয়। 'টাউনের দাক্তোরের কাছে যাবার মতোন পাইসা আছে হামার?' হতাশার কণ্ঠে বলল সে। অর্থাৎ, শহরের ডাক্তারের কাছে যাবার মতো আমাদের কি টাকাপয়সা আছে?

দু'বছর আগের পরিসংখ্যান হিসেবে পায়রাবন্দে সক্ষম দম্পতি, অর্থাৎ যারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম, এদের সংখ্যা ৪,১৮৭। এখন আরো বেড়েছে এবং সক্ষম দম্পতির মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৫০০। এদের মধ্যে মাত্র ১০ জন (মহিলা) সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি নিয়ে যায়। কনডম ব্যবহার করতে পুরুষেরা তেমন উৎসাহী নয়, নিতেও আসে না। অবশ্য, আমাদের পরিদর্শন সময়ে জানা গেল ৬/৭ মাস থেকে এখানে কনডমের সাপ্লাই ছিল না, কেবলই এসেছে। শুনলাম, জনাপঞ্চাশেক মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন 'ডিপোপ্রভেরা' নিয়েছে; কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নানা দেহগত অসুবিধা ভোগ করছে।

পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ কাজে ৬ জন মাঠকর্মী পায়রাবন্দের বিভিন্ন এলাকায় 'কর্তব্যরত'। কিন্তু বিরাট একটি ইউনিয়নে, মৌজাসংখ্যা যেখানে ২১টি, রয়েছে বহু পাড়া-মহল্লা, সেখানে মাত্র ৬ জন মাঠকর্মীর পক্ষে কীভাবে পুরোপুরি দায়িত্ব পালন সম্ভব? তার মানে সক্ষম দম্পতিদের ঘরে ঘরে গিয়ে মোটিভেশন ওয়ার্ক কিংবা ফলোআপ হচ্ছে না। হাতেগোনা যে ক'জন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি নিয়ে যান, তা তাঁরা নিয়মিত খান না। পায়রাবন্দের বেশ কয়েকটি ভেতর-গ্রামে গিয়ে আমি পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়েছি। অনেকে মাঠকর্মীকে চেনে না, চোখেও দেখেনি। দেবীপুর গ্রামে কয়েকজন মহিলা জানাল, এ এলাকায় নাকি অনেকদিন পরপর মাঠকর্মী এসে ঘুরে যায়। সদরপুরে শুনলাম, মাঠকর্মী আসে তবে দুস্থ গরিবদের ঘরে নয়, আসে গ্রামের অবস্থাপন্নদের বাড়িতে।

পায়রাবন্দ, যেখানে রয়েছে বাল্যবিবাহ, যৌতুকপীড়ন তালাক তথা বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন, সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষদের মাথাব্যথা কম, বরং মেয়েরাই এ ব্যাপারে উৎসাহী বেশি। এ কারণেই ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রটিতে পুরুষদের আগমন তেমন ঘটে না, বড়ি এবং ইনজেকশন মেয়েরাই অনেক দূরের পথ হেঁটে সংগ্রহ করতে আসে। একজন মহিলা আলাপকালে বলল: সে নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে বড়ি খায়, কেননা স্বামী তা পছন্দ করে না, বরং মনে করে এসব না-জায়েজ কাজ। ...হ্যাঁ, পায়রাবন্দের গ্রামে বেশকিছু পুরুষের মধ্যে এখনো এমন ধারণা রয়েছে যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ধর্মবিধিসম্মত নয়। দৈনিক আয় ১০ থেকে ১২ টাকা অথচ ঘরে ৪/৫ টি অপুষ্টি আক্রান্ত সন্তান রয়েছে এমন দরিদ্র একজন ক্ষেতমজুর আমাকে বলেছে, 'খোদার উপর খোদকারি করা মানুষের ঠিক নয়। জান দিবেন তিনি, খাওয়া দিবেন তিনি।'

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্র যেমন করুণ, তেমনি আবার সরকারের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম হয়েছে ব্যর্থ। পায়রাবন্দের সাড়ে চার হাজার সক্ষম দম্পতির মধ্যে একটি মোট অংশ বছর বছর সন্তান প্রসব করছে জনসংখ্যার চাপে ভারি বাংলাদেশ।

পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে সচেতন করে তোলার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উদ্বুদ্ধকরণ কাজ। সেটি হচ্ছে না। সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগকৃত মাত্র ৬ জন মাঠকর্মীর কাজ সন্তোষজনক নয়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মোড়ল-মাতবর, মসজিদের ইমাম, মৌলবি-মুনশি, স্কুল-শিক্ষক–এঁরা তাঁদের ভূমিকা পালন করছেন না। কিছু যুবক, যারা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে কিছুটা সচেতন; কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে লজ্জা পায় তারা। পাড়াপ্রতিবেশী প্রায় সবাই সম্পর্কে চাচা-চাচি, খালু-খালা, ফুপা-ফুপু; তাদের ঘরে গিয়ে সন্তান উৎপাদন কমানোর কথাটি বলা যুবকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

১৯৭১-'৭২ সালের দিকে পায়রাবন্দের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬ হাজার। এখন ২২ হাজারের বেশি। অর্থাৎ ২০

> বছরের ব্যবধানে এলাকার জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৬ হাজার।[২৫]

একটা জনপদের চিকিৎসাব্যবস্থা অব্যবস্থাপনার ফলে মানুষ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং তা সমাধানের উপায় বাতলে দিলে কী কী সমস্যার সমাধান হতে পারে; মোনাজাতউদ্দিনের চিকিৎসা বিষয়ক রিপোর্টগুলো পড়লে সহজেই অনুমেয়। মোনাজাতউদ্দিন কাজ করেছেন মৌলিক চাহিদার একটা বড় অংশ চিকিৎসা সংক্রান্ত অসচেতনতা নিয়ে, আর এর পেছনে কাজ করেছিল মূলত তার জনসাংবাদিকতার মানসিকতা। তার চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিবেদনের কৌশল এবং উপস্থাপনও ছিল প্রচলিত সংবাদ-কাঠামোর তুলনায় ভিন্ন আঙ্গিকে।

চিকিৎসা বিষয়ক অব্যবস্থাপনার ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। ২০/২২ বছর আগে যে এলাকার জমির মূল্য ছিল কম ২০/২২ বছর পর তা বহুগুণ বেড়ে গেছে, বাড়িঘরও উঠেছে লাগালাগি। ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কাজের সন্ধানে মানুষ এলাকা ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছে অন্য এলাকায়। কিংবা অন্য এলাকা থেকে লোক আসাও বন্ধ হয়েছে। যে মানুষটি একসময় জমিতে কৃষি কাজ করত সে হয়েছে রিকশাওয়ালা। কেউবা অন্যের জমিতে মজুর। মোনাজাতউদ্দিনের লেখায় উঠে এসেছে একটা এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনার ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধসের খবর। গ্রামীণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার খবর এর চেয়ে সফল করে আর কারও পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি, যেমনটি করতে পেরেছিলেন মোনাজাতউদ্দিন। জনসংখ্যা সমস্যা কী ভয়াবহ রূপ নিতে পারে তিনি তা দেখিয়েছেন–

> বাংলাদেশের বহু যুবক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কাজ নিয়ে চলে গেছে, এখনো সে প্রবণতা অব্যাহত। পায়রাবন্দের অশিক্ষিত ভূমিহীন এবং বেকার যুবক সে খবর রাখে না। ভালো আয়-উপার্জন এবং অবস্থা ফেরানোর জন্যে শফি মিয়ার মতো তারা সিলেট কিংবা ঢাকা শহরে যেতে চায়। যেতে চায় দেশ থেকে বিদেশে। আর বিদেশে না গিয়ে এখানে করবেই-বা কী? জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়েছে বর্গাচাষীর সংখ্যা; কিন্তু জমি মিলছে না। বেড়েছে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা; কিন্তু কাজ মিলছে না মজুরির হারও তো খুব কম![২৬]

মোনাজাতউদ্দিন মনে করতেন, শহর-গ্রামের সংবাদ আলাদা বলে কিছু নেই। সব সংবাদই সমান গুরুত্ব বহন করবে সংবাদমূল্য অনুযায়ী। আর এ বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুঝলেও পুঁজিস্বার্থের কারণে তারা তা অনেকটাই নারাজ। সব সংবাদ যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছুটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই সংবাদপত্রগুলোর কিছুটা উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়, গ্রামীণ মানুষের সংবাদ পরিবেশনে।

> কয়েক বছর আগেও, এই মফস্বলের পাতার ছবি মানে ছিল কোনো অনুষ্ঠানে ডিসি-এসডিও সাহেবদের ফিতাকাটা, ডাকাত ধরা পড়লে পেছনে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো পুলিশের ছবি, ভাঙ্গা রাস্তা সেতু, এ ধরনের বাঁধা বিষয়ের আরো কিছু। এখন বহু নতুন নতুন বিষয়ের ওপর ছবি ছাপা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যশূন্যতা বা তথ্যবিভ্রান্তি থাকলেও গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি ও সামাজিক ব্যাপার বিষয়গুলো আসছে খবর বা ফিচার হিসেবে, অবশ্য যেসব পত্রিকায় স্পেস আছে, সেগুলোতে। সেই শুরু থেকে ঢাকার বাইরের খবরগুলোকে, 'মফস্বলের' খবর হিসেবে দেখা হয়ে আসছিল, এখন তা বেশ কেটে যাচ্ছে। সাংবাদিকতার সদর-মফস্বল বলে কিছু নেই সেটা বুঝতে পারছেন সংশ্লিষ্টরা। 'সংবাদ' কর্তৃপক্ষ একসময় মফস্বল ডেস্কটিকে ভেঙে ন্যাশনাল ডেস্কের সাথে এক করার উদ্যোগ নেন, নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি; কিন্তু ব্যাপকভাবে সমন্বয় সাধিত হয়েছে ঢাকার সংবাদ আর ঢাকার বাইরের সংবাদ সংগ্রহ বা প্রাপ্তি, সম্পাদনা, পরিবেশনার মধ্যে। তবে এখন পর্যন্ত কয়েকটি মহানগরী বাদে আর সব জেলা থানার খবরগুলো সম্পাদনা-পরিবেশনার জন্যে আলাদা ডেস্ক আলাদা রয়েই গেছে। মনে হয় না যে, এতে খবরের অবমূল্যায়ন হচ্ছে।[২৭]

স্পষ্টতই বলা যায়, মোনাজাতউদ্দিনের সংবাদ ধরনের কারণেই মিডিয়া হাউসগুলোর নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছিল।

মোনাজাতউদ্দিনের লেখায় এসেছে বহু পেশার মানুষের কথা। যেমন– মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার, চোর, পুলিশ, মুনশি, ইমাম-মোয়াজ্জেম, কাজী, ফটকা-ব্যবসায়ী, অতি মুনাফালোভী মজুতদার, সুদখোর মহাজন, সরকারি চাকুরে, স্কুলশিক্ষক, সেনাবাহিনীর সদস্য, জনপ্রতিনিধি, হাতুড়ে ডাক্তার, ফকির, কবিরাজ, জেলে, নাপিত. দর্জি, কুমার, মেকার, মাঝি, গরুচোর, ছিঁচকে চোর, তাড়ি ব্যবসায়ী, গাঁজা ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, ফড়িয়া, দালাল, ছোট ব্যবসায়ী, কামলা-কৃষাণ। অর্থাৎ মোনাজাতউদ্দিনের সাংবাদিকতা ঘিরে রয়েছে গ্রামের বিচিত্র পেশার মানুষের ভিড়। শহরের ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে থাকা মানুষের কথা তাঁর লেখনীতে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠেনি, তাঁর কাগজের প্রাণজুড়ে আছে মাটির সানকিতে ভাত খাওয়া অথবা না খাওয়া মানুষ। বলা যেতেই পারে, মোনাজাতউদ্দিন সাংবাদিকতায় সেই ধরন নির্মাণ করতে পেরেছিলেন, যে ধরনে জনসাংবাদিকতার রূপ ফুটে উঠেছিল। যা তাঁর সংবাদ প্রতিবেদন বিশ্লেষণে ফুটে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, জীবনী গ্রন্থমালা, মোনাজাতউদ্দিন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ২০০১, পৃ. ১১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
৩. মোনাজাতউদ্দিন, পথ থেকে পথে, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১১৮-১২০।
৪. মোনাজাতউদ্দিন, পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ১০৪।
৫. শহীদুল ইসলাম, আমার চোখে মোনাজাতউদ্দিন, শহীদুল্লাহ পাটোয়ারী সম্পাদিত, চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন, বাণিজ্য বিচিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৪।
৬. মোনাজাতউদ্দিন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, গ্রামীণ পর্যায় থেকে, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃ. ৫-৭।
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।
৯. মোনাজাতউদ্দিন, পায়রা বন্দের শেকর সংবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭-১৮।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৫।
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-৩০।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪- ৪৬।
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
২১. প্রাগুক্ত, ৪৭-৪৮।
২২. প্রাগুক্ত, ৪৯-৫০।
২৩. প্রাগুক্ত, ৭৬-৭৮।
২৪. প্রাগুক্ত, ৭৮-৭৯।
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
২৭. মোনাজাতউদ্দিন, কাগজের মানুষেরা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৪৩।

লেখক: সহকারী সম্পাদক, পিআইবি

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার ওয়াকিল আহমেদ হিরনের হাতে 'বজলুর রহমান স্মৃতিপদক' তুলে দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতা

সাংবাদিক হিরন ও আলাউদ্দিন পেলেন বজলুর রহমান স্মৃতিপদক

গণমাধ্যমে করপোরেট সংস্কৃতির প্রবেশের ফলে সংবাদের বস্তুনিষ্ঠতা ও মান কতটুকু বেড়েছে তা সংশ্লিষ্টদের ভেবে দেখার তাগিদ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। একই সঙ্গে সংবাদ জগতের বাইরের কেউ যেন গণমাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গত ৯ এপ্রিল রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক-২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। এবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে পদক পেয়েছেন সমকালের সিনিয়র রিপোর্টার ওয়াকিল আহমেদ হিরন। গত বছর ১৬ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত 'মুক্তিযুদ্ধে সেই সব টর্চার সেল' শিরোনামে প্রকাশিত ১০ পর্বের প্রতিবেদনের জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে যমুনা টেলিভিশনের উপ-সম্পাদক আলাউদ্দিন আহমেদ পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট ও একলাখ টাকার চেক তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী প্রমুখ। এ সময় জুরিবোর্ডের দুই সদস্য ফরিদুর রেজা সাগর ও রোবায়েত ফেরদৌস উপস্থিত ছিলেন। (সূত্র: ১০ই এপ্রিল ২০১৭, সমকাল)

বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবস

বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবস গত ৩ মে পালিত হয়। চলতি বছর এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'ক্রান্তিকালে সমালোচকদের দৃষ্টি : শান্তিপূর্ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের ভূমিকা'। ১৯৯১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৩ সাল থেকে এ দিবসটি বিশ্বে প্রতিবছর পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস এক বার্তায় বলেছেন, 'বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতায় দিন দিন সংবাদকর্মীদের সঠিক তথ্য প্রকাশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। সাংবাদিকদের সামনে প্রতিকূল পরিবেশও বাড়ছে।' তিনি সবার প্রতি সাংবাদিকদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের প্রতি দায়িত্বশীল ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার আহ্বান জানান।

সিপিজে'র প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক দশকের বিবেচনায় সাংবাদিকতার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিকূল দেশ ইরাক। দেশটিতে এক দশকে নিহত হয়েছেন ১৭৯ জন সাংবাদিক। এরপর সবচেয়ে বেশি সাংবাদিক নিহত হয়েছেন সিরিয়ায় ১০৮ জন। এছাড়া ফিলিপাইনে ৭৮, সোমালিয়ায় ৬২, আলজেরিয়ায় ৬০, পাকিস্তানে ৬০, রাশিয়ায় ৫৬, কলম্বিয়ায় ৪৭, ভারতে ৪০, মেক্সিকোতে ৪০, ব্রাজিলে ৩৯, আফগানিস্তানে ৩১, তুরস্কে ২৫, বাংলাদেশে ২১, শ্রীলঙ্কায় ১৯, বসনিয়ায় ১৯, রুয়ান্ডায় ১৭, তাজাকিস্তানে ১৭, সিয়েরালিওনে ১৬ এবং ইসরায়েল অধিকৃত ফিলিস্তিন এলাকায় ১৬ জন নিহত হয়েছেন।

২০১৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মেক্সিকোতে তিনজন এবং বাংলাদেশ, ইরাক, সিরিয়া, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনে একজন করে সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। চলতি বছর বাংলাদেশে নিহত সাংবাদিক সমকালের শাহজাদপুর প্রতিনিধি আবদুল হাকিম শিমুল। গত ৩ ফেব্রুয়ারি শাহজাদপুরের মেয়র হালিমুল হক মিরু সরাসরি সাংবাদিক শিমুলকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। গুলি লেগে গুরুতর আহত অবস্থায় মারা যান শিমুল। (সূত্র: ৩ মে ২০১৭, সমকাল)

দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৬ সাংবাদিক

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে গত ২৮ মার্চ দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

সঠিক তদন্ত ও শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় দুর্নীতিবাজরা পার পেয়ে যায়। তারা উল্টো উৎসাহ বোধ করে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুর্নীতিসংক্রান্ত সেরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য 'দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এ কথা বলেন।

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে গত ২৮ মার্চ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয়। উন্নয়নের পথে যত বড় বাধা আছে, তার মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। দুর্নীতি শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বের সমস্যা। কোনো কোনো দেশে দুর্নীতির জন্য সরকারের পতন হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী বদলেছে, রাষ্ট্রপতিও বদলে গেছে।'

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ

ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর, একাত্তর টিভি'র প্রধান নির্বাহী মোজাম্মেল বাবু, দুদক সচিব আবু মো. মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

এ বছর দুই ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে সেরা প্রতিবেদনের জন্য নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়। প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন দৈনিক সমকালের আবু সালেহ রনি আর দ্বিতীয় হয়েছেন দৈনিক প্রথম আলোর ফখরুল ইসলাম। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন মাছরাঙা টিভির ওবায়দুল কবির, দ্বিতীয় একাত্তর টিভির জেমসন মাহবুব এবং তৃতীয় হয়েছেন একুশে টিভির এম এম সেকেন্দার। বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন মাছরাঙা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি বদরুদ্দোজা বাবু। (সূত্র; ২৯ মার্চ ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

স্পেশাল কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ড অর্জন সংবর্ধনায় সিক্ত সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, 'সাংবাদিকতায় নারী সাংবাদিকদের বিচরণ বহুদিন হলেও নেতৃত্বে ছিল না। ফরিদা ইয়াসমিনই প্রথম ব্যক্তি যিনি নেতৃত্বে আসলেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। নারীর ক্ষমতায়নেও এটা বড় ভূমিকা রাখবে। তাঁর ভূমিকা নারীদের জন্যও অনুকরণীয় হবে। আর ফরিদা ইয়াসমিনের এই অর্জনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করছি, তিনি দক্ষতার সঙ্গে সাংবাদিকদের নেতৃত্ব দেবেন।'

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনকে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে প্রধান অথিতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। গত ২৩ মে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে তাঁকে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ৬৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম নারী সাধারণ সম্পাদককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

ফরিদা ইয়াসমিন মিডিয়া জগতে নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় এই সম্মাননা পান। 'স্পেশাল কংগ্রেসনাল সার্টিফিকেট' ইস্যু করেন মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসের চেয়ারপারসন কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলি। সম্প্রতি নিউইয়র্কে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী সাংবাদিক যিনি এই সম্মাননা পেলেন। এছাড়া তাঁকে আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন মার্কিন কংগ্রেসের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কমিটির প্রভাবশালী সদস্য ও ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেস মেং। এছাড়া একই সফরে তিনি পান 'নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক অ্যাডভোকেট' সম্মাননা, যা তুলে দেন লেটিসা জেমস।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ডানে সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ার। বায়ে যথাক্রমে প্রেস ক্লাব সভাপতি শফিকুর রহমান ও বিএফইউজে সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল

জাতীয় প্রেস ক্লাবে সেমিনার

বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যমের বর্তমান চিত্র' শীর্ষক সেমিনার গত ৩ মে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, তথ্য বিকৃতকারী, উস্কানিদাতা, চক্রান্তকারীরা চাপে রয়েছে। কোনো সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিক চাপে নেই। তিনি অ্যামনেস্টির প্রতিবেদনকে পক্ষপাতদুষ্ট, উদ্দেশ্যমূলক বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, অ্যামনেস্টি স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ায়নি। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পরও টু শব্দ করেনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত ৩৫টি অনলাইন পোর্টাল বন্ধ করা হয়েছে। তার কোনোটিই সরকারের বিরোধিতার জন্য নয়, বরং ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক লেখা প্রকাশের জন্য প্রশাসনের নির্দেশে ওই পোর্টালগুলো বন্ধ হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সমকালের সম্পাদক গোলাম সারওয়ার আদালত অবমাননা আইনের সংস্কার চান। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী নিবর্তনমূলক কোনো আইন না করার অনুরোধ জানান। তিনি সাংবাদিক হত্যার বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে করারও দাবি জানান।

বিএফইউজে'র একাংশের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুল বলেন, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম আংশিক মুক্ত। সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র নয় এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তরফ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এখানে রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপ না থাকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো অ্যামনেস্টির প্রতিবেদন সব কটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান বলেন, রাষ্ট্রের তরফ থেকে চাপ প্রয়োগের বিষয়টি একেবারেই অনুপস্থিত বলেই সংবাদমাধ্যমের সংখ্যা এত বেড়েছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমানের মতে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এখন সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে।

প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, 'আমরা কি সকলে জোরগলায় বলতে পারব আমাদের সব সমস্যা শেষ হয়ে গেছে? অন্তত পক্ষে আমি বলতে চাই, এই সমস্যাগুলো থেকে আমরা এখনো মুক্তি পাইনি। সংবাদমাধ্যমের জন্য সমস্যা আছে, চাপ আছে, ভয়-ভীতিও আছে।'

তবে সংবাদমাধ্যমের সংখ্যা বাড়া মানেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম। তিনি বলেন, 'সংবাদমাধ্যমের সম্প্রসারণ হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় যুক্তি খুঁজে পাই না, শুধু নারায়ণগঞ্জের মতো জায়গায় কেন ২৫টা পত্রিকা? এতে কি সাংবাদিকতা বিকশিত হচ্ছে? সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত হচ্ছে? আমরা কি গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছি?'

ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন বলেন, ভালো সাংবাদিকদের অনেককে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে 'ফ্রিডম অব প্রেস', 'ফ্রিডম অব স্পিচ' শব্দগুলো কীভাবে বিবেচিত হবে?

স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন। সঞ্চালনা করেন ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। সেমিনারটি আয়োজনে সহযোগিতা করেছে বেসরকারি সংস্থা এমআরডিআই ও ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট, সুইডেন। (সূত্র: ৪ মে ২০১৭, প্রথম আলো)

এছাড়া বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মমতাজউদ্দিন আহমেদ, অ্যাডভোকেট সানজীদা খানম এমপি, ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া, যুগ্ম-সম্পাদক ইলিয়াস খান, সিনিয়র সাংবাদিক আবদুল কাইয়ুম, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব ওমর ফারুক, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শাবান মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ। (সূত্র: ২৪ মে ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

আবাসন নিউজ
বর্ষসেরা সাংবাদিকের পুরস্কার পেলেন ছয় সাংবাদিক

রাজধানীর পান্থপথে এসইএল সেন্টার অডিটরিয়ামে গত ১৪ এপ্রিল সাংবাদিকদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। ছয়টি ক্যাটাগরিতে ছয় গণমাধ্যমকর্মীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন সমকালের সহ-সম্পাদক জাহিদুর রহমান, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সিনিয়র রিপোর্টার মাকসুদ-উন-নবী, জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক শাহেদ শফিক, রেডিও ধ্বনি'র স্টাফ রিপোর্টার মেসবাহ উল্লাহ শিমুল, দ্য নিউ নেশনের ফটো-সাংবাদিক মইনউদ্দিন আহমেদ এবং ডেইলি নিউ এজের চিফ ফটো-সাংবাদিক সানাউল হক। (সূত্র: ১৬ এপ্রিল ২০১৭, সমকাল)

রূপসী বাংলা ফটো প্রদর্শনী তিন আলোকচিত্রী পুরস্কৃত

বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পুরানা পল্টনে নিজস্ব মিলনায়তনে তিন দিনব্যাপী রূপসী বাংলা ফটো প্রদর্শনী করা হয়। গত ১৩ এপ্রিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব সাঈদ খোকন প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএফইউজে'র একাংশের সভাপতি শওকত মাহমুদ, অন্য অংশের মহাসচিব ওমর ফারুক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনায়েত করীম প্রমুখ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে এম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ও পৃষ্ঠপোষক জয়নাল আবেদীন রতন।

সারাদেশ থেকে পাঁচশ' ফটো-সাংবাদিকের তোলা এক হাজার ১০০ ছবির মধ্যে বাছাই করে ৫৬ জন ফটো-সাংবাদিকের শতাধিক ছবি প্রদর্শনীর জন্য চূড়ান্ত করা হয়। এই ছবিগুলোর মধ্য থেকে তিনজন ফটো-সাংবাদিককে সেরা আলোকচিত্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। প্রথম হয়েছেন নয়াদিগন্তের শফিউদ্দিন বিটু, দ্বিতীয় হয়েছেন ডেইলি স্টারের আনিসুর রহমান এবং তৃতীয় হয়েছেন সকালের খবরের মোহাম্মদ আসাদ। (সূত্র: ১৪ এপ্রিল ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

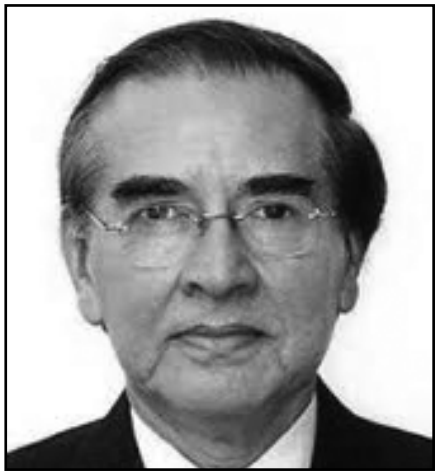

মাহফুজ আনাম আইপিআইয়ের নির্বাহী সদস্য

দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্‌ফুজ আনাম ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউটের (আইপিআই) নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২০ মে জার্মানির হামবুর্গে অনুষ্ঠিত আইপিআইয়ের ৬৬তম সাধারণ পরিষদে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। আইপিআইয়ের নির্বাহী পরিষদের অন্য নতুন সদস্য ভারতের মালালা মনোরমার জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক রিয়াদ ম্যাথিউ।

আইপিআইয়ের সদস্যরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়ে বলেছেন, তারা যেন মতপ্রকাশের ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পাশপাশি বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা পালন করে। সদস্যরা মেক্সিকোর গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২০১৭ সালে দেশটিতে সাতজন সাংবাদিক খুন হন। নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সভায় মাহ্‌ফুজ আনাম বলেন, 'স্বাধীন সাংবাদিকতা ও নীতিমান সাংবাদিকদের আদর্শ একটি বিখ্যাত বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের অংশ হতে পেরে সম্মান বোধ করছি। আমার সময়কালে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করে কাজ করব বলে আশা রাখি।' ডেইলি স্টার সম্পাদক এই পদে তিন বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। (সূত্র: ২১ মে ২০১৭, প্রথম আলো)

নবম বর্ষে দেশ টিভি

গত ২৬ মার্চ প্রতিষ্ঠার অষ্টম বর্ষ পূরণ করে নবম বর্ষে পদার্পণ করেন বেসরকারি চ্যানেল 'দেশ টিভি'। ২০০৯ সালের মহান স্বাধীনতা দিবসের এদিনে যাত্রা শুরু করে এটি। বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ও নানাবিধ আয়োজনের মাধ্যমে দর্শকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে টেলিভিশনটি। মহান স্বাধীনতা দিবস ও বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশ টিভি কার্যালয়ে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। (সূত্র: ২৬শে মার্চ ২০১৭, সমকাল)

১২ বছরে বাংলাভিশন

১১ পেরিয়ে ১২ বছরে পদার্পণ করছে বেসরকারি টিভি চ্যানেল বাংলাভিশন। ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ ওদৃষ্টি জুড়ে দেশ' স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করে চ্যানেলটি। এ উপলক্ষে চ্যানেলটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। (সূত্র: ৩১ শে মার্চ ২০১৭, সমকাল)

ছয় বছরে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর

গত ২৪ মে ছয় বছরে পদার্পণ করছে চ্যানেল টোয়েন্টিফোর। ২০১২ সালের ২৪ মে যাত্রা শুরু করা এই টেলিভিশন চ্যানেল এরই মধ্যে পাঁচবছর পূর্ণ করেছে। প্রতিষ্ঠার পর অল্পদিনেই দর্শকপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছে চ্যানেলটি। শুরু থেকেই তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে আর তারুণ্যে ভর করা একদল সাহসী সাংবাদিকের অক্লান্ত পরিশ্রমে টোয়েন্টিফোরের সংবাদ দর্শকদের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। (সূত্র: ২৪ মে ২০১৭, সমকাল)

মনজুরুল আহসান বুলবুল আইফেক্স কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত

গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনের (আইএফইএক্স-আইফেক্স) কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল। মধ্য জুনে কানাডার মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত আইফেক্সের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিত হন তিনি। বিশ্বের ৮৪টি দেশের ১০৪টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা ভোট দিয়ে দুই বছর মেয়াদের জন্য ১৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন।

গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ফেডারেশন হিসেবে কাজ করে আইফেক্স। এর সদর দফতর কানাডায়।

এবারের সভায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আরও ১৭টি সংগঠনকে নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (সূত্র: ২৯ জুন ২০১৭, প্রথম আলো)

ওমর ফারুকের পরিবারকে অনুদান দিলো ডিআরইউ

অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের প্রয়াত সাংবাদিক এম ওমর ফারুকের পরিবারকে অনুদান দিয়েছে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)। গত ১৪ মে সংগঠনের সাগর-রুনী মিলনায়তনে এক স্মরণসভায় অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া প্রয়াত সাংবাদিকের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তিও দেওয়া হয়।

ডিআরইউ সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন বাদশার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুরসালিন নোমানীর সঞ্চালনায় শোকসভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব ওমর ফারুক, এম ওমর ফারুকের স্ত্রী সানজিদা শওকত, ডিইউজে'র সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী, বিএফইউজে'র যুগ্ম-মহাসচিব অমিয় ঘটক পুলক, ডিআরইউ'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রয়াত ওমর ফারুকের পরিবারের কাছে ডিআরইউ'র গ্রুপ বীমার দুই লাখ এবং ডিআরইউয়ে'র নিজস্ব কল্যাণ ফান্ডের এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়। সূত্র: (১৫ই মে ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

সাহসিকতায় পুলিৎজার ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমসের

যুক্তরাষ্ট্রে দুঃসাহসিক সাংবাদিকতার জন্য এ বছর পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' ও 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আর্থিক অনুদান কেলেঙ্কারি ও তাঁর নারীবিদ্বেষী বক্তব্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ পুরস্কার পেয়েছেন ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক ডেভিড ফাহরেন্টহোল্ড। এছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য পুলিৎজার জিতেছে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা। গত ১০ এপ্রিল চলতি বছরের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ওই দু'টি পত্রিকা নিয়ে এবারের পুরস্কার জেতার তালিকায় রয়েছেন মোট ১৫ সাংবাদিক-লেখকসহ ২১ পত্রিকা ও সংস্থা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ, প্রো-পাবলিকা, ১০ সংবাদকর্মীর পত্রিকা আইওয়া অঙ্গরাজ্যের স্টর্মলেক টাইমস এবং তিন শতাধিক সাংবাদিকের আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম আইসিআইজে। প্রতিবছর দেশটিতে অনুসন্ধানী ও সাহসী সাংবাদিকতা ছাড়াও আলোকচিত্রকলা, কার্টুন, নাটক, কবিতা, ইতিহাস, সঙ্গীতসহ ২১টি বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়। খবর নিউইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান ও ওয়াশিংটন পোস্টের।

পুলিৎজার কমিটি জানায়, গণমাধ্যমের জন্য প্রতিকূল এ পরিবেশের মধ্যে পত্রিকা দু'টি দুই ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশে যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছে, তাতে এ পুরস্কার তাদেরই প্রাপ্য।

অদম্য ১০ নারীকে অনন্যা সম্মাননা

অদম্য ১০ নারীকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে গতকাল শনিবার দেওয়া হয় ২৪তম অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা-২০১৬।

গত ৬ মে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ১০ নারীর হাতে সম্মাননা তুলে দেন কৃষিমন্ত্রী

মতিয়া চৌধুরী। এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক ড. রওনক জাহান ও কবি-সংসদ সদস্য কাজী রোজী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পাক্ষিক অনন্যা'র প্রকাশক ও সম্পাদক তাসমিমা হোসেন।

আয়োজকরা জানান, ১৯৯৩ সাল থেকে অনন্যা শীর্ষদশ সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। গত ২৩ বছরে ২৩০ জন সংগ্রামী নারী পেয়েছেন এই সম্মাননা। শীর্ষদশ সম্মাননাপ্রাপ্ত ২৩০ নারীর অর্জন ও জীবনযুদ্ধ নিয়ে অনন্যার অনন্য প্রকাশনা 'শীর্ষদশ কপি টেবিল বুকের' তৃতীয় সংস্করণ এবার প্রকাশিত হয়েছে। (সূত্র: ১৭ মে ২০১৭, সমকাল)

এছাড়া দ্য ডেইলি নিউজ এবং প্রো-পাবলিকা জনসেবামূলক সাংবাদিকতার জন্য পুলিৎজার জিতেছে। গরিব সংখ্যালঘুদের ওপর নিউইয়র্ক পুলিশের নিপীড়ন নিয়ে প্রতিবেদন করেছে তারা। অন্যদিকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পেগি নুনানকে মন্তব্য প্রতিবেদনের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অন্য বিজয়ীদের মধ্যে আছে তিন শতাধিক সাংবাদিকের একটি আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম আইসিআইজে। তারা সম্প্রতি 'পানামা পেপারস' ফাঁস করে বিশ্বব্যাপী হৈচৈ ফেলে দিয়েছে।

এছাড়া মাত্র ১০ জন সংবাদকর্মী নিয়ে কাজ করে পুলিৎজার পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের স্থানীয় পত্রিকা 'স্টর্ম লেক টাইমস'। একই পরিবারের সদস্য এই ১০ সাংবাদিকের পত্রিকাটি আইওয়ার কৃষিভিত্তিক কোম্পানিগুলো নিয়ে বড় বড় সংবাদ প্রকাশ করেছে। (সূত্র: ১২ এপ্রিল ২০১৭, সমকাল)

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পড়লেন উপস্থাপিকা

টেলিভিশনের ব্রেকিং নিউজে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় যাত্রীদের নিহত হওয়ার খবর পড়ছিলেন সংবাদ পাঠিকা। খবর পাঠের একপর্যায়ে টের পেলেন দুর্ঘটনায় নিহতদের একজন তারই স্বামী। সম্প্রচারে নিজেকে সামলে রাখার কঠিনতম কাজটি করতে পারলেও এমন দুঃসংবাদ পাঠ শেষ করেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ওই সংবাদ পাঠিকার নাম সুপ্রীত কর। তিনি ভারতের ছত্তিশগড়ের আইবিসি-টোয়েন্টিফোর নামের একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ পাঠিকা। গত ৮ এপ্রিল সকালে যথারীতি সংবাদ পড়ছিলেন সুপ্রীত। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি নিয়ে একটি ব্রেকিং নিউজ আসে। চ্যানেলের এক সাংবাদিকের সঙ্গে সুপ্রীত সরাসরি (লাইভ) ফোনে যুক্ত হন। সাংবাদিক জানান, ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দ জেলার পিঠারাতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় লাইভ ফোনে জানাননি সাংবাদিক। তবে একটি রেনো ডাস্টার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে এই প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানান তিনি। দুর্ঘটনার স্থান ও গাড়ির বিবরণ শুনে সুপ্রীত আশঙ্কা করেন, হতাহত ব্যক্তিদের মধ্যে তার স্বামী থাকতে পারেন। কারণ, কয়েকজন সঙ্গীসহ একই পথ দিয়ে কোম্পানির গাড়িতে তার স্বামীর কর্মস্থলে যাওয়ার কথা। আর তাদের গাড়িটাও ছিল রেনো ডাস্টার। খবর শেষ হলে স্টুডিও থেকে

বেরিয়ে ওই সাংবাদিককে ফোন করেন সুপ্রীত। দুর্ঘটনায় নিহত তিনজনের মধ্য তার স্বামী হর্ষদ কর রয়েছেন বলে নিশ্চিত হন তিনি। সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীর নিহত হওয়ার খবরে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুপ্রীত। পরে তিনি স্বজনদের ফোন দিয়ে এই দুঃসংবাদ জানান। ২৮ বছর বয়সি সুপ্রীত গত ৯ বছর আইবিসি-টোয়েন্টিফোর চ্যানেলে সংবাদ পাঠিকার কাজ করছেন। (সূত্র: ১০ এপ্রিল ২০১৭, সমকাল)

মেক্সিকোয় সাংবাদিক হত্যায় পত্রিকা বন্ধ

এক নারী সাংবাদিক খুনের প্রতিবাদে প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে মেক্সিকোর একটি পত্রিকা। 'নর্তে দে সোদাদ জুয়ারেজ' নামের ওই পত্রিকাটি গত ২ এপ্রিল সম্পাদকীয়তে জানায়, এটিই তাদের শেষ ছাপা সংস্করণ। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সাংবাদিকদের প্রতি সহিংসতা ও বিচারহীনতার প্রতিবাদে তারা পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছে। গত মার্চ মাসে মেক্সিকোতে তিনজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়, যার একজন ওই পত্রিকাটির সাংবাদিক মিরোস্লাভা ব্রিচ।

মেক্সিকোতে সাম্প্রতিক সংঘটিত কিছু অপরাধের সঙ্গে রাজনীতিবিদদের সম্পৃক্ততা নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন ব্রিচ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওই প্রতিবেদনের জন্যই খুন হন নারী সাংবাদিক ব্রিচ।

এরই প্রতিবাদে নর্তে ছাপা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদক অসকার কান্টু বলেন, এই দেশে সাংবাদিকদের কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা কোনোটাই নেই। আমি আমার সহযোগীদের হারাতে চাই না। নিজেও মরতে চাই না। তিনি জানান, রোববার প্রকাশিত পত্রিকাই তাদের শেষ সংস্করণ। তবে পত্রিকাটি অনলাইনে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের সুরক্ষায় কর্মরত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাডভোকেসি সংগঠন কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টের (সিপিজে) পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত মেক্সিকোতে ৮৮ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নিশ্চিতভাবে পেশাগত কারণে খুন হয়েছেন ৩৮ সাংবাদিক। (সূত্র: ৪ এপ্রিল ২০১৭, সমকাল)

ক্যামেরা ছুঁড়ে ফেলে শিশুর জীবনরক্ষা

গত ১৫ এপ্রিল ঘটল হৃদয় নাড়ানো ঘটনা। সিরিয়ার আলেপ্পো শহরের পশ্চিমে বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত রাশিদিন এলাকার একটি তল্লাশিচৌকিতে অপেক্ষা করছিল কয়েকটি বাসের বহর। দেশটির অবরুদ্ধ শহরগুলো থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল বাসিন্দাদের। এমন সময় বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি ঢুকে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ১২৬ জন প্রাণ হারায়, যার মধ্যে ৬৮টি শিশু ছিল।

ঘটনাস্থলে পেশাগত দায়িত্ব পালন করছিলেন সিরিয়ার ফটো-সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী আবদ আলকাদার হাবাক। বিস্ফোরণের নৃশংসতার দৃশ্য দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। তখন তাঁর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে হতাহত ব্যক্তি। আগুন আর চিতার এই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে হাবাক তাঁর ক্যামেরা ফেলে ছুটে যান আহত ব্যক্তিদের সহায়তায়। ছয়-সাত বছরের একটি শিশুকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছোটেন হাবাক। পরিস্থিতি এমন- একজন ফটো-সাংবাদিক আগে ছবি তুলবেন, নাকি দুর্গতকে সহায়তা করবেন? হাবাক বেছে নিলেন মানবিকতা।

হাবাক একটি শিশুকে উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে দিয়ে আবার ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন আরেক শিশুকে বাঁচাতে। কিন্তু এসে দেখেন শিশুটি ততক্ষণে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তাকে বাঁচাতে না পেরে পাশেই কান্নায় ভেঙে পড়েন হাবাক।

সিরিয়ায় ওইদিনের ঘটনার দৃশ্য ছিল এমন- প্রথম যে শিশুর কাছে হাবাক এগিয়ে গেলেন, সে তখন প্রায় আধমরা। এরপর তিনি দৌড় দেন আরেকজনের কাছে। কেউ একজন চিৎকার করে তাঁকে বলছিল, দূরে থাকো...সেও মরে গেছে। কিন্তু হাবাক নিজে পরখ করে দেখতে চাইলেন। এগিয়ে গেলেন শিশুটির কাছে। শিশুটি কোনোমতে শ্বাস নিচ্ছে। প্রাণ আছে। দ্রুত তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে অ্যাম্বুলেন্সের উদ্দেশে ছুটেন। তখনো তাঁর হাতে ঝোলানো সচল ক্যামেরা এই ধ্বংসযজ্ঞ রেকর্ড করে চলেছে।

হাবাক সিএনএন'কে বলেন, 'শিশুটি আমার হাত ধরল। এরপর চোখ দু'টি একটু ফাঁক করে তাকাল।' তিনি বলেন, 'সেখানকার দৃশ্য ছিল নির্মম। বিশেষ করে শিশুদের চিৎকার। আমার সামনেই কয়েকজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।' এ পরিস্থিতিতে আমি ও আমার সহকর্মীরা আহত ব্যক্তিদের সাহায্যের সিদ্ধান্ত নেই। পরে আমরা আমাদের ক্যামেরা একপাশে রেখে আহত লোকজনকে উদ্ধার করতে লাগলাম। হাবাকের উদ্ধার অভিযানের এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন ঘটনাস্থলে থাকা আরেক আলোকচিত্রী মুহাম্মদ আলরাগিব। (সূত্র: ১৯ এপ্রিল ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

ফিলিপাইনে সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

ফিলিপাইনে একটি সংবাদপত্রের কলামিস্টকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সোমবার দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় প্রদেশ মিসবেটে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত সাংবাদিকের নাম জ্যাকুইন ব্রিয়নস। তিনি রিমেট নামের একটি ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের হয়ে কাজ করতেন। রিমেট সংবাদপত্রের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক লাইদিয়া বুয়েনা বলেন, ব্রিয়নস একজন স্পষ্টভাষী প্রতিবেদক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই জুয়া, মাদক, অবৈধপন্থায় মাছ ধরা বিষয়ে লিখতেন। তাঁর মতে, 'এমনই কোনো প্রতিবেদন ব্রিয়নসের মৃত্যুর কারণ।' বুয়েনা আরো জানান, 'ব্রিয়নস বেশ কয়েকবার হত্যার হুমকি পেয়েছিলেন।' সূত্র : এএফপি। (সূত্র: ১৫ মার্চ ২০১৭, কালেরকণ্ঠ)

শোক সংবাদ

হোসাইন-উজ-জামান

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক হোসাইন-উজ-জামান চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

১১ এপ্রিল রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। জাতীয় প্রেস ক্লাবে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হোসাইন-উজ-জামান ১৯৯৬ ও ১৯৯৯ দুই দফায় বাসসের এমডি ও প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

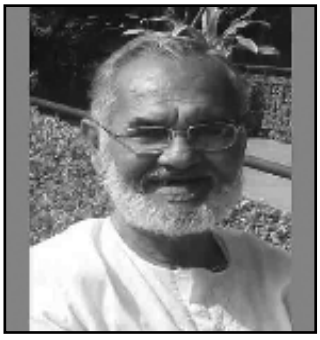

মাহমুদুল হাসান

ময়মনসিংহের প্রবীণ সাংবাদিক ও নাসিরাবাদ কলেজের দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক এ জেড এম মাহমুদুল হাসান (৭৪) গত ২৯ মে ঢাকায় মেয়ের বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। কর্মজীবনে ১৯৫৫ সালে ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির (এনা) মাধ্যমে সাংবাদিকতা এবং একই সময়ে তিনি নাসিরাবাদ কলেজের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের ময়মনসিংহ সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মাহমুদুল হাসান একাধিকবার ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

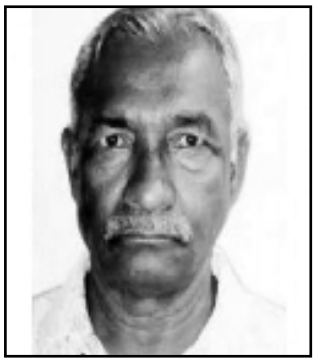

শামসুদ্দিন আহমেদ

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও প্রবীণ সাংবাদিক শামসুদ্দিন আহমেদ (৭৯) ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। তিনি গত ৮ মে সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

শামসুদ্দিন আহমেদ বার্তা সংস্থা এনা, ইউএনবি, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, নিউ নেশন, ইন্ডিপেনডেন্ট, টেলিগ্রাফ ও রেডিও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন।

আমির হোসেন

ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি সানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আমির হোসেন (৭৩) গত ৬ মার্চ ইন্তেকাল করেন (ইন্না ... রাজিউন)।

আমির হোসেন ৫ মার্চ নিজ বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বসুন্ধরার ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া কম্পাউন্ডে গতকাল দুপুরে মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে। তাঁকে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার ক্রোকচর গ্রামে দাফন করা হয়। আমির হোসেন পাকিস্তান আমলে তাঁর সাংবাদিকতার ক্যারিয়ার শুরু করেন সেসময়ের প্রধান সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক থেকে। এরপর বাংলার বাণী, জয়বাংলা, বাংলাদেশ টুডেসহ বেশ কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সাযযাদ কাদির

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক সহযোগী সম্পাদক, কবি, সাংবাদিক সাযযাদ কাদির গত ৬ এপ্রিল রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

সাযযাদ কাদির ছিলেন ষাটের দশকের অন্যতম কবি, গবেষক, প্রাবন্ধিক। শিক্ষকতা ছেড়ে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতা। তিনি দৈনিক মানবজমিনের যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সাযযাদ কাদিরকে গত ৭ মে টাঙ্গাইল শহরের বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এবং তাঁর নিজ গ্রাম দেলদুয়ার উপজেলা সদরের জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁদের মৌলভিবাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও সাযযাদ কাদির তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ-গবেষণা, শিশুতোষ, সম্পাদনা-সংকলন, অনুবাদসহ সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায়। তাঁর ৬০টির অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- যথেচ্ছ ধ্রুপদ (কাব্যগ্রন্থ), চন্দনে মৃগপদচিহ্ন (গল্পগ্রন্থ), লাভস্টোরি (অনুবাদ), রাজরূপসী, প্রেমপাঁচালী, হারেমের কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধসমগ্র (সংকলন), বেগম রোকেয়া প্রবন্ধসমগ্র (সংকলন), পৃথিবীর প্রিয় প্রণয়ী, অপর বেলায় (উপন্যাস), অন্তর্জাল (উপন্যাস), রবীন্দ্রনাথ : শান্তিনিকেতন (গবেষণা), রবীন্দ্রনাথ : মানুষটি (গবেষণা), নারীঘটিত (প্রবন্ধ), খেই (উপন্যাস), বৃষ্টি বিলীন (কাব্যগ্রন্থ)। তিনি জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গের নাথ সাহিত্য ও কৃষ্টিকেন্দ্রিক সাহিত্য পত্রিকার শৈবভারতী পুরস্কার, বাচসাস পুরস্কার, এম নুরুল কাদের পুরস্কার, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব পদক, ভাষাসৈনিক শামসুল হক পদক, পশ্চিমবঙ্গের কবি বিষ্ণুদে পুরস্কার, টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদ পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সিদ্দিক আহমেদ

বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সিদ্দিক আহমেদ (৭১) আর নেই। ১২ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। সিদ্দিক আহমেদ ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। তিনি পেশাগত জীবনে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৯১ সাল থেকে দৈনিক আজাদীতে সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ঢাকায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেন তিনি। ২০১৫ সালে পেশাগত জীবনের ইতি টানেন। ১৯৪৬ সালের ৩১ জুলাই চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার গশ্চি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি।

সিদ্দিক আহমেদ 'দৈর্ঘ্যপ্রস্থ', 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া', 'খোলা জানালা' ও 'দক্ষিণের বারান্দা' শিরোনামে নিয়মিত কলাম লিখতেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই 'জল ও তৃষ্ণা'। অনুবাদ কবিতা 'আপেলে কামড়ের দাগ'। জীবনীমূলক বই 'কিছু মানবফুল'। চিত্রকলা নিয়ে বই 'পিকাসো'। প্রবন্ধগ্রন্থ কবিতার রাজনীতি, খোলা জানালায় গোপন সুন্দরবন, পৃষ্ঠা ও পাতা, প্রভৃতি ও ছিটেফোঁটা। তাঁর জীবন ও রচনা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে দু'টি স্মারকগ্রন্থ।

ওমর ফারুক

অনলাইন নিউজপোর্টাল 'বাংলা ট্রিবিউন'-এর বিশেষ প্রতিনিধি ওমর ফারুক (৫১) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ৩০ এপ্রিল রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর মৃত্যুতে সাংবাদিক নেতাদের পাশাপাশি একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন শোক জানিয়েছে।

বাংলা ট্রিবিউনের সংবাদকর্মীরা জানান, দুপুরে খবর গ্রহণের পর অফিসে প্রবেশের সময় হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন ওমর ফারুক। সহকর্মীরা তাঁকে তাৎক্ষণিক অফিসের পাশের স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করান।

বিনোদ খান্না

সত্তরের দশকের হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক বিনোদ খান্না আর নেই। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গত ২৭ এপ্রিল মুম্বাইয়ের শ্রী এন এইচ রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে মারা গেলেন ৭০ বছর বয়সী এই অভিনেতা।

বিনোদ খান্নার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল বছরগুলোর একটি

১৯৭৬ সাল। সে বছরই তিনি শাবানা আজমীর সঙ্গে 'শাক' করেন। তখনকার প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট সাহসী ছবি এটি। তাঁর ক্যারিয়ারের উল্লেখযোগ্য ছবি 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'ইমতিহান', 'ইনকার', 'কুরবানি', 'অমর আকবর অ্যান্থনি', 'মুকাদ্দার কা সিকান্দর'। ১৯৮৭ সালে পাঁচ বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে ফিরে এসেও উপহার দেন 'ইনসাফ', 'সত্যমেব জয়তু'র মতো ব্যবসাসফল ছবি। 'দয়াবান' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে চুমুর দৃশ্য নিয়ে সেসময়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়।

তাঁর পুরস্কারভাগ্য তেমন ভালো ছিল না। একক নায়ক হিসেবে বড় কোনো পুরস্কার পাননি। তবে পরে ফিল্মফেয়ার ও জি সিনে অ্যাওয়ার্ডসে আজীবন সম্মাননা পান।

মিজু আহমেদ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের শক্তিমান অভিনেতা মিজু আহমেদ আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

গত ২৭ মার্চ রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে হার্ট অ্যাটাকে তাঁর মৃত্যু হয়। ট্রেনযোগে দিনাজপুরের স্বপ্নপুরীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে রাত ৮টার দিকে ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশনের দিকে রওনা হন। সেখানে ট্রেনেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন।

উল্লেখ্য, মিজু আহমেদ ১৯৫৩ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক নাম মিজানুর রহমান। পরবর্তীতে শোবিজ তারকা হিসেবে তিনি 'মিজু আহমেদ' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

শৈশব থেকেই তিনি থিয়েটারের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। পরে তিনি কুষ্টিয়ার স্থানীয় একটি নাট্যদলের সাথে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯৭৮ সালে তৃষ্ণা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এর কয়েক বছর পরে তিনি ঢালিউড চলচ্চিত্র শিল্পে অন্যতম সেরা একজন খলনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়াও তিনি তার নিজের চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা ফ্রেন্ডস মুভিজের ব্যানারে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রযোজনা করেছেন। তৃষ্ণা ছবির জন্যই তিনি সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান।

এছাড়া বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে মিজু আহমেদ একাধিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

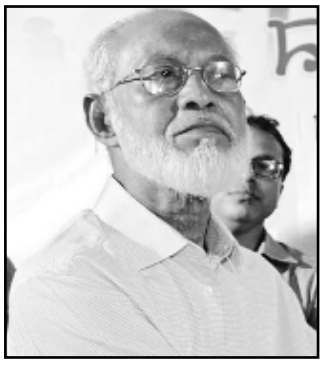

মোস্তফা মেহমুদ

বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা মেহমুদ আর নেই। তিনি গত ৯ এপ্রিল চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নে নিজ বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না...লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মোস্তফা মেহমুদ পরিচালিত স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র 'মানুষের মন' মুক্তি পায়। এ ছবিতে মুখ্য অভিনয়ে ছিলেন নায়করাজ রাজ্জাক, ববিতা ও আনোয়ার হোসেন। এই ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নতুনভাবে জেগে ওঠে। ষাট, সত্তর ও আশির দশকে তাঁর নির্মিত ১৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি মুক্তি পায়। ১৯৬৬ সালে জহীর রায়হানের আগ্রহে 'বেহুলা' ছায়াছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন মোস্তফা মেহমুদ। ১৯৮২ সালে 'স্বামীর সোহাগ' ছবির পর তিনি চলচ্চিত্র জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। এরপর জন্মস্থান মিরসরাইয়ের মিঠানালা গ্রামে ফিরে যান। বরেণ্য এই পরিচালকের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৬ জানুয়ারি। ২০১০ সালের ২১ জানুয়ারি সহধর্মিণী ফিরোজা মেহমুদের মৃত্যুর পর থেকে বাড়িতে একাই থাকতেন তিনি।

নাজমুল হুদা বাচ্চু

অভিনেতা নাজমুল হুদা বাচ্চু আর নেই। গত ২৮ জুন রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। জ্বরে আক্রান্ত হন বাচ্চু। সেই সঙ্গে রক্তচাপ অনেক কমে যাওয়ায় তাঁকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মেডিক্যাল পরীক্ষার পর হৃদযন্ত্রে সমস্যা ধরা পড়ে। বাচ্চুর হাত ধরে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে বুলবুল আহমেদ, উজ্জ্বলসহ অনেক খ্যাতিমান তারকার। বাচ্চু সত্তর ও আশির দশকে 'সূর্য দীঘল বাড়ী', 'সারেং বৌ', 'বেহুলা লক্ষীন্দর'সহ অনেক ছবিতে অভিনয় করেন। সম্প্রতি 'রানওয়ে' ও 'অজ্ঞাতনামা' ছবিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এর বাইরে নাটক ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'র বিভিন্ন নাট্যাংশে অভিনয় করতেন।

রিশিত খান

সাংবাদিক ও গল্পকার রিশিত খান আর নেই। ১৩ মে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

রিশিত খান সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার কানসোনা গ্রামের প্রয়াত বিশু খানের ছেলে। লেখাপড়া শেষে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে সাপ্তাহিক খবরের কাগজের মধ্যদিয়ে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এরপর তিনি আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দৈনিক ডেসটিনি, সাপ্তাহিক ২০০০, অনলাইন নিউজপোর্টাল রাইজিংবিডিসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেছেন।

লিটন বাশার

ইত্তেফাকের বরিশাল ব্যুরো চিফ লিটন বাশার গত ২৭ জুন বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। লিটন বাশার ১৯৭২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি ১৯৯২ সাল থেকে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করার পর ২০০৪ সালে তিনি ইত্তেফাকের বরিশাল ব্যুরো অফিসের রিপোর্টার হিসেবে যোগদান করেন। পরে ২০০৬ সাল থেকে ব্যুরো প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আনিসুর রহমান

ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সাবেক চিফ সাবএডিটর আনিসুর রহমান সেলিম গত ১৮ মে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। জাতীয় প্রেস ক্লাবের এ জ্যেষ্ঠ সদস্য দীর্ঘদিন হৃদরোগ ও কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

মির্জাপুরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ২০শে জুন ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইসরাত সাদমীন এবং সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন মির্জাপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি শামসুল ইসলাম শহীদ। প্রশিক্ষণে মির্জাপুরের মোট ৩৫জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেছেন।

জনসংযোগ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী জনসংযোগ বিষয়ক (১৭-১৯শে জুন) কর্মশালা শেষ হয়েছে। পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির সভাপতি মোস্তফা ই জামিল। সভাপ্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

পিআইবি'তে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)'র উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী (১২-১৪ই জুন ২০১৭) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি ইবতিসাম নাসিম মৌ।

অনলাইনে আবেদনের ভিত্তিতে ঢাকায় বসবাসকারী মোট ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ফটোসাংবাদিকতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে ১৮ই মে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফটো-সাংবাদিকতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার। পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. মমতাজউদ্দিন আহমেদ, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে নারীর শ্রম শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

গৃহস্থালি কাজকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে: তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, সরকারকে গৃহস্থালি কাজ মূল্যায়নের একটি মাপকাঠি তৈরি করতে হবে। গৃহস্থালি কাজকে আইনগত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে যেমন গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়ন নিশ্চিত করা যাবে। তেমনি দেশের প্রবৃদ্ধির সঠিক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী 'গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে নারীর শ্রম' শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গৃহস্থালি কর্মসহ সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কাজের যথাযথ মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূর হওয়ার পাশাপাশি এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পৌঁছানোও আমাদের জন্য সহজ হবে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী 'গৃহস্থালি কর্মকাণ্ডে নারীর শ্রম' শীর্ষক সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নারী শ্রমের স্বীকৃতি ও যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'সমাজকে এগিয়ে নিতে চাইলে যারা গৃহস্থালি কাজের সাথে যুক্ত থাকেন, তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।' গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'গৃহস্থালি কাজের মূল্যায়নের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করাসহ সরকারকে আইন তৈরিতে উৎসাহী করতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।'

পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ-এর সদস্য ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর ম্যানেজার (কমিউনিকেশন) শেখ মনজুর-ই-আলম। ঢাকা ও ঢাকার বাইরের মোট ৩৫ জন সাংবাদিক প্রশিক্ষণটিতে অংশ নিয়েছেন।

'দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট তথ্য উদঘাটনে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে আরো জোরদার ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) ও

'দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ (মাঝে)

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) যৌথ উদ্যোগে ৮ মে সোমবার 'দুর্নীতি প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশনের কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দুদকের মহাপরিচালক ড. মো. শামসুল আরেফিন ও পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক গোলাম সারওয়ার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের এটুআই প্রোগ্রাম নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাইজেশনের মধ্যদিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে ও এটুআই প্রকল্প কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমকে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার বলেন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সব জায়গায় এটুআই প্রকল্পের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তৈরির পাশাপাশি জনসাধারণকে সহজে, কম সময়ে এবং কম পরিশ্রমে সেবা পাওয়ার সুযোগও তৈরি করে দিচ্ছি আমরা। নতুন নতুন উদ্ভাবন ও দেশজুড়ে এটুআইয়ের সেবা সহজীকরণের যে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে এটুআই প্রকল্পের পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী বলেন, দেশে ইনোভেশনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য নতুন নতুন উদ্যোক্তা নানা উদ্ভাবন নিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রাকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার চেয়্যারম্যান রাহাত খান, বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ও একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনজুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল আলম, দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনিরুজ্জামান, এটিএন বাংলা'র প্রধান নির্বাহী জ ই মামুন, দেশ টিভি'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সুকান্ত গুপ্ত অলক, আমাদের অর্থনীতির সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান, মানবকণ্ঠের সম্পাদক আনিস আলমগীর, দৈনিক বর্তমানের নির্বাহী সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রতন, দৈনিক ইত্তেফাকের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আশীষ সৈকত, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, আরটিভি'র সিইও সৈয়দ আশিক রহমান, মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান রেজোয়ানুল হক রাজা, প্রথম আলো'র যুগ্ম-সম্পাদক সোহরাব হাসান, এটুআই প্রকল্পের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাঈমুজ্জামান মুক্তাসহ আরো অনেকে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভা সঞ্চালন করেন পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

সম্পাদকদের সাথে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস-টু-ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর যৌথ আয়োজনে ১২ এপ্রিল বুধবার পিআইবি সেমিনার কক্ষে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়্যারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক কবির বিন আনোয়ার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মনজুরুর রহমান। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকদের সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রামে টেলিভিশন সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলার টেলিভিশন সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৪-৬ এপ্রিল ২০১৭) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর সমাপন অনুষ্ঠানের সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন টিভি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, চিটাগং-এর সভাপতি আলহাজ্ব আলী আব্বাস, টিভি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, চিটাগং-এর সাধারণ সম্পাদক শাহনেওয়াজ রিটন, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সহ-সভাপতি শহীদুল আলম, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শুকলাল দাশ ও বিএফইউজে'র যুগ্ম-মহাসচিব তপন চক্রবর্তী।

প্রশিক্ষণে টিভি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, চিটাগং-এর মোট ৪০ জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহণ করেছেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক পরিচর্যা বিষয়ক রিপোর্টিং কর্মশালা

পিআইবি'তে সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী (১৪-১৫ মে ২০১৭) মানসিক স্বাস্থ্যের প্রাথমিক পরিচর্যা বিষয়ক রিপোর্টিং কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। পিআইবি সেমিনার রুমে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

চট্টগ্রামে সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত চট্টগ্রাম জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় তিনদিনব্যাপী (৪-৬ এপ্রিল ২০১৭) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী। চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের মোট ৪০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত ময়মনসিংহ জেলার সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় তিনদিনব্যাপী (২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৭) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

২৭ এপ্রিল ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মো. ইমাম উদ্দিন মুক্তা'র সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পুলিশ সুপার সৈয়দ নূরুল ইসলাম, প্রেস ক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি ও দৈনিক জাহান পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক অধ্যাপিকা রেবেকা ইয়াসমীন, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক হারুন অর রশিদ প্রমুখ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)'র উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস-টু-ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সাংবাদিকদের জন্য দু'দিনব্যাপী (১৫-১৬ জুন ২০১৭) ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পিআইবি'র সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন, এটুআই প্রকল্পের জনপ্রেক্ষিত বিশেষজ্ঞ নাঈমুজ্জামান মুক্তা, বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

সাংবাদিকদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় (ডানদিক থেকে) অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান, পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর ও পিআইবি'র সহযোগী সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগের উদ্যোগে 'অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়' সভা পিআইবি সেমিনার কক্ষে গত ২০মে অনুষ্ঠিত হয়। পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুধাংশু শেখর রায়, চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপম হায়াৎ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুর রাজ্জাক খান, শিশু একাডেমির পরিচালক আনজীর লিটন, বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহফুজ সিদ্দিকীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সভায় পিআইবি'র প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ ও সহকারী সম্পাদক মিজানুর রহমান ও ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অনারারি প্রফেসর ড. সাখাওয়াত আলী খান বলেন, পিআইবি'র সঙ্গে আমি প্রথম থেকেই জড়িত আছি। বর্তমান সময়ে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রশংসা করে তিনি বলেন, নিরীক্ষা'র ধারণা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। তিনি বলেন, লেখার কৌশল, ফিচারের সূচনা কেমন হবে, ফিচারের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি বলেন, গণমাধ্যম সম্পর্কিত এনসাইক্লোপিডিয়া বের করা উচিত। তিনি কৃষি সাংবাদিকতাকে আরো গুরুত্ব প্রদানের আহবান জানান।

পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর বলেন, আমরা গণমাধ্যম বিষয়ক সবচাইতে ভালো বই নির্বাচন করে পুরস্কারের আয়োজন করতে চাই। এটা এবছর থেকে করতে চেয়েছি। আপনারা মতামত দেবেন, যাতে আমরা এটা আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। কোন কোন জায়গায় হাত দিলে আমরা ভালো করতে পারব- তা আপনারা পরামর্শ দেবেন। পিআইবি'কে আমরা ভালো কাজের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই।

চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপম হায়াৎ বলেন, শুধু তথ্য দিয়ে দিলে হবে না, এতে যেন পুরো বিষয়টি ফুটে ওঠে তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরীক্ষা'য় গণমাধ্যমের অন্যান্য শাখা নিয়ে লেখা প্রকাশ করা উচিত। প্রুফ রিডিংয়ের কলাকৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, কল্যাণকর জার্নালিজম না হলে গণমাধ্যম বিকশিত হবে না। সরকার ও প্রশাসনিক বিষয়ে লেখালেখির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি বলেন, নিরীক্ষা'র কত বর্ষ চলছে-এটা উল্লেখ থাকা দরকার।

ড. সুধাংশু শেখর রায় বলেন, এখন কো-অপারেটিভ সাংবাদিকতা শুরু হয়েছে। আবেগ ও মেকানিজম এখন আর থাকছে না। খাতা-কলমের ব্যবহারও এখন কমে গেছে। তিনি বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা সহযোগিতা করে থাকে। তিনি ফিচারের ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করে টেবিলে বসে যাতে ফিচার লেখা না হয় সে ব্যাপারটি লক্ষ্য রাখার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, গবেষণার কাজে প্রশিক্ষণের জন্য সুপারভাইজারের কাছে পাঠানোর আগে পিআইবি'তে একটা প্রথম রিডিং প্রয়োজন। এছাড়া তিনি নিরীক্ষার বাইন্ডিং পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ দেন।

শিশু একাডেমির পরিচালক আনজীর লিটন বলেন, নিরীক্ষা'র লেখার শিরোনাম আরো সহজবোধ্য করতে হবে। তিনি বলেন, পিআইবি থেকে যেসব ফিচার প্রকাশ করা হয়- তাকে আরো বাস্তবধর্মী করতে হবে। পত্রপত্রিকা থেকে ফিচার এখন হারিয়ে গেছে। ফিচার হয়ে গেছে এখন প্রেস রিলিজ। তিনি বলেন, দৈনিক বাংলার ফিচারের ওপর কর্মশালা করা উচিত। তিনি বলেন, আমাদের দেশে পত্রিকায় শিশুপাতার মান কমে যাচ্ছে। শিশু সাংবাদিকতার দিকে পিআইবি'কে খেয়াল রাখতে হবে।

মতবিনিময় সভায় পিআইবি'র সহযোগী সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম আকন্দ বলেন, লেখকরা পরিচ্ছন্ন মানুষ, পরিচ্ছন্ন না হলে একটা সুন্দর ফিচার লেখা সম্ভব নয়। লেখকদের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, লেখার মধ্যে দিকনির্দেশনা থাকা চাই। নইলে তা মানোত্তীর্ণ হয় না।

বিশিষ্ট সাংবাদিক মাহফুজ সিদ্দিকী বলেন, নিরীক্ষা সকলকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও এটা আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে। জরুরি কোনো বিষয় আসলে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সাংবাদিক সমাজকে সহযোগিতা করছে। তিনি বলেন, নিরীক্ষা'র কলেবর বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৭০ পৃষ্ঠা করা দরকার। তিনি আরো বলেন, কোনো সাংবাদিক মারা গেলে তার ওপর তথ্যভিত্তিক কলাম নিরীক্ষা'য় প্রকাশিত হওয়া উচিত। তিনি লেখক সম্মানী বাড়ানোর জন্যও মত দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুর রাজ্জাক খান মোনাজাতউদ্দিনের লেখা নিয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টেলিভিশনের কল্যাণে এখন স্টার সাংবাদিকের অভাব নেই। কিন্তু লেখার মান সে অনুযায়ী বাড়ছে না।

সাংবাদিক শান্তা মারিয়া বলেন, প্রত্যেকটা গণমাধ্যম হাউসে নিরীক্ষা যথাসময়ে পৌঁছানো প্রয়োজন। নিরীক্ষা'য় পূর্ববর্তী সংখ্যায় পরবর্তী সংখ্যার বিষয় জানিয়ে দিলে লেখা পাঠাতে সুবিধা হয়।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক মারজিয়া রহমান, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম এ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক শেখ আদনান ফাহাদ, প্রথম আলো'র জ্যেষ্ঠ সহ-সম্পাদক সাইফুল সামিন, কুমিল্লার সাংবাদিক ইয়াসমীন রীমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সুদীপ্ত শর্মা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মাহমুদ হক সোহাগ প্রমুখ।